প্রবাহ

চতুর্থ সংখ্যা

মানিকের সংকলন

প্রবাহ (৪)
প্রকাশ কাল ঃ
মার্চ, ২০২৩

প্রকাশক ঃ
মানিক
প্রযত্নে, স্নেহময় গাঙ্গুলী
চারুপল্লী, বোলপুর, বীরভূম
দূরভাষ - ৯৪৭৫০০৭১৬৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও রূপায়ণে ঃ
জয়কৃষ্ণ চ্যাটার্জী

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ
ব্রহ্মসমুদ্র থেকে ধেয়ে আসছে চৈতন্যের প্রবাহ।

বর্ণসংস্থাপক ঃ
এস. বি. প্রিন্টার্স
১৯ই/এইচ/৩৩, গোয়াবাগান স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রক ঃ
গ্যালাক্সি প্রিন্টার্স
২২, গিরিশ এভিনিউ
কলিকাতা-৭০০০০৩

মূল্য ঃ ১৫০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

১) শ্রীধর ঘোষ
চারুপল্লী, ওয়ার্ড নং-৩
বোলপুর, বীরভূম।
দূরভাষ ঃ ৯৪৭৫৪৭৪৬৭০

২) তরুণ ব্যানার্জী
জামবুনি, ওয়ার্ড নং-৫
বোলপুর, বীরভূম
দূরভাষ ঃ ৭৯০৮১৮৮৫৭৩

৩) রাজীব রায়চৌধুরী
সখের বাজার, কলকাতা-৩৮
দূরভাষ ঃ ৮৬১৭৭৯৬১৭৯

৪) অমরেশ চ্যাটার্জী
ইলামবাজার, বীরভূম।
দূরভাষ ঃ ৮২৫০৭১৩৮৯৯

৫) পার্থসারথি ঘোষ
বেলঘড়িয়া, কলকাতা
মোঃ ৭৯৮০৪৪৫৪৭২

৬) গীতা বসাক
আমতলা, দঃ ২৪ পরগণা
মোঃ ৭৪৩৯৬১২৩৪৬

৭) রুদ্রনাথ দত্ত
গড়গড়িয়া, বীরভূম
মো ঃ ৯৭৩২২২৯৮২৫

৮) স্বপন ভট্টাচার্য
বাগুই আটি
মোঃ ৯৪৩১১৯০৩২৫

৯) পূরবী চক্রবর্তী
ধাড়সা, হরিসভা তলা,
রামরাজাতলা
মোঃ ৮৭৭৭৬৫৩১৯৬

প্রাক্‌কথন

দু'বছর পর আবার নতুন প্রবাহ প্রকাশিত হল নানা মানিকের সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে। প্রথম দুটি মানিকে (৭৩ এবং ৭৪ সংখ্যা) চৈতন্যের যে ঢেউ অনুভব করবেন পাঠক পরের দুটিতে (৭৫ এবং ৭৬ সংখ্যা) তার উচ্চতা যে বেড়ে গেছে তা বুঝতে অসুবিধা হবে না।

সমুদ্রগর্ভে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে বা মহাদেশীয় প্লেট সঞ্চালনে সৃষ্ট ভূমিকম্পের ফলে সমুদ্রে যখন সুনামী দেখা যায়, সুউচ্চ ঊর্মিমালা আছড়ে পরে উপকূলবর্তী অঞ্চলে। সেখানকার মানুষদের জীবনে বিরাট প্রভাব ফেলে। ঠিক তেমনি চৈতন্যের সাগরে পুনর্গঠনের ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট হয় উচ্চমাত্রার তরঙ্গ যা প্রত্যক্ষ করেন আত্মিক জগতের মানুষেরা যারা আছেন ব্রহ্ম সমুদ্রের কিনারে, যাদের দৃষ্টি ব্রহ্মের বিকাশ মহিমায় নিবদ্ধ।

প্রবাহের এই ৪র্থ সংখ্যায় পাঠক যেমন দর্শন ও অনুভূতির বৈচিত্র্য ও গভীরতা প্রত্যক্ষ করবেন তেমনি পাঠপ্রসঙ্গ ও পাঠপরিক্রমা পঠনে পাঠচক্রের অনুশীলন যে সময়ের সাথে সাথে ক্রমাগত উচ্চমাত্রা লাভ করেছে তা সহজেই অনুধাবন করতে পেরে আনন্দিত হবেন। ''চরৈবেতি'' মন্ত্রে উজ্জীবিত মুক্তি পথের যাত্রীরা ঈশ্বরীয় চর্চার এই নতুন উপকরণটি সাদরে বরণ করে নেবেন বলেই আশা রাখি।

ইতি—

৬ই মার্চ, ২০২৩ **প্রকাশক**

সূচিপত্র

মানিক ৭৩ সংখ্যা	৭-৫০
মানিক ৭৪ সংখ্যা	৫৩-১০২
মানিক ৭৫ সংখ্যা	১০৫-১৬৭
মানিক ৭৬ সংখ্যা	১৭১-২৪০
পাঠপরিক্রমা—১	২৪১-২৫৭
পাঠপরিক্রমা—২	২৫৮-২৭৬

মানিক ৭৩ সংখ্যা

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...7

ভূমিকা

একদিন শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, দেখ্ কেউ একটা কথা বললেই আমি তার নাড়ী নক্ষত্র বুঝতে পারি। I read a man through his brain. স্বামী বিবেকানন্দকে একজন বলেছিল, আপনার সঙ্গে কেউ তর্কে পেরে ওঠে না কেন? স্বামীজী বললেন, দেখ, আমার মাথার পর্দাটা গুটিয়ে গেছে সেইজন্য রে। আসলে কী হয় জানিস সহস্রারের ঢাকনা খুলে যায় আর সহস্রার দর্শন হয়—একে বলে বস্তুতত্ত্বে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার। ঐ যে রে ঠাকুরের কথা—রাসফুল খাওয়া। বেদান্তের সাধনে সগুণ ব্রহ্মের সর্বোচ্চ বিকাশের দ্বারোদ্ঘাটন। ঠাকুর কেশব বাবুকে বলেছিলেন, নরেনের এক্ষুনি প্রশংসা কোরোনি। ওর রাসফুল খেতে এখনও দেরী আছে। কেশববাবু তখন রাসফুল কি তা জানতে চাইলে ঠাকুর একটা গল্প বললেন। একটা ছাগল তার মা-কে বলল, মা, আমি রাসফুল খাব। তার মা বলল, দাঁড়া এই আশ্বিনে দুর্গাপুজো যাক। তাতে যদি বাঁচিস, তারপর কালীপুজো। তাতেও যদি বাঁচিস, তারপর আসবে জগদ্ধাত্রী পুজো। তাতেও যদি বাঁচিস, তাহলে রাসফুল খাবি।

যোগেতে দুর্গাপুজো মানে সপ্তমভূমিতে আত্মা সাক্ষাৎকার হওয়া। এতে অহংনাশ হয়। সাধকের বোধহয় জীবনে যা পেয়েছি জীবন তাতে পরিপূর্ণ। অন্তরে কোন অভাববোধ থাকে না। ফলে দুঃখ দূরে যায়। এই দর্শন যদি দেহ সহ্য করতে পারে, দেহ টুটে না যায় তাহলে পরে কালীপুজো হয়। দুর্গা হতে সৃষ্ট দেবী কালিকা রক্তবীজকে বধ করে তার সমস্ত রক্তনিঃশেষে পান করেছিলেন, যাতে নতুন করে সে আর জন্ম নিতে না পারে। এর মর্মার্থ হল—বেদান্তের সাধনে স্থান ও কালের লয় সম্পর্কিত অনুভূতি অর্থাৎ ব্রহ্ম জ্ঞানের ফুট কেটে ''হবে নয়, সব হয়েই আছে''—এই বোধোদয় হয়ে রজোগুণের সম্পূর্ণ নাশ হওয়াই কালীপুজো। এরপর জগদ্ধাত্রী পুজো—জগৎকে যে ধরে আছে তার পুজো। আত্মার মধ্যে জগৎ দর্শন তথা বিশ্বরূপ দর্শন। এই দর্শনও যদি দেহ সহ্য করতে পারে তাহলে সাধক

রাসফুল খান। মাথার চামড়া গুটিয়ে যাবার অনুভূতি বা ঢাকনা খুলে সহস্রার দর্শন হয়। বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি হয়। মেধাশক্তি বাড়ে।

ব্যষ্টির সাধনের এই সকল অনুভূতি সুদুর্লভ। কিন্তু এ যুগে আমরা সহজেই ভগবানের কৃপা পাচ্ছি। একজন মানুষ ভগবান দর্শন করে ভগবান হয়ে গিয়ে হাজার হাজার মানুষের অন্তরে চিন্ময় রূপ ধরে প্রকাশ পাচ্ছেন। তাঁর সাথে আত্মিক একত্ব লাভ হলে দেহস্থ দেবত্বের জাগরণে সাধারণ মানুষেরও মেধাশক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে, ঠাকুরের ভাষায় তারা রাসফুল খেতে পাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে সাধারণ মানুষের অনুভূতিমূলক ধর্মচর্চায় আগ্রহ বাড়ছে, স্মৃতিশক্তি বাড়ছে, ফলে প্রাসঙ্গিক তথ্য ও দর্শন স্মরণ করে আলোচনাকে গভীরতা দান করতে সক্ষম হচ্ছে। সর্বোপরি যোগদৃষ্টি লাভ হচ্ছে ও দর্শনের মর্মার্থ ভেদ করতে সক্ষম হচ্ছে যা যথার্থ আধ্যাত্মিক কৃষ্টি সৃষ্টিতে একান্ত সহায়ক। বর্তমান পত্রিকায় আলোচিত স্বপ্নানুভূতি ও তার অভিনব ব্যাখ্যা থেকে পাঠক সহজেই ধর্ম জগতে যে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে সে সম্পর্কে নি:সংশয় হতে পারবেন।।

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৭

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...9

স্বপন মাধুরী

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...11

জন্মদিন

● দেখছি (1.4.2020)—এক জায়গায় বিরাট প্যাণ্ডেল হয়েছে। অনেক লোকজন। কিছু অনুষ্ঠান হবে। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, এখানে কী হবে? তাকে যদিও আমি চিনি না। সে বলল, জন্ম-দিনের অনুষ্ঠান হবে। বললাম, কার জন্মদিন? সে বলল, কেন আপনার। আমি চম্‌কে উঠলাম। অবাক হলাম। আবার আনন্দও হ'ল। স্বপ্ন ভাঙল। এবার দেখছি—ঐ স্বপ্নটা কাকে যেন বলছি। তারপর ঘুম ভেঙে গেল।

—গৌতম চ্যাটার্জী
সরশুনা, কলকাতা

ব্যাখ্যা—জীবনকৃষ্ণ একজনকে বললেন, ধর্ম ও অনুভূতির নিবেদন অংশটা পড়ে তোর এত ভালো লাগছে কেন বলতো? ওতে যে তোরই কথা বলা হয়েছে। অখণ্ড চৈতন্যের নতুন বিকাশ—সে যে আমারই নবজন্ম—এই উপলব্ধি হচ্ছে দ্রষ্টার।

● দেখছি (19.10.19)—মৌদি (অনুরাধা) ও সানুদা (সুদর্শন) এসেছে। ৮নং রবীন্দ্র রচনাবলী আমাকে উপহার দেবার জন্য এনেছে। আমাদের বাড়ীতে রবীন্দ্র রচনাবলী থাকলেও ৮নং টা নেই। আর একটা কলমও উপহার হিসাবে এনেছে। ওটা শ্রীধর দেখতে নিল; তারপর জয়ীকে দিয়ে দিল, ও লিখব বলায়। তখন মনে হল বইটাও জয়ীর জন্য এনেছে।....স্বপ্ন ভাঙলো।

—স্নেহময় গাঙ্গুলী
বোলপুর

ব্যাখ্যা—অনুরাধা—মধ্যমা (মাধ্যম)। সুদর্শন—ঈশ্বরীয় দর্শন-অনুভূতি। ৮নং—৮ সংখ্যাটির প্রতীকি তাৎপর্য হল, এটি পুনরুত্থানকে—মৃত অবস্থা থেকে চিরন্তন জীবনে উত্তীর্ণ হওয়াকে বোঝায়। জয়ী—সেই সকল মানুষদের প্রতিনিধি যারা মৃত্যুকে জয় করে অর্থাৎ নিজের বিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম

করে অখণ্ড একের বোধে উত্তীর্ণ হয়। তারা একত্বের অনুভূতি ও উপলব্ধি উপহার পান ও তা অনুশীলনের জন্য লিখে রাখেন।

অশোকচক্র

● দেখছি (7.05.2020)—আজ যেন ৭ই জ্যৈষ্ঠ। বহু মানুষ এসেছে বোলপুরের অনুষ্ঠানে। জয়কে ডাকতে গেলাম। ও খাটে বসে ছিল। চিৎকার করে বলল, তুমি আগে যাও। সকলকে বলে দাও, আজ থেকে কোন জীবনকৃষ্ণপ্রেমী যেন অন্য কোন জীবনকৃষ্ণপ্রেমীর নিন্দা না করে বা আঘাত দিয়ে কথা না বলে। বললাম, বেশ। আমি অনুষ্ঠান ভবনের দিকে যেতে শুরু করলাম। ঘুম ভেঙে গেল।।

—স্নেহময় গাঙ্গুলী
চারুপল্লী, জামবুনি

● দেখছি (7.05.2020)—আমার গায়ে অশোকচক্র। খুব কাছেই জীবনকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাকিয়ে দেখি তাঁর গায়েও একই জায়গায় অশোকচক্র। খুব আনন্দ হল। ঘুম ভাঙলো। আজ বুদ্ধপূর্ণিমা। আমার জন্মদিনও। আমি তো প্রসাদ খাই না। তাই ঘুম ভাঙতেই মনে হল এই স্বপ্ন আমার জন্মদিনের উপহার, আমি যেন প্রকৃত প্রসাদ পেলাম।.....

—কৌশিক ঠাকুর
দীঘা, বীরভূম

ব্যাখ্যা---অশোকচক্র হল রাজা অশোক প্রবর্তিত ধর্মচক্র—যা অহিংসার প্রতীক ও শান্তির প্রতীক। ধর্মচক্রকে কাল চক্রও বলে। ঐ চক্রের ভিতরের ২৪টি স্পোক ২৪ ঘন্টার প্রতীক, তাই শ্রীজীবনকৃষ্ণ নিজের আত্মিক শক্তি দান করে নিরন্তর (২৪ ঘন্টা) মানুষের আত্মিক সমস্যার সমাধান করে ও ব্যবহারিক জীবনে চলার সঠিক পথটি আলোকিত করে তাদের শান্তি দান করছেন। দ্রষ্টার ন্যায় সাধারণ মানুষও ভবিষ্যতে তাঁর সত্তা লাভে শান্তিদূত হয়ে উঠবেন, মানব কল্যাণে আত্মিক একত্বের বার্তাবহ হবেন—তার ইঙ্গিত আছে এই স্বপ্নে।

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...13

নতুন পুরোহিত

● স্বপ্নে দেখছি (2.12.19)—একটা হল ঘরের মতো আছে। সেখানে পুজো হচ্ছে। আমি ওদিকে যাওয়া মাত্র পুরোহিত আমার হাত ধরে আমাকেই মন্ত্র পড়ে পুজো করতে লাগলেন। আমি অস্বস্তি অনুভব করছি। উনি খালি গায়ে ও ধুতি পরে আছেন।...

পরের দৃশ্যে দেখছি ঐ পণ্ডিতজী আমাকে যেন সব সময় রক্ষা করেন। কেউ আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করলে উনিই সব সময় আমাকে রক্ষা করে যাচ্ছেন।....

কলেজে দিশাকে স্বপ্নটা বললাম। ও জীবনকৃষ্ণের ফটো দেখালো। আমি অবাক হয়ে দেখছি এনাকেই আমি স্বপ্নে পুরোহিত ও রক্ষাকর্তা রূপে দেখেছি। অবাক হলাম।

—দিয়া মুখার্জী
কলকাতা

ব্যাখ্যা---মানুষের অন্তরে ফুটে উঠে জানাচ্ছেন—তুমিই সেই ব্রহ্ম।

● দেখছি (6.5.2020)—আমি বরুণদার ঘরে গেছি। ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আত্মা কী? উনি আমার চোখে কাপড় বেঁধে দিলেন। ঐ অবস্থায় দেখি দেওয়ালে একটা লাল রঙের ছোট্ট আলো। ঐ আলোর তীব্র আকর্ষণ আমাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল প্রায় দেড় দু'কিমি। সেখানে গিয়ে দেখি এক ভদ্রলোক খালি গায়ে ধুতি পরে বসে আছে। বরুণদা বলল, ইনিই আপনাকে এসব দেখালেন (মনে হচ্ছে ঐ লাল আলোর সাহায্যে এখানে টেনে নিয়ে আসা)। ঘুম ভাঙল। ফটো দেখে বুঝলাম শ্রীজীবনকৃষ্ণ কৃপা করে আমায় দেখা দিলেন। পাঠক চোখে কাপড় বেঁধে বোঝালেন, ভগবান দেহের ভিতর। আর স্বয়ম্ভু আত্মার স্বয়ংপ্রকাশ হয়।

—অচিন্ত্য গুপ্ত
বোলপুর

কাছে থাকো

● দেখছি (6.04.2020)—হঠাৎ জীবনকৃষ্ণ ঢুকলেন আমার ঘরে। মাথায় ছোট ছোট চুল, খালি গা, ধুতি পরে আছেন। পাশে এসে বসলেন। আমি বললাম, আপনি কী করে এখানে এলেন? ভুল করে এসে গেছেন? আপনি বেঁচে আছেন এখনও? উনি আমার কথার উত্তর না দিয়ে বলছেন, আমি যা বলছি মন দিয়ে শোন। বোঝার চেষ্টা কর। আঙুল নেড়ে নেড়ে বলছেন। আমি কিন্তু ওনার কথা না শুনে প্রশ্নই করে যাচ্ছি।....ঘুম ভাঙলো। দেহ মনে অদ্ভুত আনন্দ অনুভব করতে লাগলাম।

—সঞ্চিতা ব্যানার্জী
কড়িধ্যা, সিউড়ী

● দেখছি (25/3/2020)—একটা প্রাইভেট সংস্থায় চাকরীর appointment letter পেয়েছি। সেখানে গেলাম। হঠাৎ খেয়াল করছি কোনও পোষাক নেই গায়ে। সবাই আমার দিকে তাকাচ্ছে—লজ্জা লাগছে। ওদের ওখানে অনেক পুরোন জামা কাপড় পড়ে রয়েছে। একজনকে বললাম, আমাকে এক টুকরো কাপড় দেবে? সে দিল। তাই কোন-রকমে কোমরে জড়িয়ে নিলাম। তারপর অফিসে ঢুকে দেখি Manager হিসাবে রয়েছে জয়। বাড়ীটা খুব Ordinary—পোড়ো বাড়ি। ও আমার লেটার দেখে বলল, চাকরী তো হবে, তবে এই চিঠিতে তোমার একটা ফটো লাগাতে হবে। তখন ভাবছি ফটো তো লাগাবো, কিন্তু চাকরীটা কি করতে পারব? দু'ঘন্টা তো এখানে আসতেই সময় লাগবে। অনেক দূর হয়ে যাচ্ছে।....

—দেবকুমার ব্যানার্জী
বোলপুর

ব্যাখ্যা ঃ অনেক দূর হয়ে যাচ্ছে—নিয়মিত অনুশীলন হলে তবে ঈশ্বর হতে দূরত্ব কমে, তার কাছে বাস করা যায়। চাকরী করা অর্থাৎ উপলব্ধ সত্য মানুষকে জানানো সহজ হয়।। ফটো চেটানো—আইডেনটিটি (Identity) তৈরী—নিজস্ব ভাষায় ঈশ্বরীয় বক্তব্য বলা।

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...15

বিদ্যুৎ-পুরুষ

● ঘড়িতে দেখছি (5.3.2020) রাত্রি প্রায় ১টা। হঠাৎ দেখছি—বিদ্যুতের ঝলকানি থেকে জীবনকৃষ্ণ বেরিয়ে পাক খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে আমার কাছে এসে মাথার কাছে দাঁড়িয়ে পড়লেন। এরপর এমন জোর আওয়াজ হল যে চমকে উঠলাম। বুক দুরদুর করে উঠল। উঠে পড়লাম। মেয়ে ও স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করায় বলল, ওরা কোনরকম আওয়াজ শুনতে পায়নি।....

—জন্মেজয় চ্যাটার্জী
সুলতানপুর, মেদিনীপুর

ব্যাখ্যা—বিদ্যুৎপুরুষ তথা পরমাত্মা রূপে শ্রীজীবনকৃষ্ণকে দর্শন করলেন দ্রষ্টা। এই পুরুষকে অন্তর মধ্যে দর্শন করলে আত্মিক জগৎ সৃষ্টি হয় দ্রষ্টার ভিতরে। জোর শব্দ—নাদ। নাদ থেকে রূপতত্ত্ব—সৃষ্টি।

● দেখছি (মার্চ, ২০২০)—শূন্যে একটা বড় পদ্মফুল। তার উপর বসে আছেন বিবেকানন্দ। দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে ডাকছেন। আমিও শূন্যে আছি। ওনার কাছে যেতেই বললেন, সব সময় শান্ত হয়ে থাকবি। যদি কোন মানুষ শান্ত হয়ে থাকে তার ভার আমি নেব। আমিই পার করিয়ে দেব। এরপর ওনার মুখ বদলে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ হয়ে গেল। তারপর তাও বদলে গিয়ে জীবনকৃষ্ণ হয়ে গেল। উনি আমার মাথায় হাত রেখে বললেন—আমি আছি, কোন ভয় নেই।....

—শ্রেয়া মাজি
আমতলা

ব্যাখ্যা—বিবেকানন্দ—বিবেক—চৈতন্য।

● স্বপ্নে দেখছি (21.2.2020)—আমি জীবনকৃষ্ণকে ভাত খাওয়াচ্ছি। খাওয়ানোর সময় দেখছি তাঁর জিভে কালো কালো দাগ।....

ব্যাখ্যা ঃ তাঁকে খাওয়ানো—তাঁর কথা ও দর্শনের অনুশীলন করা। জিভে কালো কালো দাগ—বাক্‌সিদ্ধ তিনি যা বলেন তা সবই সত্য।

—সর্বাণী বিশ্বাস
সখের বাজার

স্বপ্নাহুতি

● স্বপ্নে দেখছি (8.4.2020)—চারিদিকে মহামারী লেগেছে। লোকজন মারা যাচ্ছে। কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি কী হবে! ভাবছি সবাই বাঁচবে তো? খাব কী? হঠাৎ আমার গালে একটা থাপ্পড় মারল কে যেন। ঘুরে দেখি স্নেহময়দা। বলল, এদিকে আয়। তখন দেখি একটা যজ্ঞ শুরু হয়েছে। স্নেহময়দা যজ্ঞ করছে। সবাই স্বপ্ন বলছেন আর সেটাই হচ্ছে যজ্ঞের আহুতি। যজ্ঞের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। যেদিকে যজ্ঞ হচ্ছে সেদিকের আকাশ নীল আর অন্যদিকের আকাশ কুচকুচে কালো। স্নেহময়দা বলল, যা হচ্ছে হতে দে। এদিকে থাক। ওদিকে যাস না। দেখ না কী হয়! ঘুম ভাঙলো।

---পিউ কয়াল
সখেরবাজার

ব্যাখ্যা---যজ্ঞ—একত্রে পাঠ ও অনুশীলন। স্বপ্নের আহুতি—জ্ঞানাগ্নিতে স্বপ্নের মর্মার্থ ভেদ ও তার শিক্ষা বোধে বোধ হবার জন্য পাঠে দেহ মন উৎসর্গ করা। আকাশের দুই রূপ—ঈশ্বরের দুই রূপ—শান্তও রুদ্র।

● দেখছি (12.01.2020)—একটা বিরাট লম্বা কালো হাত আমার সামনে এল। সেই হাতে ধরা রয়েছে দুটি বই। আমাকে বই দুটি দিয়ে গম্ভীর কন্ঠে বললেন, প্রথমটা কথামৃতের ২য় ভাগ আর দ্বিতীয় বইটা উল্টে দেখলাম নাম লেখা রয়েছে ষষ্ঠ ভাগ...।

—ভবেশ ঠাকুরা
পানাগড়, বর্ধমান

ব্যাখ্যা---কথামৃতের ২য় ভাগ মানে ধর্ম ও অনুভূতি, ষষ্ঠভাগ মানে ব্যষ্টি ও বৃহৎ ব্যষ্টির সাধনের বাইরে সমষ্টির সাধনের কথা সমৃদ্ধ বই-আর তা হল—প্রবাহ।

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...17

শুধু অনুজ্ঞা

● দেখছি (17.4.2020)—খালেক নামে আমার এক বন্ধু এসে বলল, জানিস শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরিতে রবীন্দ্রনাথ পাঁচজন ছেলেকে নিয়ে এক আধ্যাত্মিক স্কুল খুলেছে। অমনি সেই দৃশ্য আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। রবীন্দ্রনাথের সামনে বসে আছে ৫জন ছাত্র। তাদের গায়ের রঙ নীল—চোখ,কান, চুল সবই নীল।....

---সবিতা ঘোষ
চারুপল্লী

ব্যাখ্যা---জগৎচৈতন্যের সত্তা লাভকারী কিছু মানুষকে নিয়ে আধ্যাত্মিক জগতের রহস্য উন্মোচনের সূচনা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ —সমষ্টিচৈতন্য।

● দেখছি (12.01.2020)—শ্রীরামকৃষ্ণ মজেসের দশ অনুজ্ঞা (Ten commandments) দেখছেন। তারপর আবার দেখছি—শ্রীজীবনকৃষ্ণ যেন ঐ Ten commandments দেখছেন।.....স্বপ্ন শেষ।

---সোহিত্রী সেন
নিউ আলিপুর, কলকাতা

ব্যাখ্যা---শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীজীবনকৃষ্ণের চোখ দিয়ে দেখলে বোঝা যায় এ পর্যন্ত জগতে যে ধর্ম হয়েছে তা নীতিমূলক, যোগ-মূলক নয়—কতকগুলি সামাজিক নির্দেশ মাত্র (দশ অনুজ্ঞা)।

● দেখছি (12.01.2020)—বাবার ভালো মোবাইলটা ভাঁজ করা যাচ্ছে—যদিও ভাঙ্গেনি। আমার মন খারাপ হয়ে গেল। মনে হল আমার ফোনটা এমন হলে চলতো কিন্তু যেহেতু এটা বাবার তাই বাবাকে একটা নতুন ফোন কিনে দিতেই হবে।....

---শোভন ধীবর
অবিনাশপুর, বীরভূম

ব্যাখ্যা---বাবার মোবাইল—আত্মিক জগৎ। ভাঁজ করা—রফা করা, Compromise করা। ধর্মজগতে রফা চলে না—শ্রীজীবনকৃষ্ণ।

পাঠ শোনাই তপস্যা

● দেখছি (16.03.2020)— দুজন ভদ্রলোক আমাদের বাড়িতে এল। ওদের বৌ দুটি বলছে চৈত্র সেলের বাজারে যাব। স্বামী দু'জন বলছে, না, পাঠে যাব। শেষে পাঠে যাওয়াই ঠিক হল। অভিনেতা তাপস পালের বাড়ীর ভিতর দিয়ে পাঠের ঘরে যেতে হবে। তাই গেলাম। দেখি স্নেহময়দা ও জয় পাশাপাশি বসে আছে। কাছে বড়দা, ছোড়দা, সাগর ও আরও অনেকে বসে আছে। স্নেহময়দা পাঠ শুরু করল এই বলে যে আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল। এই আমিটা কে তা জানতে হবে। এবার জয় বলতে শুরু করল।....

---কৃষ্ণা ব্যানার্জী
বোলপুর

ব্যাখ্যা---তাপস পালের বাড়ীর ভিতর দিয়ে পাঠের ঘরে যেতে হবে—পাঠ শোনাকে তপস্যা হিসাবে নিতে হবে।

● দেখছি (19.01.2020)—জীবনকৃষ্ণের পিঠ। ঘাড় থেকে কোমর পর্যন্ত। ঘাড়ের কাছে উঁচু উঁচু হরফে বাংলা লেখা ফুটে উঠেছে। অন্ধদের মতো ওটা স্পর্শ করে পড়তে হবে। আমি হাত উঁচু করে ঘাড়ের কাছে লেখাগুলো পড়ার চেষ্টা করছি স্পর্শ করে। লেখাগুলো দ্রুত সরে সরে যাচ্ছে। সব মনটা দিয়ে খুব তৎপরতার সাথে লেখাগুলো পড়তে হবে। না হলে পড়া যাবে না।....ঘুম ভাঙল। দেখি হাতটা উঁচু করে আছি।

---সুনন্দিতা ঘোষ
বেলঘরিয়া

ব্যাখ্যা---জীবনকৃষ্ণের ঘাড়ে লেখা—তাঁর বলা অন্তর্জগতের কথা। হাত দিয়ে স্পর্শ করে পড়তে হবে—সব মন দিয়ে নিষ্ঠা সহকারে মনন করতে হবে, দেহ দিয়ে বুঝতে হবে।

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...19

চাযের বলদ

● দেখছি (28.03.2020)—কে যেন বলছেন, J-1, J-2, J-3, J-67.আমি ভাবছি এ আবার কী কথা রে বাবা? তারপর ভাবলাম J মানে জীবনকৃষ্ণ। কিন্তু নম্বরগুলো কীসের? মাণিক্যের সংখ্যার কথা নাকি ওনার সম্পর্কিত কোন বই? কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না। এমন সময় দেখি জীবনকৃষ্ণের অবয়ব ফুটে উঠল। আর সেই অবয়ব থেকে ধ্বনি আসছে—''জীবনকৃষ্ণ মানেই ধর্ম ও অনুভূতি—এছাড়া আর কিছুই না।''

—তনুশ্রী চ্যাটার্জী
শীলপাড়া, বেহালা

ব্যাখ্যা---J-1, J-2, J-3 - ধর্ম ও অনুভূতির ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড। J-67— শ্রীজীবনকৃষ্ণের আত্মিক জীবনের সূচনা, ক্রম-বিকাশ ও তার পরিণতির বিবরণ যা তার সঙ্গকারী বিভিন্নজনের ডায়েরীতে বিধৃত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৬৭ সালে জীবনকৃষ্ণের দেহাবসান হয়। তখন থেকে সঙ্গকারীদের অনুভূতি ও দিনলিপি প্রকাশ হতে থাকে।

● দেখছি (12.03.2020)—একটা বাড়ির দোতলায় রয়েছি। মনে হচ্ছে বিয়ে বাড়ি। ওখান থেকে নীচে চোখ পড়তেই দেখি দুটি বলদ দাঁড়িয়ে রয়েছে। মনে হল বলদ দুটি বাপের বাড়ি থেকে পাঠিয়েছে। আমি নীচে নেমে এসে বলদ দুটিকে ফুলকপির পাতা ও অন্যান্য সবজির খোসা খাওয়াতে গেলাম। কাছে যেতেই বোধ হল বলদ দুটির একটি রামকৃষ্ণ ও অপরটি শ্রীজীবনকৃষ্ণ। তখন আর ঐ খাবার দিতে পারলাম না। ঘুম ভাঙল।

—করবী রুদ্র
বোলপুর

ব্যাখ্যা---শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীজীবনকৃষ্ণকে ধরে নতুন এক কৃষ্টি প্রকাশ পেয়েছে। এই কৃষ্টির গভীর অনুধ্যান প্রয়োজন (খোসা নয়)।

যাব যে শান্তিনিকেতনে

● দেখছি (14.04.2020)—আমার কলেজ জীবনের দুই বন্ধু সুকল্প আর লোপামুদ্রা। সুকল্প লোপামুদ্রাকে বিয়ে করেছে। প্রায় ২০ বছর দেখা হয়নি। ওরা লকডাউনের সময় শান্তিনিকেতনে ওদের বাড়িতে এসেছে। তারপর ইলামবাজারে আমার সাথে দেখা করতে এসেছে। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। কিন্তু দেখছি লোপা অন্ধ হয়ে গেছে। আমি সুকল্পকে জড়িয়ে ধরলাম। তখন দেখি এতো সুকল্প নয়, এ তো জয়কৃষ্ণ। আনন্দে ওদেরকে বসিয়ে আমি অন্য একটা ঘরে গেলাম। ফিরে এসে দেখি ওরা চলে গেছে। আমার মনে হল তাহলে আমাকেও একবার ওদের বাড়ি যেতে হবে। শান্তিনিকেতনে।

---অমরেশ চ্যাটার্জী
ইলামবাজার

ব্যাখ্যা---সুকল্প--- যার কাছে ভগবান সুন্দর কল্পনার বস্তু। লোপামুদ্রা—বৈদিক যুগের প্রখর বুদ্ধিমতী মহিলা—বুদ্ধিমত্তার (Intellect) প্রতীক। পুরাণ মতে জগতের সব সৌন্দর্য লোপ করে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। জ্ঞানই সবচেয়ে সুন্দর। সুকল্প লোপাকে বিয়ে করেছে—ভাববাদী দার্শনিক বুদ্ধিমত্তার (intellect-এর) সাহায্যে প্রতিষ্ঠা পেতে চায় (সংসার পাতে)। লোপা অন্ধ হয়ে গেছে—ভগবৎ কৃপায় intellect দিয়ে বাইরের কিছু অনুসন্ধান না করে দেহের ভিতর চৈতন্যের প্রকাশ বুঝবার চেষ্টা করছে। সুকল্পকে জড়িয়ে ধরলাম, দেখি ও জয়কৃষ্ণ—দেহ দিয়ে বোঝা গেল সুকল্প বদলে গেছে, ভিতরের চৈতন্য জেগে উঠেছে। জয়কৃষ্ণ—জাগ্রতচৈতন্য- সমষ্টিচৈতন্য। এই চৈতন্যময় অবস্থা স্থায়ীভাবে লাভ করার বাসনা জেগে উঠল। নিজের মধ্যেই একদিন জয়কৃষ্ণের তথা সমষ্টিচৈতন্যের সাথে একত্ব লাভ হলে শান্তি পাওয়া যাবে। আর তাই-ই শান্তিনিকেতনের বাড়িতে যাওয়া। অন্য ঘরে গেলাম—মন ঐ উচ্চ অবস্থা থেকে নেমে গেল। শান্তিনিকেতন—নিজের ভিতর নির্গুণের ঘর। যেখানে মন গেলে একত্ব লাভ হয়—যোগ স্থায়ী হয়—শান্তি লাভ হয়।

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...21

নবীনা

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...23

অভিনব পাইন

● স্বপ্নে দেখছি (29.03.2020)—আমাদের বাড়ির পাশে যে আম-বাগান আছে ঠিক সেইরকম একটা জায়গা। সেখানে আমগাছের পরিবর্তে বেশ কিছু পাইন গাছ রয়েছে। হঠাৎ একটা পাইন গাছের দিকে নজর পড়ল। সেই গাছটিকে অবাক হয়ে দেখছি। গাছটি বেশ বড় হয়েছে। হঠাৎ দেখি আমার দু'হাতে বিন্দুবিন্দু জলকণার মতো ফোস্কা পড়েছে। ভয় পেলাম। মনে হল পক্স হয়েছে। আবার আনন্দ হ'ল এই ভেবে যে খাবার সময় হলে কেউ খাবার দিয়ে যাবে, আমাকে কিছু ভাবতে হবে না। কিন্তু ভয় হল এই ভেবে যে দাদার ছেলে অত্রির যদি পক্স হয়ে যায়! ও তো খুব ছোট। যাই হোক, আবার ঐ গাছটার দিকে তাকালাম।

দেখছি গাছটার মাথা মচকে গিয়ে একটু দূরে মাটিতে স্পর্শ করেছে। সেখানে আবার শিকড় বেরিয়ে গাছটি বড় হতে শুরু করেছে। ক্রমশ ইংরাজী N অক্ষরের মতো আকার নিয়েছে। গাছটা কিন্তু জীবিত এবং সতেজ। মনে হল মচকে যাওয়ার কারণ খাবার বা সূর্যালোকের অভাব। গাছটি আবার বড় হচ্ছে। হঠাৎ দেখলাম একেবারে উপরের দিকটা আবার মচকে গেল। ঠিক সেই সময় খেয়াল করলাম আমার হাতে ও শরীরের বিভিন্ন অংশে জলবিন্দুর ন্যায় ফোস্কার মত বেরিয়েছে। মনে হল আবার পক্স হয়েছে। এইভাবে যখনই শরীরে পক্স হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে গাছটির উপরের ভাগ মচ্‌কে যাচ্ছে এবং মাটিতে ঠেকে আবার বাড়তে শুরু করছে—ইংরাজী N অক্ষরের মতো আকার নিচ্ছে। মনে হল গাছটি খাবারের অভাব হলে বা সূর্যের আলো ভালোভাবে না পেলে নিজের আগের স্থান পরিবর্তন করে।

আরও যেসব পাইন গাছ রয়েছে মনে হল সেগুলিও একই ভাবে স্থান পরিবর্তন করেছে।....

—দেবরঞ্জন চ্যাটার্জী
চারুপল্লী, বোলপুর

ব্যাখ্যা---পাইন গাছ—দীর্ঘজীবি গাছ—চিরন্তন সত্তার প্রতীক—দেহস্থ চৈতন্য সত্তা। পক্ষ হয়—গৃহবন্দী থাকার অর্থাৎ অন্তর্মুখীনতার লক্ষণ ফোটে। পক্ষ হলে আপনা হতে খাবার জোটে—দেহ যোগযুক্ত থাকলে, অন্তর্মুখী হলে অনুশীলনের উপাদান জুটে যায় আপনা হতে। দ্রষ্টা এখানে পাইন গাছের সঙ্গে একাত্ম, নিজের আত্মিক জীবন। তার দাদা—তারই ব্যবহারিক জীবন। তার ছেলে—দ্রষ্টার ব্যবহারিক জীবন যা এখন ছোট হয়ে গেছে। অত্রির যদি পক্ষ হয় এই ভেবে ভয় হচ্ছে—এই আত্মিক তেজ ব্যবহারিক জীবনে গেলে তা বিনষ্ট হবে। কেননা ব্যবহারিক জগৎ যোগের প্রতিকূল। স্বামীজীর মতো লোকও বলেছেন, আমেরিকায় ওরা আমায় দুইয়ে নিয়েছে। আমার সে তেজ আর নেই। তাঁর Spiritual power ভোগের জগতের প্রভাবে বিনষ্ট হয়েছে- টাকার বিনিময়ে বক্তৃতা দান ও সমাজ সেবার জন্য দান গ্রহণ করায়। হৃদয়বাবু বললেন, চল মামা আমরা জীব উদ্ধারে বেরোই। একথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার তাকে জড় করে দিলেন। কারণ সামান্য আত্মিক তেজ নিয়ে বাইরের জীবন প্রসারিত করলে তা সহজেই খরচ হয়ে যাবে ও আত্মিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পাইন গাছ স্থান পরিবর্তন করে "N" আকৃতির হয়ে বড় হচ্ছে—শ্রীজীবনকৃষ্ণ প্রদত্ত নতুন আধ্যাত্মিক ভাবনাকে ভিত্তি করে সমৃদ্ধতর নতুন চিন্তার বিকাশ—Neo Expansion হচ্ছে। আরও খাবার ও আলো পাবার জন্য—আরও জ্ঞান ও অনুশীলনের উপাদানের খোঁজে ক্রমাগত এগিয়ে চলা। পরপর N আকৃতির গতিপথ (/\/\/) Saw tooth wave sound-এর ন্যায়—যা যত এগোয় ততই তার intensity বাড়ে।

তোমার ভুবন

● দেখছি (8.12.19)—ছোট্ট একটা কুমারী মেয়ে। সবাই ওকে নিয়ে মাতামাতি করছে। ওর নাম জীবনী। ও যেন জীবনকৃষ্ণের উত্তরসূরী। ওকে পুজো করা হবে বা ওর উদ্দেশ্যে পাঠ করা হবে—এই রকম মনে হচ্ছে। ওকে যেন নতুন রূপে জীবনকৃষ্ণ বলেই মনে হচ্ছে।.....

—দিশা গাঙ্গুলী
বেলুড়

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...25

● দেখছি (21.12.19)—জয়কে বলছি তোমাকে দেখতে ঠিক নিখিলের মতো। জয় অমনি বলল, ঠিকই তো। আমি নিখিল বিশ্বের প্রতীক। আমি অবাক হয়ে গেলাম ওর কথা শুনে। ঘুম ভাঙল।

—শিখা মুখার্জী
কাগাস, আমোদপুর

● দেখছি (15.03.2020)—একটা ফাঁকা জায়গায় মধুবিদ্যার demonstration চলছে। একটা হাত ছবি আঁকছে। অন্তরীক্ষে একটা ঘর আঁকা রয়েছে। শেষে আমার মুখ দিয়ে একটা কথা বেরিয়ে এল—The world will never be found in materialism-অর্থাৎ জগৎকে জড়বাদে (জড়বাদী দৃষ্টিতে) কখনোই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

—বরুণ ব্যানার্জী
জামবুনি, বোলপুর

ব্যাখ্যা---একটি দেহে মধুবিদ্যার নূতন করে প্রদর্শন হবে—জগৎ মধুমতী হবে—সেই জগৎ আত্মিক জগৎ—তাকে জড়বাদী দৃষ্টিতে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ফসল বিলি

● দেখছি (10.04.2020)—অনেকগুলি ছাগল কেটে জলে ফেলে দেওয়া হল। তারপর একটি ছাগল কেটে রান্না করে সকলকে খেতে দেওয়া হল জয়ের নির্দেশে। জয় বলল এটা সমষ্টির একত্ব। পরের দৃশ্যে দেখছি একটা পাহাড়ের শীর্ষে জয় বসে আছে বিবেকানন্দের মতো পাগড়ী মাথায় দিয়ে—অপূর্ব লাগছে।....

—পলি ব্যানার্জী
জামবুনি, বোলপুর

ব্যাখ্যা---সব মানুষকে এক করার, একত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বহু মানুষের আত্মোৎসর্গ জলে গেছে। এতদিনে একজন মানুষের মধ্যে সমষ্টি চৈতন্যের বিকাশে তাঁর আত্মোৎসর্গে সমষ্টির একত্বের আস্বাদন বাস্তব রূপে পেতে চলেছে।

● দেখছি (9.04.2020)—একটা কালো শতরঞ্জি পাতা। তার উপর অনেক কুমড়ো রাখা আছে। শ্রীজীবনকৃষ্ণ আমাকে একটা কুমড়ো দিলেন। আরও অনেককে দিচ্ছেন। আমি বললাম, মানিক বাবু কুমড়ো চাষ করেছেন আর আপনি সকলকে তা বিলিয়ে দিচ্ছেন? উনি হাসলেন।.....ঘুম ভাঙলো।

—প্রশান্ত রুজ
বোলপুর

ব্যাখ্যা---মানিকবাবু—কুড়িয়ে পাওয়া মানিক—শ্রীজীবনকৃষ্ণ।

জীবনকৃষ্ণ—বর্তমানে সমষ্টি চৈতন্যরূপে জীবনকৃষ্ণের যে নতুন প্রকাশ। জীবনকৃষ্ণের দেহে সাধন হয়েছে। সেই সাধনের ফল এ যুগে সাধারণ মানুষকে দান করছেন সমষ্টিচৈতন্য রূপে প্রকাশ পেয়ে।।

কাল ও কালী

● দেখছি (11.05.2020)—জীবনকৃষ্ণ কানে দুল পরে আছেন আর তাঁর জিভটা বিরাট লম্বা টকটকে লাল। তিনি ঐ জিভ দিয়ে আমায় চেটে দিচ্ছেন। মাথা পর্যন্ত তাঁর মুখের লালা লাগলো। বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা অনুভূতি হলো, খুব ভালো লাগলো। শান্তি পেলাম। তারপর দেখছি কদমতলার ঘর কিন্তু দেখতে ঠিক আমার মামার বাড়ীর মতো। ওখানে পাঠের অনেক লোকজন রয়েছে। সকলের জিভ লাল টকটকে। আয়নাতে দেখলাম আমার জিভটাও লাল টকটকে—যেন মা কালী। তখন সকলে হাতে হাত মেলানোর মতো করে জিভে জিভ মেলালো।.....

—মৌমিতা মুখার্জী
চন্দননগর

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...27

ব্যাখ্যা---কালী কে না যিনি মহাকালের সঙ্গে রমন করেন। মহাকাল জীবনকৃষ্ণের সাথে রমনে (জিহ্বার স্পর্শ দ্বারা)—দেহ আত্মার মিলনে মানুষ কালী হয়ে ওঠে—যোগযুক্ত হয়। এরূপ বহু মানুষ পরস্পর পরস্পরের অনুভূতি ও উপলব্ধির বিনিময়ে দেহ আত্মার রমন—মহাকালের সাথে মিলন সুখ অনুভব করে।।

● দেখছি (13.05.2020)—নৌকা চড়ে সমুদ্রের উপর ভেসে চলেছি। গায়ে পোষাক নেই। সমুদ্রে অনেক পদ্ম ফুটেছে। একটা পদ্ম তুলে নিলাম। দেখি তার ভিতর জীবনকৃষ্ণ বসে রয়েছেন। খুব আনন্দ হল।....

সৃজিতা বারিক (৬-বছর)
আমতলা

ব্যাখ্যা---রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি ব্রহ্ম সঙ্গীতে নিজে জলের কোলে পদ্মের মতো হয়ে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। স্বপ্নটিতে দেখা যাচ্ছে শিশুটির সহস্রার পদ্মের মতো বিকশিত হচ্ছে। আর এই বিকাশের মূলে যে জীবনকৃষ্ণ সেটাও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তার সাথে অন্য বহু মানুষের সহস্রারও যে বিকশিত হচ্ছে সেটা দ্রষ্টার চোখে ধরা পড়ছে।

যদিদং হৃদয়ং তব

● স্বপ্নে দেখছি (1.5.2020)—জয়দাকে জিজ্ঞেস করছি—"যদিদং হৃদয়ং তব, তদিদং হৃদয়ং মম"—এই যে মন্ত্রটা বিয়ের সময় বলে এর মানে কী? তখন জয়দা উত্তরে বলল, মানুষের ভিতর যে বৃহৎ মানুষ আছে তার সঙ্গে মিলনের জন্য এটা বলে। স্বপ্ন ভাঙলো। শঙ্খকে স্বপ্নটা বললাম। ও বলল, হ্যাঁ। ঐ মানেটাই হবে। তখন পুরোপুরি ঘুম ভাঙলো। বুঝলাম স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন দেখছিলাম।

---শাশ্বত চ্যাটার্জী
ইলামবাজার

● দেখছি (31.01.2020)—স্নেহময়দার সাথে একজনের গভীর আলোচনা হচ্ছে। হঠাৎ আমাকে কে যেন প্রশ্ন করল, তূরীয় অবস্থাটা কী? আমি বললাম, তূরীয় হল কুয়াশা দেখা যায় যে স্বপ্নে। উনি বললেন, হ্যাঁ ঠিক। তবে কুয়াশা মানে রহস্য—সেই রহস্য ভেদ হতে হবে। জেনো তূরীয় অবস্থার অনুভূতি মানেই তা শুদ্ধতম নয়। তূরীয় অবস্থার ৫টি ভাগ আছে। ৫টি ভাগের অনুভূতি হলে তবে তার রহস্য ভেদ হবে। দেওয়ালে ৫টি ধাপের নাম ফুটে উঠল। ঐ ৫টি ধাপের অনুভূতি হলে তূরীয় অবস্থার রহস্য ভেদ হবে। তখন দ্রষ্টার তূরীয় অবস্থার অনুভূতি হবে শুদ্ধতম।....ঘুম ভাঙলো চরম বিস্ময় নিয়ে।

—রূপা মাজি
আমতলা, দ: ২৪ পরগণা

এ কেমন আঘাত

● দেখছি (মার্চ, 2020)—বাবাই (সব্যসাচী) আমাকে হঠাৎ একটা টিউব লাইট দিয়ে আঘাত করল। কাঁচগুলো গায়ে গেঁথে গেল। কেন মারলো তার কোনও কারণ বুঝতে পারছি না। খুব ব্যাথা লাগলো। দাদা (চন্দ্রনাথ) গায়ে হাত দিয়ে বলল, ওই কাঁচের সাথে সোডিয়াম রয়েছে। তোকে আর বাঁচানো যাবে না। আমি ভাবছি এটা কী হলো। এমন মারলো যে আর বাঁচবো না! কেনই বা মারলো? এসব ভাবতে ভাবতে ঘুম ভাঙলো।

—জয়কৃষ্ণ চ্যাটার্জী
জামবুনি, বোলপুর

ব্যাখ্যা---সব্যসাচী—যার বাঁ হাত শক্তিশালী। বাঁ-হাত আত্মিক জগতের প্রতীক। সব্যসাচী হল আত্মিক জীবনের অধিকারী মানুষদের প্রতিনিধি। টিউব লাইটের কাঁচ—দর্শন-অনুভূতি- জ্ঞানালোকের আধার। আঘাত—দ্রষ্টা মানুষের দর্শন-অনুভূতি দেহ দিয়ে বুঝছে ও দেহজ্ঞান আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে চিরতরে নাশ হতে চলেছে। চন্দ্রনাথ—শিব অর্থাৎ জীবনকৃষ্ণ। সোডিয়াম—নুনের প্রধান উপাদান। নুন হল রামরস—একত্বের অনুভূতি।

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...29

সোডিয়াম আছে, তাই মৃত্যু নিশ্চিত—সকলের সাথে আত্মিক একত্বের অনুভূতির কথা শুনতে শুনতে ব্যক্তিসত্তা লোপ পাবে।

● দেখছি (18.04.2020)—একটা ঘরে ল্যাপটপ সামনে নিয়ে জয় চেয়ারে বসে আছে। আমি ও অমরেশদা ওর সামনে সোফায় বসে আছি। জয় আমাদেরকে বলল, তোমরা এত চিন্তা করছ কেন? সব এখান থেকে হয়ে যাবে।...

---প্রশান্ত রুজ
বোলপুর

মান্না দে খাওয়াবেন

● দেখছি (16.12.2020)—কোথাও একটা গেছি। সেখানে দোতলার ওপরে একটা ঘরে খাওয়া দাওয়া হচ্ছে। আমার হাতেও খবরের কাগজের মধ্যে খাবার। আমি খেয়ে কাগজটা ডাস্টবিনে ফেলে দিলাম। কিন্তু ফেলেই দেখছি ওতে একটা ডিম ছিল। তখন মনে হল এ মা, ডিমটা না খেয়েই ফেলে দিলাম। আমি সাথে সাথে ডিমটা তুলে নিয়ে পাশের একটা ঘরের দিকে মান্না দে-র খোঁজ করতে গেলাম। উদ্দেশ্য ডিমটা মান্না দে-কে খাওয়াবো। পাশের ঘরে দেখি একজন বয়স্ক লোক শুধু কোমরে লুঙ্গি জড়িয়ে বসে আছে। তার নিম্নাঙ্গ সবই দেখা যাচ্ছে। সেই লোকটি জিজ্ঞাসা করলো—কাকে খুঁজছ? আমি বললাম, মান্না দে-কে। উনি বললেন, আমি মান্না দে। আমি তখন ওনাকে ডিমটা দিলাম। উনি খেয়ে নিলেন। আমি ফিরে আসতে আসতে ভাবলাম ওনাকে নিয়ে আগে আমি যে একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম—ওনার পাশে বসে রিক্সা চড়ে কোথায় যেন যাচ্ছি তা তো বলাই হ'ল না! ঘুম ভাঙল।

—বনানী পোদ্দার
লণ্ডন, U.K.

ব্যাখ্যা---খবরের কাগজে খাওয়া-বাইরের জগতের বিচিত্র আনন্দ রস গ্রহণ। ডিম—অন্তর্মুখী প্রাণশক্তির ঘনীভূত রূপ তথা আত্মিক দর্শন—অনুভূতি।

ডিম ডাস্টবিনে ফেলা—দর্শন-অনুভূতিকে মূল্য না দেওয়া, অগ্রাহ্য করা। মান্না—ঈশ্বরীয় খাবার। মান্নার এক অর্থ দর্শন-অনুভূতি। ঈশ্বরীয় অনুভূতি ধরে ধরে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায়। মান্না দে ডিমটা খেলেন—আমাদের দর্শন-অনুভূতি ঈশ্বরের খাবার। পাঠচক্রে আলোচনার মাধ্যমে তিনি তা গ্রহণ করলে দর্শনের মর্মভেদ হয়, দ্রষ্টা দর্শনের শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। রিক্সায় দুজনে যাওয়া—দ্বৈতবাদে ভগবৎলীলা আস্বাদন। ওটি আগে দেখা স্বপ্ন—যুগ বদলে গেছে, এখন একত্ববোধ দ্বারা পরিচালিত হওয়াই জীবনের লক্ষ্য।

মৈত্রেয় বুদ্ধ

● দেখছি (2.1.2020)—একটা রসগোল্লা হাতে নিয়ে যেই খেতে গেছি পাশ থেকে জয়দা বলল, যে কোন রসগোল্লা খাস না। যে রসগোল্লা জলে দিলে ডুবে যায় সেটা খাবি। আর যদি জলে ভাসে তাহলে খাবি না, সেটা বাজে। আমি তখন রসগোল্লাটা বাটির জলে দিয়ে দেখলাম। সেটা ভাসতে লাগল। তখন ঠিক করলাম ওটা খাব না।

—সাগর ব্যানার্জী
বোলপুর

ব্যাখ্যা—হালকা আনন্দের বস্তুকে নিয়ে ভোগে মত্ত থাকলে চলবে না। যার যথেষ্ট ওজন বা গুরুত্ব আছে সেই ঈশ্বরবস্তুর রসাস্বাদন করতে বলা হচ্ছে।

● দেখছি—মৈত্রীর সাথে বিয়ে হবে আমার বাবার। বাবাকে দেখছি—কিন্তু কিছুক্ষণ পর দেখি মৈত্রীর সাথে বিয়ে হবে দাদার (সৌম্যদীপ)। যখন বিয়ে হচ্ছে তখন দেখি পাত্র আমার দাদা নয়, পাত্র আমার বন্ধু সূর্য।

স্বপ্ন ভাঙলো। মনে হল বাবা অমিতাভ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বাকীটার অর্থ করার আগেই ঘুম ভেঙে গেল।

—সোহিত্রী সেন
নিউ আলিপুর, কলকাতা

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...31

ব্যাখ্যা—

বাবা অমিতাভ—শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্যষ্টিচৈতন্য।

দাদা সৌম্যদীপ—শ্রীজীবনকৃষ্ণ—জগৎচৈতন্য।

বন্ধু সূর্য—নির্গুণের ঘনমূর্তি তথা সমষ্টিচৈতন্যের মূর্তরূপ যিনি—মৈত্রী স্থাপনের শক্তি তারই অধিগত হবে। তারই আয়োজন শুরু হয়েছে।

নিরুদ্দেশ

● দেখছি (6.12.19)—বাবা খবরের কাগজ পড়ছে। সেখানে নিরুদ্দেশ খবরে জীবনকৃষ্ণের ছবি দিয়ে কী লেখা হয়েছে তা আমাকে বাবা দেখালো। লেখা আছে—নিখোঁজ হবার সময় উনি খালি গায়ে ধুতি পরে ছিলেন। ওনার নাম জীবনকৃষ্ণ ঘোষ। বয়স ১৫৩ বছর। ...খুব অবাক হলাম। ঘুম ভাঙলো।

—প্রার্থিতা ঘোষ
বেলঘরিয়া

ব্যাখ্যা ঃ

জীবনকৃষ্ণ নিরুদ্দেশ—অর্থাৎ ব্যাকুল হয়ে তাঁকে খুঁজতে হবে, তাঁর সত্য পরিচয় জানতে হবে। তার বয়স ১৫৩ মানে—

(১) তাঁকে জানা গেলে নিজেকে জানা হবে। কেননা ইহুদীদের হিব্রু ভাষায়—I am God (আমিই ঈশ্বর) কথাটি ১৫৩ সংখ্যা দিয়ে বোঝানো হয়।

(২) আবার বাইবেল অনুসারে ১৫৩ সংখ্যাটি হল জগৎচৈতন্যের (Sum total of all individuals) বা অখণ্ডচৈতন্যের প্রতীক। শ্রীজীবনকৃষ্ণের এই পরিচয় উপলব্ধি করতে হবে নিরবচ্ছিন্ন মননের দ্বারা।

● দেখছি (21.12.19)—এক জায়গায় আমরা পাঠের অনেকে আছি। পরস্পর পরস্পরকে প্রণাম করছি। ভাবলাম জয়দা-কে তো দেখছি না। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে জয়দা বেরিয়ে এল। জয়দা সকলকে প্রণাম করতে লাগলো। কিন্তু কী আশ্চর্য জয়দাকে কেউ প্রণাম করছে না। অবাক হলাম।...

ব্যাখ্যা ঃ—শ্রীজীবনকৃষ্ণ জোড়হাত করে ভক্তদের প্রণাম জানাতেন তাদের চৈতন্য জাগিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে। চৈতন্য জাগ্রত হলে তারা মানব ব্রহ্মকে চিনতে পারবে। অথচ তিনি কারও প্রণাম নিতেন না। বলতেন তোরা আর আমি এক। তাঁর স্বরূপ জানলে ব্যক্তিপূজার সংস্কারও কাটবে। তাই কেউ তাঁকে প্রণাম করছে না।

---অমৃত চ্যাটার্জী
ইলামবাজার

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...33

পাঠ প্রসঙ্গে

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...35

পাঠ প্রসঙ্গে

পাঠ ও আলোচনা প্রসঙ্গে যে সব নতুন কথা উঠে আসে তারই কিছু নির্বাচিত অংশ এখানে উল্লেখ করা হল।

● **তিনিই নিমিত্ত কারণ, তিনিই উপাদান কারণ (কথামৃত)।**

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীজীবনকৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখা দিলেন ১২ বছর ৪ মাস বয়সে। তখন থেকে তার জীবনে দর্শন অনুভূতির স্রোত বইতে লাগল। পরে এক স্বপ্নে বিবেকানন্দ তাকে রাজযোগ শেখালেন। তিনি বললেন, ঠাকুরই একরূপে রাজযোগ শেখালেন। অর্থাৎ তাঁর আত্মিক জগতের নিমিত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ আবার উপাদানও শ্রীরামকৃষ্ণ বলে তিনি বুঝেছেন। ধীরে ধীরে তিনি রামকৃষ্ণময় হয়ে উঠলেন।

পরে এই অবস্থা অতিক্রম করায় অসংখ্য মানুষ তাকে ভগবান হিসাবে স্বপ্নে দেখতে লাগল। তিনি বললেন, আমার ভিতর আত্মা সৃষ্টি হল, সেই আত্মার মধ্যে জগৎ দেখলাম। সেই জগৎ বিক্ষেপ করে সেখানেই বাস করছি বেদ কথিত ঊর্ণনাভ-এর মতো, যে নিজের ভিতর থেকে জাল বের করে সেই জালেই বাস করে। তখন আর তিনি নিমিত্ত ও তিনিই উপাদান না বলে বললেন ''আমি নিজেই আমার আত্মিক জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ এবং আমিই এর উপাদান কারণ।'' দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন, ১২ বছর বয়স থেকে তিনি ভিতরে যে শ্রীরামকৃষ্ণের রূপ দর্শন করেছেন তা তারই চৈতন্য ঐ রূপ ধারণ ক'রে অতীতে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে চৈতন্যের যে লীলা হয়েছিল তার পরিচয় দান করল। এবার শুরু হয়েছে নিজেকে জানা।

তিনি একবার স্বপ্নে দেখলেন, জগৎ দুভাগ হয়ে গেল। একদিকে ঘরবাড়ি, গাছপালা, লোকজন সব, অন্য ভাগে কিছু নেই। সেই ভাগে পঞ্চানন নামে একজন লোক তাঁর হাত ধরে নাচছে আর বলছে, ''খাটবি খাবি, খাটবি খাবি।''

উনি প্রথমে বলেছিলেন, এই স্বপ্নে তাঁকে ঠাকুর জানিয়েছেন খেটে খেয়ে আদর্শ জীবন যাপন করতে হবে, তাহলে ঠাকুর তাকে কেন্দ্র করে

অভিনব এক আত্মিক জগৎ সৃষ্টি করবেন। বহু পরে বুঝলেন, পঞ্চানন তারই Universal self, ভ্রূণাকারে। তারই বৃহৎ সত্তা বিকশিত হয়ে বিশ্বব্যাপী সম্পূর্ণ নূতন এক আধ্যাত্মিক জগৎ সৃষ্টি করার কথা জানিয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহস্থ চৈতন্যের লীলা মূলত তার নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাইরের জগতে তার যথেষ্ট বিকাশ লাভ ঘটেনি, স্পষ্ট রূপে ধরা পড়েনি তাঁর ভক্তদের মধ্যে, এমনকি তাঁর সৃষ্ট আত্মিক জগতের অন্তর্ভুক্ত অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছেও।

শ্রীজীবনকৃষ্ণের চিন্ময়রূপ ফুটে উঠল জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষের অন্তরে। বোঝা গেল তাদের আত্মিক জীবনের নিমিত্ত হলেন তিনি, আবার উপাদানও তিনি। তাই সাধারণ মানুষ যখন স্বপ্নে অজানা মানুষ দেখে বা কল্যাণ, সূর্য, সত্য, জয় ইত্যাদি নামে একজন মানুষকে দেখে তখন বুঝতে পারে এসব দর্শন আসলে প্রতীকে জীবনকৃষ্ণকেই দেখা। কেননা আত্মিকে তাদের পৃথক স্বতন্ত্র সত্তা নেই। সমগ্র আত্মিক জগৎ একজনের (জীবনকৃষ্ণের) ভিতরে। তাই তাকে পূর্ণ পুরুষ রূপে, ভগবান বা ব্রহ্ম রূপে অসংখ্য মানুষ দেখে।

পরে তাঁর সাথে একত্ব লাভ হলে সাধারণ মানুষও বলতে পারবে এক অখণ্ড চৈতন্যই আত্মিক জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান। আছে শুধু এক। তখন তিনি ও আমি নেই—সব নিয়ে এক।

● **যদি জানতুম জগৎ সত্য তাহলে কামারপুকুর সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিতুম।---শ্রীরামকৃষ্ণ।**

বেদ বলছে, ঊর্ণনাভের মতোই প্রত্যেক মানুষ ভিতর থেকে জগৎ বিক্ষেপ করে সেই জগতে বাস করে। সেই জগৎ পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার (interaction-এর) বা relationship এর জগৎ। ইঁট কাঠ পাথরের স্থূল জগতের ন্যায় এই জগৎও সদা পরিবর্তনশীল। কেননা জগৎ বিক্ষেপ চলে নিরবচ্ছিন্নভাবে (Continuously)। অপরপক্ষে চৈতন্যময় পুরুষ জানেন জড়বাদী দৃষ্টিতে এই জগৎকে খুঁজে পাওয়া যায় না। সত্য হল এক। একং সৎ। যিনি সেই একককে, ব্রহ্মকে, অখণ্ডচৈতন্যকে ভিতরে পেয়েছেন তিনি তাঁর ভিতর সমগ্র জগৎকে দেখেছেন। বুঝেছেন, আত্মা বা ব্রহ্মই এই জগৎ হয়েছেন। সেই জগৎ বাইরে বিক্ষেপ করে দেখেন নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়।

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...37

চৈতন্যময় মানুষগুলিকে নিয়ে তার জগৎ। সেখানে জড় জগৎ তথা কামারপুকুরের বা অন্য কোন স্থানের কোন গুরুত্ব নেই। তাই কামারপুকুরকে সোনা দিয়ে বাঁধাবার কোন প্রশ্নই নেই।

যদি কেউ বলে কামারপুকুর ঠাকুরের জন্মস্থান, বাল্য লীলার স্থান, সেখানে বহু স্মৃতি ছড়িয়ে আছে- তার তো মূল্য আছে। তাহলে বলতে হয় মানুষের মধ্যে চৈতন্যময় পুরুষ হিসাবে তার জন্মলাভ, তাঁর বাল্যলীলা ইত্যাদি জানতে গেলে যোগের দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণলীলা দেখতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহমধ্যস্থ আত্মিক জগতের বিকাশ এবং তাকে বাইরে বিক্ষেপ করে যে রামকৃষ্ণময় জগৎ তিনি সৃষ্টি করেছিলেন ও তাঁর মধ্যমণি হয়ে তা উপভোগ করেছিলেন সেই জগতের যথাযথ পরিচয় তুলে ধরলে তাঁর মহাযোগীর জীবন, আদর্শ জীবনটি পরিস্ফুট হবে। শ্রীজীবনকৃষ্ণ ঠাকুরের এই জীবন ও তার অমৃতবাণীর যৌগিক রূপ দান করে রামকৃষ্ণের জগৎকে সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছেন।

ঠাকুর নিজের মুক্ত অবস্থা বোঝাতে গল্প করে বলছেন, ''যা শালার ঘর।''। এই অবস্থাটা আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল জীবনকৃষ্ণের জীবনে। তাই তিনি বললেন, ''সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।'' সত্যলাভ হলে সাধকের এই বিদেহ মুক্ত অবস্থা হয়। তখন বাইরের জগতে কামারপুকুর আমার জন্মস্থান, পুণ্যভূমি, এই ভাবনা মায়া, মিথ্যা বলে উপলব্ধি হয়।

● **যেমন কেউ বাড়ির কার্নিসের উপর বীজ রেখে গিয়েছিল। অনেকদিন পরে বাড়ী ভূমিসাৎ হয়ে গেল। তখনও সেই বীজ মাটিতে পড়ে গাছ হল ও তার ফল হল।**

কার্নিস=ষষ্ঠভূমি। বীজ=ব্রহ্মবীজ-নাম নামী অভেদ—তাই এক অর্থে তা নাম বীজ। কার্নিসের উপর বীজ রাখা—ষষ্ঠ ভূমির সংস্কারজ ইষ্টের নাম জপলেই অমৃতফল লাভ হবে—চৈতন্য লাভ হবে—এই তত্ত্ব ভক্তের জগতে দান করা। মহাপ্রভু বললেন, কৃষ্ণকথা কহ জীব, কৃষ্ণকথা কহ। এই ইষ্টদেবতা কৃষ্ণের নাম অহরহ জপলেই, কৃষ্ণচিন্তায় মন মগ্ন থাকলেই পরমজ্ঞান লাভ হবে। অনেকদিন পরে—৩৫০ বছর পরে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে। বাড়ী ভূমিসাৎ হল—মহাপ্রভু প্রদত্ত ঈশ্বরীয় ধ্যানধারণার আমূল পরিবর্তন হল। জানা গেল অহরহ কৃষ্ণনাম বা অন্য কোন ইষ্টনাম জপ

করলে ও হাজারো কৃচ্ছ্রসাধন করলে অর্থাৎ কঠিন কঠোর সংস্কারজ ধর্মীয় বিধি মেনে চললেও দেহে সাধনবৃক্ষ জন্মায় না। তাই ঠাকুর বললেন, চৈতন্যদেব যা করে গেল তারই বা কী রইল বল দেখি!

১১ বছর বয়সে আনুড় গ্রাম যাবার পথে জ্যোতিদর্শন করে শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি হয়। তিনি বলছেন, তখন থেকে আমি অন্য মানুষ হয়ে গেলাম। ভিতরে আর একজনকে দেখতে পাই, সে-ই সব করে। সত্যিকার ভক্তি জাগল। শিব,কালী, রাম,কৃষ্ণ ইত্যাদি নানান ইষ্ট মূর্তির লীলা কাহিনী শ্রবণ মননের মধ্যে দিন কাটাতেন। দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মূর্তির কাছে আকূল প্রার্থনা জানালেন দর্শন দেবার জন্য। দেখা দিবি নে?—বলে মায়ের হাতের খড়্গ নিয়ে গলায় চোপ দিতে গেলে দেখলেন, একটার পর একটা স্নিগ্ধ জ্যোতির তরঙ্গ এসে তাকে ডুবিয়ে দিল, লাভ করলেন পরম শান্তি। এরপর জ্যোতির সমুদ্রে অঙ্গুষ্ঠবৎ ঘনজ্যোতি রূপে আত্মা বা ভগবান দর্শন হল। বুঝলেন, ভগবানের কৃপায় ভগবান দর্শন হয় আর সেই ভগবান কোন সংস্কারজ ইষ্টমূর্তি নয়। বললেন, মা আমার বাহ্য পুজো তুলে দিয়েছেন। তিনি বললেন, তোমরা যাকে ব্রহ্ম বল আমি তাকেই মা বলি। তাঁর এই মা যে ভবতারিণী মূর্তি নয় তা বুঝে নিরাকারের উপাসক ব্রাহ্ম ভক্তরাও তাদের সমাজে ব্রহ্মকে মা সম্বোধন করে গান গাওয়া শুরু করল।

মাটিতে পড়ে গাছ হল ও ফল হ'ল—মাটি মানে দেহ। পরম জ্যোতি দর্শন করে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে ব্রহ্মবীজ ক্রিয়াশীল হ'ল—সাধনবৃক্ষ বিকশিত হল। আগমের সাধন শেষে অহংশূন্য অবস্থা হওয়ায় বটগাছ দর্শন ও নিগমের সাধন শেষে আমগাছ দর্শন হয়। নিগমের সাধন শেষে ঠাকুর অবতার হলেন—তার দেহে অমৃত বৃক্ষ হল—আম অর্থাৎ অমৃত ফল ফলল। তাই ভক্তদের বলতেন, আম খেতে এসেছ আম খেয়ে যাও। গাছে কত পাতা, কত ডালপালা সে সব খবরে কাজ কী। কারণ বস্তুতত্ত্বে সাধন না হলে ডালপালা ও পাতার খবর মাথায় ধারণা হয় না।

পরবর্তীকালে আবার ঐ বাড়ী ভাঙা হ'ল এবং আধুনিকীকরণ করা হল। অবশ্য ভিত ঠিক রেখে তারই উপর নতুন ইমারত গড়লেন শ্রী জীবনকৃষ্ণ। তার দেহ জমিতে বীজ পড়ল—শ্রীরামকৃষ্ণের রূপ ফুটে উঠল তার দেহে। যখন জানলেন, যাঁকে দেখেছেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ তখন থেকে ভিতরে রামকৃষ্ণনাম হতে লাগল আপনা হতে। এই নাম বীজ বিকশিত হল, তিনি

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...39

রামকৃষ্ণময় হলেন, রামকৃষ্ণের দেবত্ব পূর্ণমাত্রায় লাভ হল তার। কিন্তু শুধু আম খেয়েই তৃপ্ত হলেন না, তার মধ্যে ব্রহ্মের আরও চমকপ্রদ বিকাশ হল—তার দেহে পেঁপে ফলল—ভূমানন্দ লাভ হল। তিনি বিশ্বব্যাপী হলেন—সর্বজনীন ও সর্বকালীন হলেন—জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষ তাকে অন্তরে দর্শন করতে লাগল।

ব্রহ্ম স একঃ। আত্মিকে এক তিনিই আছেন জানা গেল। তার চিন্ময় রূপে একের একত্ব বা ব্রহ্মত্ব লাভে সবার সমান অধিকার। যেমন আকাশে এক সূর্য—তার আলো সকলকার। ঐ আলো অসংখ্য পুষ্করিণীতে অসংখ্য প্রতিবিম্ব সূর্য সৃষ্টি করে। এই প্রতিবিম্ব সূর্যগুলি আকাশের সূর্যের গুণ পায়। আত্মিক একত্ব দানই প্রকৃত ধর্ম। শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেহে ধর্মের এই বিচিত্র ও অভিনব বিকাশের ভিত্তি হল ব্যষ্টির সাধন, যার অনেকখানি শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে প্রথম ফুটেছিল। শ্রী জীবনকৃষ্ণ বলেছেন বিশ্বব্যাপীত্ব লাভই ব্রহ্মবিদ্যার চূড়ান্ত ফল নয়, আরও বিকাশ বাকী আছে। এর পূর্ণ বিকাশ ঘটলে একজনের মস্তিষ্কে উদ্ভুত চিন্তা দ্বারা সমগ্র আত্মিক জগত নিয়ন্ত্রিত হবে। মানুষ আত্মিক কৃষ্টির সুফল লাভ করবে।

● **রথে অর্জুন ও কৃষ্ণ ঃ**

মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণকালে একদিন এক মন্দিরে দেখলেন, এক ভক্ত গীতাপাঠ শুনছে আর অঝোরে কাঁদছে। ভক্তটিকে প্রভু জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাঁদছ কেন? ভক্তটি বলল, আমি সংস্কৃত জানি না। তাই গীতার কথা বুঝছি না। কিন্তু আমি দেখলাম একটা রথে অর্জুন বসে আছে আর ভগবান কৃষ্ণ তাকে উপদেশ দিচ্ছে। এই দেখে আনন্দে কাঁদছি।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর কুঠিবাড়ীতে বসে দর্শন করলেন গঙ্গার তীরে একটি সুদৃশ্য রথ। তাতে অর্জুন বসে আর শ্রীকৃষ্ণ তাকে উপদেশ দিচ্ছেন।

এ যুগে, শ্রীজীবনকৃষ্ণ ভগবান দর্শনের বহু পরে (১৯৩০) একদিন স্থূলে দর্শন করলেন, তার দেহ থেকে পার্থসারথি বেরিয়ে বাম উরুর উপর বসলেন। তার গায়ে গয়না (তাবিজ, হার ইত্যাদি) হাতে ছড়ি। কিছু পরে ঐ মূর্তি তার দেহে ঢুকে গেল।

৫০০ বছর আগে ঐ ভক্তটি দেখলেন ও বুঝলেন, কৃষ্ণ অর্জুনের রথ পরিচালনা করেছিলেন এবং গীতার উপদেশ দান করেছিলেন—এটি সত্য! অর্থাৎ পুরাণ সত্য।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ তার দর্শনটি থেকে বুঝেছিলেন, ভগবান ভক্তের দেহরথে প্রকাশ পেয়ে, জ্ঞান দান করে ধর্মপথে এগিয়ে নিয়ে যান। তাই বললেন, ঈশ্বর আর হৃদয়মধ্যে যিনি আছেন—এই দুই-ই এক। তবে ঠাকুরের দর্শন হল প্রতীকে। প্রতীকার্থ ভেঙে না বলায় এই দর্শন শুনে মানুষ পূর্বের ভক্তটির মতো বিভ্রান্ত হবে। পুরাণকে সত্য ভাববে। প্রতীক দর্শন হলেও যেহেতু তা সংস্কারজ মূর্তি ধরে প্রকাশ পেয়েছে তাই তা নিম্নাঙ্গের দর্শন।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ তার দর্শন থেকে বুঝলেন—পার্থসারথি তাঁরই দেহরথে আসীন। দর্শন অনুভূতি যা হয়, তা সবই তার আত্মিক বিকাশ, ভিতর থেকে হয়। এখানে অর্জুন বা পার্থ নেই। তাই এই পার্থসারথি তিনি নিজেই। নিজেই নিজের চালক। তাই তাঁর সাথে কোন কথা হল না। বাস্তবিক পরবর্তীকালে তিনি বহু মানুষের (পার্থ) দেহ মধ্যে পার্থসারথি রূপে প্রকাশ পেয়েছেন।

শ্রীজীবনকৃষ্ণের দর্শনটি প্রতীকে নয়, বস্তুতত্ত্বে—তাই পরবর্তীকালে তিনি পার্থসারথি হয়ে গেলেন। এটি অতি উচ্চাঙ্গের দর্শন।

● **চশমা ঃ**

শ্রী জীবনকৃষ্ণের একসময় চোখে চালসে ধরেছিল। চশমা নিতে হল। কিছুদিন পর এক স্বপ্নে দেখলেন, বিছানার ডানদিকের দেওয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি। সেই ছবিতে ঠাকুরের চোখে চশমা। চশমাটা খুলে ওনার বিছানায় পড়ল। উনি চশমাটা ধরতে গেলেন, কিন্তু পারলেন না। ঘুম ভাঙল।

এই স্বপ্নের পর অফিস গিয়ে দেখেন চশমা ছাড়াই সব দেখতে পাচ্ছেন (১৯৪৯-এ)।

দশ বছর পর একদিন উনি স্বপ্নটা বলে বললেন, "ঠাকুরের চশমা খোলার স্বপ্নের অর্থ আজ বুঝতে পেরেছি। আমি এতদিন ঠাকুরের চশমা দিয়েই জগৎ দেখছিলাম। আর এখন নিজের চোখ দিয়ে অর্থাৎ নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে জগৎকে দেখছি।"

ভক্তিরসে অনেক সময় দৃষ্টিশক্তি ফেরে। ত্রাটক করে ঠাকুরেরও দৃষ্টিশক্তি কমে গেছিল। কিন্তু পরে স্বাভাবিক হয়ে যায়। জীবনকৃষ্ণেরও দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল। কিন্তু তা নাও হতে পারত যদি বেশি চোখ খারাপ হতো।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ ১৯৬৩ সালে এক স্বপ্নে দেখলেন, জগদ্বন্ধুর মুখ এক সাধু জীবনকৃষ্ণের দিকে ঘুরিয়ে দিল। জগদ্বন্ধুর চোখে চশমা। উনি স্বপ্নটা বলে কোন মানে করলেন না।

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...41

চশমার দুটি মানে। এক—অপরের দৃষ্টিভঙ্গী। দুই—স্বচ্ছ দৃষ্টি (Clear vision)। জীবনকৃষ্ণ এক আবার বহু, জগৎময়। যেখানে তিনি বহু, জগৎ ব্যাপ্ত সেখানে তিনি জগৎবন্ধু। এই বহুর মধ্যে প্রকাশিত জীবনকৃষ্ণ পরম একের দিকে তাকাল। এবং তার দৃষ্টি শক্তি স্পষ্ট হয়েছে চশমা পরায়। সাধুটি—জীবনকৃষ্ণেরই দেবত্ব। তারই দেবত্ব দ্বারা তিনি বিষয়টা Controll করবেন। আমরা তাকে ভিতরে পেয়ে পরম এক জীবনকৃষ্ণকে বুঝতে পারব। স্পষ্ট দেখতে পাব। স্বচ্ছ ধারণা হবে। এটি ভবিষ্যৎ দর্শন করেছিলেন। কারণ সাধারণত বয়স হলে তবে মানুষ চশমা পরে। বর্তমানে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী আরও স্বচ্ছ হচ্ছে—তিনিই জগদ্‌বন্ধু হয়ে আসলে নিজেকে নিজে দেখছেন।

জীবনকৃষ্ণ অনেকদিন আগেই জগদ্‌বন্ধু হয়েছিলেন কিন্তু তখন সেই জগদ্‌বন্ধুর দৃষ্টি তার দিকে পড়েনি। এতদিনে জগদ্‌বন্ধুর দৃষ্টি, সাথে সাথে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি পরম একের দিকে পড়ছে।

সম্প্রতি স্নেহময় দেখল (২০শে এপ্রিল, ২০২০)—যখনই একা হয়ে যাচ্ছে, দুশ্চিন্তা গ্রাস করছে, অমনি সোহিত্রী এসে একটা গগল্‌স্ দিচ্ছে। মন আনন্দে ভরে যাচ্ছে। চিন্তা মুক্ত হয়ে যাচ্ছে, কোন tension থাকছে না। Sunglass পাচ্ছে সোহিত্রী তথা সকলের মঙ্গলাকাঙ্খী জীবনকৃষ্ণের কাছ থেকে। চৈতন্য নতুন তেজে প্রকাশ হচ্ছে, সেটি যাতে ধারণা করে আনন্দময় জীবনলাভ করা যায় তার জন্য দেহটিকে উপযুক্ত করে দিচ্ছেন, Sunglass দিচ্ছেন।

● **রামায়ণ রচনা ঃ**

শোকাহত আদিকবি বাল্মিকীর মুখনি:সৃত প্রথম শ্লোকটি ছিল এরূপ—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বম্ অগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ

যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাং একম্ অবধীঃ কামমোহিতম্।"

এর সরল অর্থ : নিষাদ, তুই চিরকাল প্রতিষ্ঠা লাভ করবি না। কারণ তুই কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে বধ করেছিস।

যোগের দৃষ্টিতে—ঐ ক্রৌঞ্চটি বাল্মিকী নিজে। তার পুরুষ সঙ্গীটিকে নিষাদ (ব্যাধ) অন্তরাল থেকে মেরে ফেলল অর্থাৎ তার আসক্তি উদ্রেককারী বিষয়গুলিকে, তার অবলম্বনকে অলক্ষ্য থেকে ঈশ্বর আঘাত হেনে সরিয়ে দিলেন। অন্তরাল থেকে রামের বালীবধের ন্যায়।

ঈশ্বর চিরকালীন, শাশ্বত পরম পুরুষ রূপে প্রতিষ্ঠিত। কামমোহিত

ক্রৌঞ্চের ন্যায়, ক্রৌঞ্চ মানে কুঁচবক যিনি কুঁজো হয়ে মাছ ধরেন, সরলভাবে নয়। যিনি বিষয়ানন্দ ভোগের মধ্যে থেকেও ঈশ্বরকে পেতে চান, তার মহিমা জানতে চান। তিনি বিষয়সুখ বঞ্চিত হলেই ঈশ্বরের চিরমঙ্গলময় রূপ অস্বীকার করেন।

পরে তার উপলব্ধি হয়—"আমি বহু বাসনায় প্রাণপনে চাই বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে।" তখন নিষাদ তথা নির্গুণ ব্রহ্ম সাকারে সগুণে মানব ব্রহ্মরূপে দেহ মধ্যে প্রকাশ পান। দেহ মধ্যে ব্রহ্মের এই বিকাশ ধারাটি তার কাছে স্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হয়। তিনি রামায়ণ তথা রামের অন্তর্জগতে যাত্রাপথ বিবৃত করেন, যার সত্যতা সেই মুহুর্তে মানুষ উপলব্ধি করে না, করে বহু পরে। তাই বলা হয়, রাম জন্মাবার আগেই রামায়ণ রচিত হয়েছিল।

বাল্মিকী কে? বল্মীক অর্থাৎ উইপোকার ঢিপি দিয়ে ঢাকা যার শরীর—যে বুঝেছে দেহটা মাটি, আমি দেহ নই, আমি আত্মা— ব্রহ্ম—রাম। রাম-ই আমার স্বরূপ।

● **বিভীষণের প্রতীকার্থ ঃ**

কুম্ভকর্ণ, রাবণ ও বিভীষণ যথাক্রমে তমোগুণ, রজোগুণ ও সত্ত্বগুণের প্রতীক। ত্রিগুণাতীত হলে তবে ঈশ্বরলাভ হয়। বিভীষণ লঙ্কা ত্যাগ করে রামের সঙ্গ পেল। কুম্ভকর্ণ ও রাবণ বধের পরে রাম তাকে লঙ্কার রাজা করেছিলেন। সাধক ত্রিগুণাতীত হলে ঈশ্বর লাভ হয়—রামকে পায়। তারপর তত্ত্বজ্ঞানে মন নেমে আসে। বিভীষণ লঙ্কায় থাকল তত্ত্বজ্ঞান রূপে।

বিভীষণ প্রথমে সত্ত্বগুণের প্রতীক—পরে তিনি যখন লঙ্কার রাজা হলেন তখন তিনি তত্ত্বজ্ঞানের প্রতীক।

● **শবরীর শিক্ষা ঃ**

ভক্ত শবরী জাম ফল টক না মিষ্টি তা একটু খেয়ে পরীক্ষা করে দেখতেন। মিষ্টি স্বাদ হলে সেই এঁটো ফলই রেখে দিতেন রামকে দেবার জন্য। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর রামচন্দ্র এলেন তার আশ্রমে। তিনি শবরীর দেওয়া এঁটো ফলই আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলেন ও শবরী মুক্তি লাভ করল।

এই গল্পের শিক্ষাটি হ'ল—কৃষ্ণফল জাম অর্থাৎ নির্গুণের প্রসন্নতার ফল হিসাবে যে সব ঈশ্বরীয় দর্শন অনুভূতি হয়, সেগুলির প্রতীকার্থ ভেদ করে মর্মার্থ আস্বাদনের অনুশীলনে দীর্ঘদিন থাকলে অন্তর মধ্যে রাম অর্থাৎ পরম একের উপলব্ধি হবে ও মুক্তি ঘটবে।

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...43

স্মৃতিচারণ

স্মৃতিকথা

শ্রী জীবনকৃষ্ণের পূণ্য সঙ্গলাভে ধন্য কয়েকজনের টুকরো কিছু স্মৃতিকথা এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হল—

বঙ্কিম চক্রবর্তী---

১. একদিন জীবনকৃষ্ণের সাথে তাঁর এক সহপাঠীর সম্পর্ক দেখে খুব অবাক হয়েছিলাম। ঘরে সেদিন অনিলভূষণ নামে সেই সহপাঠী তাঁর সাথে কিছু কথাবার্তার পর বাড়িতে টিউশন থাকায় ফিরে যাচ্ছেন। যাবার সময় দেখছি খাটে মাথা রেখে উনি বন্ধুকে প্রণাম করছেন। জীবনকৃষ্ণ ওনাকে ফেলুদা বলতেন। ফেলুদা চলে যাবার পর জীবনকৃষ্ণ বললেন, ''আপনারা কিছু লক্ষ্য করলেন কি? একে ও আমার সহপাঠী, তারপর গাঙ্গুলী বামুন, ও কখনও আমায় প্রণাম করতে পারে? আমার ঠাকুর একদিন ওকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলছেন, 'এই তুই ওখানে যাস, ওকে প্রণাম করিস নি? প্রণাম করবি। সেই থেকে ফেলুদা খাটে মাথা রেখে প্রণাম করে। আমরা সকলে অবাক। যদিও পরবর্তীকালে জীবনকৃষ্ণ প্রণাম একেবারেই তুলে দিয়েছিলেন।

২. আর একদিনের কথা মনে পড়ছে। অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় আর গণেশ মান্না নামে দুজন ব্যক্তি জীবনকৃষ্ণের কাছে আসতো। ওরা প্রতি রবিবার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে গিয়ে ধ্যান করতো। সেদিন জীবনকৃষ্ণের ঘরে অজিতের কুণ্ডলিনী জাগরণ হয়েছিল। রবিবার ছিলো বলে কথাবার্তার মাঝে জীবনকৃষ্ণ হঠাৎ ওদের জিজ্ঞাসা করলেন, ''কিরে, তোরা আজ দক্ষিণেশ্বরে গেছিলি? ধ্যানে কি দেখলি বল।'' গণেশ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, ''আজ্ঞে এই শেষ। আর কোনোদিন যাব না।'' তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'কেনো বাবা, যাবি না কেনো? খুব যাবি, কি দর্শন করলি বল।' উত্তরে গণেশ যা বললো আমরা সকলে শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

বললো, 'আমরা দুজনে বসে ধ্যান করছি। খানিকটা ধ্যান হয়েছে। দেখছি, ঠাকুর আমাদের সামনে উপুড় হয়ে হাত নেড়ে নেড়ে বলছেন,

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...45

আমি কি এখানে? আমি এখন কদমতলায়, তোরা এখানে আসিস কেনো? খবরদার আর আসবি না।'

৩. একদিন বিহারের এক ভদ্রলোক নাম লক্ষ্মীনারায়ণ সিং অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন। তিনি বৃন্দাবন যাবার জন্য সিট বুকিং করে ট্রেনে উঠেছেন। গাড়িতে বসে জাগ্রত অবস্থায় কেবলই জীবনকৃষ্ণকে দেখতে থাকেন। তখন মনে উদয় হলো, আরে, আমি তো স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ করছি। আবার কষ্ট করে বৃন্দাবন যাওয়ার কি দরকার? একথা মনে আসায় কয়েকটা ষ্টেশন পর ট্রেন থেকে নেমে পড়লেন। সেখান থেকে আবার হাওড়ার টিকিট কেটে বাড়ি ফেরেন। বাড়ির সব লোকজন তো ওনার আচরণ দেখে অবাক। কিন্তু কারণটা কাউকে স্পষ্ট করে বলেননি। ওনার মা কয়েকদিন পর স্বপ্নে এক মহাপুরুষকে দেখেন। মাথা ন্যাড়া, খাটের উপর বসে আছেন। পাশে ওর ছেলে লক্ষ্মীনারায়ণকে দেখে বুঝতে পেরেছেন ওর ছেলে নিশ্চয়ই এই মহাপুরুষের কাছেই যায়। লক্ষ্মীবাবুর বুঝতে আর বাকি থাকল না যে মা শ্রী জীবনকৃষ্ণকেই দেখেছেন। ঘটনার বিবরণ শুনে ঘরের সকলেই আনন্দ ও বিস্ময়ে ভরপুর হয়ে জীবনকৃষ্ণ আর লক্ষ্মীবাবুর দিকে চেয়ে রইলাম।

আনন্দ মোহন ঘোষ---

১. একদিন শুচিবাইগ্রস্ত মানুষদের নিয়ে জীবনকৃষ্ণ আমাদের অদ্ভুত এক কথা শুনিয়েছিলেন। ট্রেনে ঘাটশিলা যাবার পথে মুখুজ্জ্যে মশায় শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ মুখোপাধ্যায়ের সাথে ওনার এই নিয়ে কথা হচ্ছিল। জীবনকৃষ্ণ বললেন, দেখুন মুখুজ্জ্যে মশাই, শুচিবাই যায় না। কারণ এ হচ্ছে বাই অর্থাৎ বাতিক। যদি কেউ জীবনে কোন গর্হিত কাজ করে, তার ব্রেন সেল tarnished অর্থাৎ কলঙ্কিত হয়ে যায়। তা আর Purified হতে চায় না। এই tarnished ব্রেন সেল-এর জন্য Unknowingly সে ভাবে বাইরে ধোয়াধুয়ি করলেই শুচি হবে। তা কিন্তু হয় না। যার অন্তরে শুচিতা তার বাহির শুচির প্রশ্নই ওঠে না। এর প্রমাণ, দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর আরতি করছেন ঠাকুর, কিন্তু নি:সাড়ে মল নির্গত হয়ে তাঁর কাপড়ে মাখামাখি। শুচিতার প্রয়োজন স্বাস্থ্যবিধির জন্য। আত্মিকের সঙ্গে এর (শুচিতা) কোনো সম্পর্ক নেই।

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...47

ব্রেনসেল tarnished হয়ে যাওয়ার বিষয়টি শেক্সপিয়ার তার ম্যাকবেথ নাটকে খুব সুন্দর ভাবে দেখিয়েছেন। রাজাকে ম্যাকবেথ খুন করায় স্ত্রী লেডি ম্যাকবেথ এর হাতে রক্ত লাগে। হাতের রক্ত তিনি জল দিয়ে ধুয়ে ফেলেন। কিন্তু বিষয়টি ব্রেনে থেকে যায়। তাই ঘুমের ঘোরেও তিনি হাত কচলাতে থাকেন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তার এই হাত কচলানো অভ্যাসটি থেকে যায়।

২. ঘাটশিলায় থাকাকালীন একদিনের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ঘরের পশ্চিমের বারান্দায় আমি আর বড়দা, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়ের সাথে কথাবার্তা বলছিলাম। নিজের ঘরে বসে আমাদের কথাবার্তার শব্দ শ্রীজীবনকৃষ্ণের কানে গিয়েছিল। তাই ঘর থেকেই হাঁক দিয়ে বললেন, তোদের কি কথা হচ্ছে বাবা? বললাম, বড়দা বলছিলেন, একজন লোক এখানকার ফুল-ডুংড়ি পাহাড়ের মাথায় বসে রাতে জ্যোৎস্নার আলো দেখে আত্মহত্যা করেছিল। উনি শুনে সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তোদের বলেছিলাম না, ডি.এল.রায়ের গানে আছে 'এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভালো, সে মরণ স্বর্গ সমান।' তা বাবা বলতো, চাঁদের আলো দেখে ওই ব্যক্তির মরবার ইচ্ছা কেন হল? আসলে ওই লোকটির জীবনে অপূর্ণতার ব্যথা ছিল। ভগবানকে না পাওয়ার শাশ্বত ক্ষুধা, The great hunger. শেষমেষ ভাবলে তা যখন মিটলো না তখন গলায় কাপড়ের ফাঁস লাগিয়ে গাছে ঝুলে পড়ি। এর জীবনে ঈশ্বরের কৃপা হলো না। তা যাই হোক, ভালো লোক।.......Beyond the level of a common man.

অমরনাথ বসু---

আমাদের কদমতলার বাসায় খুব বড় ছাদ ছিল। গ্রীষ্মের সময় সেই ছাদে আমরা সবাই শুতুম। জ্যাঠামশাইও শুতেন। আবার রাত্রি হলে কোন কোন দিন ছাদে গিয়ে দেখতুম হয় উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন অথবা জেগে আছেন। জেগে থাকলে আমায় কাছে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, 'আজ কি দিয়ে আহারাদি হল মশাই?' তার মুখে 'মশাই' সম্বোধন শুনে আমার খুব আনন্দ হতো। এরপর এটা সেটা ছোট্ট একটু আলোচনা সেরে শুয়ে শুয়ে আকাশে চাঁদ দেখতুম। আর চাঁদের আলোয় মাঝে মাঝে জ্যাঠামশাইকে লক্ষ্য করতুম। আমি বরাবরই একটু ভীতু, সেই কারণে তার পাশেই বিছানা পাততুম। নিশ্চিন্তে ঘুমোতুম। ভোরের আলোয় কাক পক্ষীর ডাকে আমার

ঘুম ভাঙতো। সূর্য উঠতে তখন অনেক দেরী, আবছা অন্ধকারে দেখতুম জ্যাঠামশাই ধ্যানস্থ।

নিতাই পাত্র---

একদিন সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় নামে একজন সংগীত শিল্পী এসেছিলেন জীবনকৃষ্ণের ঘরে। তিনি সেদিন ঘরে প্রায় ১২টির মতো গান পরিবেশন করেন। জীবনকৃষ্ণ গোবিন্দ দাসের পদ শুনতে খুব ভালোবাসতেন। তিনি শিল্পীকে গোবিন্দ দাসের পদ গাইতে বললেন। গাইতে বলেই জীবনকৃষ্ণ পূর্বের একটি অভিজ্ঞতার কথা আমাদের সাথে শেয়ার করলেন। একবার ট্রামে করে আসছি, হাওড়া পুলের ওপর এসে হঠাৎ আমাদের ট্রামটা বন্ধ হয়ে গেল। সব লোক নেমে গেল। আমি ভাবলুম, নেমে গিয়ে কি করবো? সেখানে গিয়েও তো বসেই থাকবো, এখানে গঙ্গার উপর না হয় একটু বসে থাকি ট্রামের মধ্যেই। একটু পর দুজন লোক ট্রামে উঠে ঠিক আমার সামনের বেঞ্চে বসলো। তাদের দিকে চেয়ে একটু পরেই আমি বললাম, ওগো একটু গোবিন্দ দাসের পদ গাও তো। ওরা গাইলে, বেশ গাইলে। শেষে আমাকে বলছে, মশাই একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি করে জানলেন যে আমরা এই গান জানি? আমি বললাম, আমি ভাবলাম, দেখ, গঙ্গার উপর এই সময় এই গান হলে বেশ হয়, তাই তোমাদের গাইতে বললাম। আসলে ব্যাপারটা হল, আমি তাদের পা দেখে, চলার ভঙ্গি দেখে বুঝেছিলাম যে তারা গোঁসাই।

সমীর ব্যানার্জী---

১. আমাদের বাড়ীতে ভালো কিছু রান্না বান্না হলে মানিক বাবুর বাড়ীতে দেওয়া হত। আবার মানিক বাবুর বাড়ীতে ভালো কোন খাবার তৈরী হলে আমাদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিত। একদিন ছোড়দার (রণজিৎ ব্যানার্জী) দায়িত্ব পড়েছে মাণিক বাবুর বাড়ী থেকে বাসন নিয়ে আসার। তরকারী দিয়ে আসা হয়েছে আগে, সেই বাসন ফেরৎ আনতে হবে। জ্যাঠা বলে দিয়েছে ও বাড়ী গেলে দরজা ঠেলে জীবনকৃষ্ণের ঘরে ঢুকে প্রণাম করে আসবি। দাদা তাই করল। যেই প্রণাম করেছে ওর (জীবনকৃষ্ণের) শরীরটা টকটকে লাল হয়ে গেছে। উনি বলে উঠলেন, ও রণজিৎ, এটা কী হলো রে! তোর দেহটা কত শুদ্ধসত্ত্ব দেখ। তারপর দাদা ভিতরে গেল। ভিতরে

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...49

গিয়ে বাসন নিয়ে যখন ফিরে আসছে তখন আবার জীবনকৃষ্ণকে প্রণাম করল। অমনি ওর (জীবনকৃষ্ণের) সমস্ত দেহটা আমবাতের মত লাল লাল হয়ে ফুলে উঠল। জীবনকৃষ্ণ ওর জামা খুলে বললেন, দ্যাখ তুই ভগবানকে ডাকিস না, কিন্তু ভগবান তোকে স্মরণ করেছে। ভগবান তোর ভিতরে আছে। দেখ এগুলো ভগবানের রেখা। ভগবান তোর ভিতরে রয়েছে কিন্তু তুই জানিস না।

২. মাঝে মাঝে ওনার সাথে morning-walk এ যেতাম। অনেক দূর হেঁটে গেছি। উনি বললেন, তোর তো স্কুল আছে, দেরী হয়ে যাবে। এই নে পয়সা, তুই বাসে চড়ে ফিরে যা। আমি পয়সাটা নিতাম কিন্তু বাসে না চড়ে হেঁটেই বাড়ী চলে আসতাম। বাড়ীতে একটু আধটু বকাঝকা শুনতে হত, বেশি না, কারণ সব কর্মের কর্তা জীবনকৃষ্ণ কিনা। ঐ পয়সায় টিফিনে ভালো খাওয়া দাওয়া হতো।

৩. অফিসে উনি খুব পাংচুয়াল ছিলেন। ওনাকে দেখে ঘড়ি মেলানো যেত। ঠিক নটা বাজলেই গেটে দেখা যেত ওনাকে। অফিসে যাবার জন্য বেরিয়ে পড়েছেন, রাস্তায় বাসুদা, ছোড়দা ইত্যাদি অনেকে জটলা করছেন। উনি কিন্তু তখন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কারও সাথে কথা বলতেন না। গল্প করলে পাছে অফিসে পৌঁছাতে দেরী হয়ে যায় তাই। কালীকুণ্ডু লেনের মোড়ে বাসে উঠে উনি সোজা অফিসে চলে যেতেন। ফেরার সময় অবশ্য ঘনিষ্ঠ কারও সঙ্গে দেখা হলে কথা বলতেন।

৪. কালীবাবুর বাজারে যখন দুলালবাবুর দোকান হল, উনি বেড়িয়ে এসে দোকানে খাওয়া দাওয়া করতে লাগলেন। সঙ্গে যে ভক্ত থাকত তাকেও খাওয়াতেন ও ঈশ্বরীয় কথা হত। একদিন দুলালবাবুকে বললেন, দেখুন দুলালবাবু, আপনার দোকানে আর আসব না। উনি বললেন, কেন, কেন? কোন জিনিস খারাপ হয়েছে? জীবনকৃষ্ণ বললেন, না, খাবার জিনিস সবই ভালো কোয়ালিটির, কিন্তু এখানে এত ঈশ্বরীয় কথা হতে থাকলে তো আপনার দোকান উঠে যাবে। ঈশ্বরীয় কথা বলার সময় তাঁর দেহে যে যোগৈশ্বর্য ফুটে উঠত তা আশেপাশে ব্যবসায়ীরাও অবাক হয়ে দেখত। একদিন একজন আলু ব্যবসায়ী এসে বলল, আপনাকে আমি স্বপ্নে দেখেছি, আপনি ঈশ্বরীয় কথা শোনাচ্ছেন আমাকে। উনি বললেন, বেশ করেছ বাবা। এরপর থেকে দুলাল ঘোষের দোকানে বসা বন্ধ করলেন।

৫. একদিন সৌরেনদাকে জীবনকৃষ্ণ বললেন, বাবা এতো দর্শন অনুভূতি হল, এ জিনিস রক্ষা করতে পারবি? সৌরেনদা হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন। বললেন, আপনি কৃপা না করলে এ জিনিস রক্ষা পাবে কী করে? উনি বললেন, হ্যাঁ, বাবা, কৃপা না হলে কি এ ঘরের চৌকাঠ মারাতে পারতিস?

৬. একবার এক ভদ্রলোক একটা কাঠের রেহাল কিনে নিয়ে এলেন কদমতলার ঘরে। জীবনকৃষ্ণকে বললেন, এটার উপর কথামৃত রেখে পাঠ করতে সুবিধা হবে। এ ঘরের কথা ভেবেই এটা কিনে এনেছি। জীবনকৃষ্ণ বললেন, আগে পাঠটা হোক তারপর আপনার কথা শুনছি। পাঠ শেষে বললেন, আপনি ওটা ঘরে নিয়ে যান। ওটার উপর ভাগবত রেখে দৈনিক পাঠ করবেন। এখানে ভাগবত হাতে নিয়ে পাঠ করতে আমাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না। ভদ্রলোক আর কী করেন, চুপচাপ ওটা নিয়ে চলে গেলেন।

শোভা পাল---

বেলেঘাটায় কমলা মায়ের বাড়ীতে প্রথম পাঠ শুনতে যাই। সুশীলবাবু পাঠ করতে এসেছিলেন। সেই রাত্রে স্বপ্ন হ'ল, একটা পাঁঠা বলিদান হল। পাঁঠাটার গলা থেকে জ্যোতির একটা মানুষের মুখ দেখা গেল। জীবনকৃষ্ণ পাশ থেকে ঐ মুখটা দেখিয়ে বলছেন, 'দ্যাখ দ্যাখ'। স্বপ্নটা ভাঙ্গল.....

পরে কদমতলায় গিয়ে জানালা দিয়ে আমরা কয়েকজন মেয়ে ওনাকে দেখে মিলিয়ে নিলাম। বুঝলাম, এনাকেই স্বপ্নে দেখেছি। আমার স্বামীও (প্রভাতকুমার পাল) সঙ্গে গিয়েছিল। উনি ঘরের ভিতরে গিয়ে বসলেন।

প্রথম দর্শনেই জীবসত্তা নাশ হয়ে দেবসত্তা জাগ্রত হল—আর তিনি তা ধরিয়ে দিলেন।

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...51

মানিক ৭৪ সংখ্যা

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...53

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'' এই অমর হওয়ার ইচ্ছা আমাদের সবার অন্তরের গভীরে লালিত হয়। কিন্তু আমাদের রক্ত মাংসের দেহ নিয়ে অমর হওয়া তো সম্ভব নয়। যদি কাউকে অমর হতে হয় তাহলে তাকে সর্বজনীন ও সর্বকালীন হয়ে জগতের মানুষের মধ্যে চিন্ময় রূপে ফুটে ওঠে তাদের মনে বেঁচে থাকতে হবে।

শ্রী জীবনকৃষ্ণ একদিন গভীর ধ্যানে দেখলেন, বিরাট এক হাতি। অমর নামে একজন হাতিটার কাছে এসে তাকে ছুঁয়ে দিতেই হাতিটা তাকে শুঁড়ে করে শূন্যে উপরে তুলে ধরলো। উপরে ধরেই রইলো। দর্শন মিলিয়ে গেল। ব্যাখ্যায় উনি বললেন, হাতি মানে মন। বিরাট হাতি, জগতের মানুষের মন। আমি জগতের মানুষের মনে অমর হয়ে থাকব।

জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষের অন্তরে চিন্ময় রূপ ধরে তিনি প্রকাশ পান। মানুষের মন তাঁর পবিত্রতম সত্তার পরশ পায়। মনের গভীরে শুদ্ধ মন জেগে ওঠে যা অখণ্ড চৈতন্যকে ধারণা করতে পারে। এই শুদ্ধ মনে তাঁর অনুসত্তা বর্তমান থেকে মনের মনন শক্তি বৃদ্ধি করে সমগ্র মনকে পরিচালিত করে ও চেতনার পথে গতিদান করে।

মানুষের বেঁচে থাকা মানে ক্রিয়াশীলতা নিয়ে বেঁচে থাকা। দেহাবসানের পরে বহু মানুষ অন্য মানুষের স্মৃতিতে বেঁচে থাকেন তাদের সৃষ্টিশীল কাজের জন্য, তাদের নতুন ভাবনার জন্য। কিন্তু তারা মানুষের মনে ক্রিয়াশীল ও সজীব থাকেন না। তাদের মননশীলতা মানুষ লাভ করে না। তারা প্রাসঙ্গিক তথ্য যোগান মাত্র, পরবর্তী প্রজন্মের মানুষের বাহ্যিক নানা কর্মকাণ্ডে যা বিশেষ সাহায্য করে। বিচিত্র পথে বিজ্ঞানের বিকাশে, সভ্যতার অগ্রগতিতে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু মানুষের মনে তিনিই অমর হন যিনি মানুষের মনে সদা সক্রিয় থেকে মনন শক্তি বৃদ্ধি করেন ও

মানুষকে পূর্ণতা লাভের পথে ক্রমাগত এগিয়ে দেন, এক কথায় মানুষকে ভিতরে ভিতরে বদলে দেন।

কারও মনে হতে পারে রবীন্দ্রনাথ, কার্ল মার্ক্স ইত্যাদি বড় মানুষদের চিন্তাভাবনা তো মানুষের চিন্তাজগতে বড় প্রভাব ফেলে। তাহলে তাদেরকে অমর বলা যাবে না কেন? এর উত্তরে বলা যায় এরা অবশ্যই আলোকবর্তিকা, যখন চিরন্তন সত্যের কথা বলছেন। কার্লমার্ক্সের সাম্যের (equality)-র কথা বা রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চেতনার কথা আমাদের চেতনার উত্তরণ বা মনের উত্তরণ ঘটাতে সাহায্য করে—অন্য লেখাগুলি নয়। কিন্তু সেখানেও ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ ও মার্ক্সকে ছাড়িয়ে পাঠক এক মানব চেতনায় হারিয়ে যান। একথা অপ্রিয় হলেও সত্য যে তারা আমাদের অন্তর্চেতনার স্থায়ী পরিবর্তন ঘটিয়ে দিতে পারেন না। সাধারণ মানুষকে সাময়িক উদ্দীপ্ত করলেও মনন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে মানুষকে দার্শনিক করে তুলতে পারেন না। যাদের মধ্যে চেতনার ক্ষীণ প্রবাহ আগে থেকেই বিদ্যমান তারা ঐসব মানুষদের ঈশ্বরমুখী কথা তথা মানুষের একত্ববোধের ভাবনার কথা শুনে উদ্দীপিত হন ও আলোকিত হন। বস্তুত তাদের পরিবর্তন ঘটে ভিতর থেকে নিজস্ব চেতনা আপনা হতে জেগে ওঠায়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘‘প্রত্যেক মানুষের মনের গভীরতর স্তরে ঈশ্বর একটি স্বাতন্ত্র্য দিয়েছেন।’’ সেখানে সে অনন্য। এই স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বহুকে একের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার, মানুষকে পূর্ণতা দানের জন্য উপযুক্ত মনন শক্তি প্রদান করতে পারেন তিনি, যিনি নিজে সর্বজনীন ও সর্বকালীন হয়ে উঠেছেন, পূর্ণ মানব হয়ে উঠেছেন, অখণ্ড মানবচৈতন্য হয়ে উঠেছেন।

শ্রী জীবনকৃষ্ণ বহু মানুষের মনে অমর হয়ে সদা ক্রিয়াশীল থেকে তাদের মনন শক্তি বৃদ্ধি করে বহুত্বে একত্বের চেতনায় মানুষকে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করছেন তা তাদের কিছু কিছু দর্শন অনুভূতিতে ধরা পড়ছে। সেরকম কিছু দর্শন ও অনুভূতি সংকলিত হল এই পত্রিকায়।

২৬ কার্তিক, ১৪২৭

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...55

স্বপন মাধুরী

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...57

সকলের তরে

● দেখছি (28.6.2020)—আমি প্রজাতন্ত্র দিবসে কুচকাওয়াজ দেখতে গিয়ে দেখি অন্যবারের তুলনায় এবারের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানটি অনেক সুন্দর। All police personnels were well equipped and well dressed। প্রত্যেকের মধ্যে সুন্দর discipline রয়েছে এবং অনেক আকর্ষণীয় লাগছে। কুচকাওয়াজটি বিভিন্ন level-এর পুলিশ কর্মী-দের মধ্যে আলাদা আলাদা ভাবে হচ্ছে। যেমন Constable, ASI, SI, DSP, SP ইত্যাদি। সবার উপরে রয়েছেন DIG. ঘুম ভাঙলো। পরদিন স্নেহময়দার সাথে দেখা। ওনাকে স্বপ্নটার কথা বললাম। উনি শুনে বললেন, আমাদের মধ্যে সমষ্টিচৈতন্য জাগ্রত হচ্ছে। বিভিন্ন লেভেলের পুলিশ অর্থাৎ আমাদের সব স্তরের মানুষ এই একত্বের স্বাদ পাবে। DIG কন্ট্রোল করছেন অর্থাৎ We are spiritually controlled by somebody. Well equipped and well dressed অর্থাৎ আমরা আরও সহজভাবে এবং পরিস্কার ভাবে সকলে এই চৈতন্যের আস্বাদন করতে পারবো।

এবার সত্যি সত্যিই ঘুম ভাঙলো। বুঝলাম স্বপ্নের ভিতর স্বপ্ন দেখেছি। কী আনন্দ যে অনুভূত হ'ল তা মুখে বলে বোঝানো যাবে না।

—অচিন্ত্য গুপ্ত
বোলপুর

● দেখছি (3.8.2020)—আমি অসুস্থ। শুয়ে আছি। জীবনকৃষ্ণ নাম করছি। হঠাৎ দেখি জীবনকৃষ্ণ স্বয়ং এলেন আমার কাছে। আমি বললাম, অনেকদিন পর তোমায় দেখলাম। উনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, আমি তো চলতেই পারি না। তখন উনি আমার হাতটা ধরলেন। তারপর টেনে তুলে আমাকে নিয়ে চলতে লাগলেন। আমার ঐ গানটা মনে পড়ল—"আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা, আমি যে পথ চিনি না।" পুরো গানটা গাইলাম আর উনি আমাকে দূরে বহুদূরে কোথায় নিয়ে চলে গেলেন।...

ব্যাখ্যা—

তাঁর একত্ব দান করে আত্মিকে বহুত্বে একত্বের চরম উপলব্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

—কল্পনা ব্যানার্জী
শিমূরালী

তারা সম

● গতরাত্রে (25.7.2020) তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় স্পষ্ট দেখলাম— একজন কালো মতো লোক, মাথায় তার ছোট ছোট চুল, একটা বিরাট বড় তারা দু'হাতে ধরে আছে। ...দর্শন মিলিয়ে গেল। বাবাকে বললাম দর্শনটা। বাবা ফোন থেকে জীবনকৃষ্ণের ফটো দেখালো। বুঝলাম আমি জীবনকৃষ্ণকেই দেখেছি। এই প্রথম তাঁকে দেখতে পেলাম।

---দেবপ্রিয়া রায়
বেহালা

ব্যাখ্যা---

প্রথম স্বপ্নেই দ্রষ্টাকে নির্গুণ ব্রহ্ম শ্রীজীবনকৃষ্ণ তাঁর সাথে এক করে আকাশে তারা তথা একত্বের চেতনাদীপ্ত জীবন দান করছেন।

● দেখছি (28.6.2020)—শ্রী জীবনকৃষ্ণের কদমতলার ঘরে আমরা রয়েছি। শ্রী জীবনকৃষ্ণ তক্তপোশের উপর খালি গায়ে বসে আছেন। আমি ছাড়া নিতাই পাত্র মহাশয় ও আরও দুজন বসে আছেন। আমরা সকলে দিব্যজ্যোতিতে বসে আছি। শ্রী জীবনকৃষ্ণের ব্যাখ্যাগুলো মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছি। যতক্ষণ আমি ঘুমিয়ে ছিলাম ততক্ষণ স্বপ্নতে আমি এই দৃশ্যই দেখেছি। ....এই আমার প্রথম দর্শন।

---অমৃতা ঘোষ
জামবুনি, বোলপুর

ব্যাখ্যা---

দিব্যজ্যোতির মধ্যে বসে আছি—তাঁর দিব্য আলোতেই তাঁকে দেখা যায়—"ন তত্র সূর্যো ভাতি, ন চন্দ্রতারকম্-----"।

● স্বপ্নে দেখছি (3.7.2020)—আমি বেশ বড় আর গভীর এক গর্তের মধ্যে রয়েছি। উপরে গর্তের ধারে জীবনকৃষ্ণ ও তার দু'জন সঙ্গী দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাঁর দিকে কাতর স্বরে বললাম, আমাকে গর্ত থেকে উদ্ধার করুন। উনি বললেন, না, মা তোমাকে নিজেই উঠতে হবে। তখন নিজেই বহু কষ্ট করে উঠলাম। তারপর একটা রিক্সা চড়ে জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...59

করলাম। ....প্রথম স্বপ্নেই শ্রী জীবনকৃষ্ণ জানালেন, নিজেকে মনন করতে হবে। তবেই তাঁর কৃপায় দেহারণ্যের ভিতর অমূল্য রত্নের খোঁজ মিলবে।

---তুলসী দাস,
জামবুনি

রসুন বৃক্ষ

● স্বপ্ন দেখছি (1.7.2020)—একটা রসুন গাছ (বৃক্ষ)। অনেক রসুন ফলে আছে। সেখানে দুজন ভদ্রলোক রসুন পাড়ছে আর বস্তার মধ্যে রাখছে। গাছের নীচে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। তারা রসুন চাইছে। কিন্তু ঐ দুজন ভদ্রলোক বলছে, এখন রসুন দেওয়া যাবে না। তারপর আমি আর সুপর্ণা (মেয়ের বন্ধুর মা) ওখানে গেলাম। যেতেই ওরা দু'জন বলল, এখন রসুন পাবে না। আমি বললাম, রসুন দিতে হবে না শুধু একটা পাতা দিন। তখন বাকী লোকজন ওখান থেকে চলে গেল। কিন্তু আমরা দু'জন দাঁড়িয়ে থাকলাম। এবার ওনারা দু'জন আমাদের দু'জনকে দুটো রসুন দিলেন। আমার খুব আনন্দ হ'ল। আমরা সেই রসুন দুটো এনে আমাদের দুই মেয়েকে (স্বস্তিকা আর অদ্রিজা) ঐ রসুন দিয়ে ম্যাগি করে দিলাম। আমার মনে হল যেন রসুনটা খুব দামী ফল। ...ঘুম ভাঙলো।

---সর্বাণী বিশ্বাস
সখের বাজার

ব্যাখ্যা---

রসুন মাটির নীচের ফল কিন্তু উপরে রয়েছে—আর গুপ্ত ভাবে নয় এবার ব্যক্তভাবে লীলা। দ্রষ্টারা দু'জন রসুন পেল—যারা নিয়মিত চর্চার সঙ্গে যুক্ত এবং সমষ্টিগত আত্মিক জীবন আছে, যারা একত্বলাভের তীব্র আকাঙ্খা জনিত কারণে ধীর হয়েছেন; বর্তমানে তারাই এই অনুভূতি লাভ করছেন। ম্যাগি যেমন সহজে রান্না হয়, সহজপাচ্য সেইরকম বর্তমানে এই বিষয়টির বোধগম্যতা অনেক সহজ হয়েছে এবং সহজে ধারণার মধ্যে আসছে। রসুন ফলটা খুব দামী মনে হচ্ছে—বহুত্বে একত্ব লাভ-ই চূড়ান্ত প্রাপ্তি (একটি রসুনের মধ্যে অনেকগুলি কোয়া থাকে)।

● দেখছি (29.6.2020)—মারাত্মক ঝড় উঠেছে। আমফান ঝড়ের চেয়ে দ্বিগুণ শক্তিশালী। কিন্তু কোন ক্ষতি হ'ল না। শুধু একটা বড় র‍্যাডার

উড়ে গেল দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে উত্তর পশ্চিম দিকে....বুঝলাম নতুন যুগের সূচনা হচ্ছে। সূক্ষ্ম পরিবর্তন বোঝার জন্য দেহের সংবেদনশীলতা বাড়বে।

---গৌতম চ্যাটার্জী
সরশুনা, কলকাতা

এক প্রেমে

● স্বপ্নে দেখছি (9.7.2020)—ছোটকাকু সব পাঠ বন্ধ করে দিয়ে অন্য এক জায়গায় চলে গেছে। আর সেই বাড়ীতে আমার মামার বাড়ির লোকদের দেখছি। মনে হচ্ছে কাকু আমার মামার বাড়ির কেউ। কাকু একটা নতুন মিশন শুরু করতে যাচ্ছে আর সেটা নিয়ে খুব excited, খুব নার্ভাসও। মানে এবার থেকে নতুন লোক আসবে পাঠ করতে। কাকু একটা সংগঠন করেছে। সেটাতে যারা পাঠ করতে চায় মানে পাঠক হতে চায় তারা ই-মেল করবে আর তাদের ই-মেলটা অনুমোদিত (approved) হলে তাদেরকে ডাকা হবে পাঠ করার জন্য। যেখানে পাঠ হবে সেই ঘরটাও একবার দেখলাম। কাঠের মেঝে, একটা Podium আছে। চার্চে যেমন বসার ব্যবস্থা (Seat arrangement) থাকে সেই রকম সীট পাতা। মজবুত বাড়ি, সুন্দর একটা ঘর, বেশ আভিজাত্যপূর্ণ।

আবার দেখছি—আমি পাঠ করব বলে মেল (mail) পাঠিয়েছি, আবেদন করেছি। অনুমোদনও মিলেছে। একটা বক্তব্য লিখেছি। সেটা পড়ব সবার সামনে। লেখাটা হাতে নিয়ে মনে হচ্ছে—সৃষ্টিশীল লেখার প্রতিযোগিতায় ভাগ নিচ্ছি। খুব সুন্দর করে লিখেছি। কিন্তু ভালো করে পড়ে যখন দেখলাম তখন মনে হচ্ছে—আমি শুধু ভালোবাসার কথাই লিখেছি। সেটাতে কোন নাম নেই, কোন রেফারেন্স নেই। কার ভালোবাসা, কিসের ভালোবাসা, কেমন ভালোবাসা জানি না। কিন্তু শুধু ভালোবাসা in mental term. তখন মনে হচ্ছে পাঠ করতে যাচ্ছি কিন্তু ভালোবাসার কথা বলবো? জীবনকৃষ্ণের কথা তো বলি নি। সেটা না বললে তো পাঠ হবে না। তখন মনে মনে ঠিক করলাম, প্রত্যেক ভালবাসার লাইন পড়ে জীবনকৃষ্ণের উদাহরণ দিয়ে তার ব্যাখা করবো। ঐ কাগজটা নিয়ে গাড়ীতে চড়ে যাচ্ছি সেই হলটার দিকে—পাঠ করার জন্য।....ঘুম ভাঙলো।

---দিশা গাঙ্গুলী
বেলুড়

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...61

ব্যাখ্যা---

শ্রী জীবনকৃষ্ণ বলেছেন, ‘‘দেখ, আমি আমাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। তাই সকলকে আমাতে পরিবর্তিত করে নিচ্ছি।’’

ষোল আনা অহংনাশ হলে এই প্রেম অনুভূত হয়। জগতে শ্রী জীবনকৃষ্ণই প্রথম প্রেমিক পুরুষ যার প্রেম universal অর্থাৎ সর্বজনীন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন—তাঁর কতকগুলি অন্তরঙ্গ আছে। কিন্তু জীবনকৃষ্ণ বললেন যে তাঁর কোন অন্তরঙ্গ নেই। তিনি সকলের অন্তরঙ্গ। অন্তরের অঙ্গে চিন্ময়রূপে প্রকাশিত এই মানুষটিকে ভালোবেসেই সকলকে ভালোবাসা সম্ভব। নিঃস্বার্থ ও সুগভীর ঈশ্বর প্রেম কিভাবে রূপ পরিগ্রহ করেছে জীবনকৃষ্ণের মধ্যে, তার পরিচয় যারা পেয়েছেন নির্গুণের দ্বারা নির্বাচিত সেই সব সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অপর মানুষজনের কাছে তাঁর পরিচয় তুলে ধরবেন আর আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এ বিষয়ে সহায়ক হবে।

নতুন মিশন— মিশন শব্দের এক অর্থ জীবনের ব্রত—যে কাজের জন্য মানুষ অন্তরের তাগিদ অনুভব করে। একত্বের পথে যাত্রায় এই ভিতরের তাগিদটা জরুরী যেন মিশন একটা।

রবীন্দ্রনাথের ‘অনন্ত প্রেম’ কবিতায় এই স্বপ্নের বক্তব্যের কিছু আভাস পাওয়া যায় যেখানে তিনি লিখছেন—

‘‘নিখিলের সুখ, নিখিলের দুঃখ
নিখিল প্রাণের প্রীতি
একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে
সকল প্রেমের স্মৃতি—
সকল কালের সকল কবির গীতি।’’

● গত ২১-৬-২০২০ তারিখে স্বপ্নে দেখছি—বাড়ির বাঙ্কারের এক কোণে জীবনকৃষ্ণ গুটিসুটি মেরে রয়েছেন। হঠাৎ করে দেখি উনি হাত পা ছড়িয়ে পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পেলেন। ....

বুঝলাম, জীবনকৃষ্ণ আমার ভিতরেই ছিলেন কিন্তু এবার চর্চা নিয়মিত হওয়ায়, তাঁর প্রতি প্রেম জাগায় তিনি পূর্ণভাবে প্রকাশ পাচ্ছেন।

---কৌশিক ঠাকুর
দীঘা, বীরভূম

ওজন বৃদ্ধি

● স্বপ্নে দেখছি (16.7.2020)—আমার স্বামীর যেন একটি কর্ম হয়েছে বেনারসে। একটা কোয়ার্টার দেওয়া হয়েছে কোম্পানী থেকে। আমরা সেখানে গেছি। কোয়ার্টারটি পুরনো কিন্তু ঘরগুলি খুবই আলো বাতাসপূর্ণ। ঘরের লাগোয়া বারান্দা। সেখানে দাঁড়ালে রাস্তাঘাট ও গঙ্গা দেখা যায়। গঙ্গার হাওয়ায় সারা ঘর ভরে থাকছে। তাই মনে আমার খুব আনন্দ। বিকেল বেলা ঘুরতে বেরিয়েছি। অনেক লোক রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। এমন সময় দেখি শ্রী জীবনকৃষ্ণ ঐ ভীড়ের মধ্যে হেঁটে যাচ্ছেন। পরনে পাতলা সাদা রঙের ফতুয়া আর সাদা ধুতি। উনি মধ্যবয়স্ক। আমি ওনার কাছে গিয়ে বলছি—আরে তুমি জীবনকৃষ্ণ না? উনি বললেন, না। আমি জীবনকৃষ্ণ নই। আমিও ছাড়বার পাত্রী নই। বললাম, হ্যাঁ, তুমি জীবনকৃষ্ণ। তারপর বললাম, আমি বেশি করে T.V., মোবাইল দেখি তো তাই তোমার রাগ হয়েছে। তুমি স্বীকার করছো না যে তুমিই জীবনকৃষ্ণ। তখন দেখি ওনার চোখে সম্মতির চিহ্ন। আমি বললাম, দ্যাখো এটা তো আমার বয়সের ধর্ম। তুমি এত রাগ করলে হবে না। তাও দেখি নিজেকে ধরা দিচ্ছেন না আমার কাছে। তখন আমি ওনাকে চেপে ধরেছি—খুব জোরে। এত জোরে চেপে ধরেছি যে উনি আমার দেহের ভিতর ঢুকে গিয়ে মিশে গেলেন। তখন দেহটা ভারী হয়ে গেল। আগে খুবই হাল্কা ছিল। আর একটা কথা—সারা স্বপ্নে ওনাকে আমি হাসিমুখে দেখেছি—সারাক্ষণ দাঁত বের করে রহস্যের হাসি হেসে গেছেন।.....

---তনুশ্রী চ্যাটার্জী,
শীলপাড়া, বেহালা

ব্যাখ্যা---

বেনারস—সহস্রার। সেখানে গেলে বিশ্বনাথের দর্শন মেলে—মন সহস্রারে উঠলে সর্বজনীন সর্বকালীন মানব শ্রী জীবনকৃষ্ণকে দেখা যায়। ঈশ্বরকণা (God particle) যেমন বস্তুর ভর/ওজন দান করে তেমনি শ্রী জীবনকৃষ্ণকে অন্তর মধ্যে আপন সত্তা রূপে অনুভব করলে মানুষ হিসাবে তার ওজন বাড়ে। নিজের মান সম্বন্ধে হুঁশ আসে এবং সত্যিকার মানুষ হয়ে ওঠে।

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...63

রূপ সাগরে

● গতকাল রাত্রে (9.8.2020)—ভাবছিলাম জীবনকৃষ্ণ আমাকে ভালোবাসে না। অন্যদের কত সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেয়। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখছি—

মিষ্টিদি আমাদের বাড়ী এসেছে মাধ্যমিকের ABTA Test paper চাইতে। বললাম, খুঁজে রাখব। দিদি আমার ফোন নং টুকে নিল। বলল, যোগাযোগ করব। আর আমাকে ওর ভাইয়ের নম্বর দিল। ওর ভাইয়ের নাম নাকি জয়। পরে দেখছি আমার ফোনে ঐ দিদির ভাই জয় কতকগুলি মেসেজ পাঠিয়েছে। আমার সাথে ভালোবাসা মূলক কথা বলতে চায়। তবে আমার এ বিষয়ে কোন ইচ্ছা না থাকায় সেকথা ওকে জানিয়ে দিই। পরে মনে হ'ল এভাবে সরাসরি বলে ওকে কষ্ট দিলাম না তো? মাসীকে বিষয়টা বলা কি ঠিক হবে? মাসীর ঘরে ঢুকে মাসীর পাঠের খাতাগুলো দেখি বিছানার উপর খোলা রয়েছে। তার মধ্যে স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা সহ পাঠ, প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ও উত্তর লেখা। আমাকে মাসী খাতার মধ্যে হাত বুলিয়ে বললো তুইও হাত বুলো। আয় আমার পাশে আয়। মনটা ভালো লাগবে। আমি পাশে গিয়ে বসা মাত্র জানলার পাশে একটা বিয়ে বাড়ি থেকে গান ভেসে আসছিল—"দেখেছি রূপ সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা।" আমি মন দিয়ে গানটা শুনছিলাম আর ভিতর থেকে অসম্ভব আনন্দ অনুভূত হচ্ছিল। হঠাৎ পাশ থেকে মাসী আমাকে বললো, আমার ফোনে গানটা লাগিয়ে দিস তো। আমি বললাম, গানটার মানে জানো? এই গানের যেমন তেমন মানে নয়। গানটি অনুভব করো। গানটির মানে হচ্ছে—ভগবানের রূপ সাগরে ডুব দিতে বলছে। ঠিক তখনই দরজার ওপারে জয় আমাকে দেখে বলছে—আমি তো প্রথমেই তোকে রূপ সাগরে আমার সাথে ডুব দিতে বলেছিলাম। ....আমি হাসলাম। ও ঈশারা করলো ওর সাথে যাওয়ার জন্য। আমি আর দ্বিধা না করে ওর হাত ধরে চলে গেলাম। ঘুম ভেঙে গেল। এতো আনন্দ হচ্ছিল যে কী বলব! মনে হল সত্যি ভগবান আমাকেও ভালবাসে।

---সায়েরী রাউত
বেহালা

নবরূপে বিশ্বনাথ

● গত ৯.১০.২০২০ তারিখ রাত্রে স্বপ্নে দেখছি—কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরে বিশ্বনাথের পুজো হবে। মন্দিরটি বাস্তবের মন্দির থেকে পুরো আলাদা। সেখানে একটি পাথরের তৈরী ঘর আছে। সেই ঘরের মাঝখানে একটি স্তম্ভের উপর গোলাকারে সজ্জিত কিছু মাটির প্রদীপ জ্বলছে। পুজো চিরাচরিত পদ্ধতিতে হবে ঐ প্রদীপগুলোকে কেন্দ্র করে। কিন্তু সেই পুজোর মধ্যেও পাঠ হবে। পাঠক হিসাবে থাকছে মামা (স্নেহময় গাঙ্গুলী) ও কাকা (বরুণ ব্যানার্জী)। আমি ও পাঠের কয়েক জন সেখানে আছি পাঠ শুনবো বলে। পুরো পাঠের অংশটি T.V তে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।....

---চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী
জামবুনি, বোলপুর

ব্যাখ্যা---

কাশী—প্রকৃত শিব তথা সমষ্টিচৈতন্যের অনুশীলন যেখানে হয় সেই স্থানই কাশী। বিশ্বনাথ—সমষ্টিচৈতন্য। তাই শিবলিঙ্গের পরিবর্তে স্তম্ভের উপর কতকগুলি প্রদীপ জ্বলছে। পুজো হবে—মনন হবে। চিরায়ত ধারায়—দ্বৈতবাদের আঙ্গিকে—ভক্ত ভগবান ভাবধারায়। কেউ কেউ তাঁকে ভগবান বলবে, ভক্তি করবে—দ্বৈতবাদে। সেটার live telecast নেই—মনুষ্যজাতির উপর তার কল্যাণকর প্রভাব ততটা কার্যকরী হবে না। কিন্তু পাঠ সম্প্রচারিত হবে টিভিতে সরাসরি—পাঠ হল একত্বের আঙ্গিকে মনন। এই পাঠের ক্রিয়া হবে (effect পড়বে) অসংখ্য মানুষের সহস্রারে।

● দেখছি (15.10.2020)—সুলতানপুরের বাড়িতে পাঠ হচ্ছে। কিন্তু জায়গাটার নাম বিশ্বভারতী, সুলতানপুর নয়। সবাই বসে আছি। আমার বাঁ পাশে স্নেহময় মামা ও ডান পাশে জয়দাদা বসে আছে। জয়দাদা পাঠ করছে। খুব ভালো লাগছে। দাদার বাম হাতের কবজিতে বিপত্তারিণী সুতো বাঁধা।....

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...65

ব্যাখ্যা---

বিশ্বভারতী—যেখানে বিশ্ব মিলেছে এক নীড়ে (যত্র বিশ্বং ভবতি এক নীড়ম্) বা বিশ্বের জ্ঞানের মিলন স্থল—সেই আত্মিক জগৎ, যেখানে বহুত্বে একত্বের চেতনা লাভ হয়। বিপত্তারিণী সুতো—একত্ববোধ দানের মাধ্যমে ভেদজ্ঞানের বিপদ থেকে মুক্তির সূত্র—ফর্মূলা।

---সাগর ব্যানার্জী
বোলপুর

ব্রহ্মময়

● গতরাত্রে (25-10-2020) স্বপ্নে দেখছি—আমার মনে হচ্ছে আমি জন্ম থেকেই অন্ধ, বোবা ও কালা। আমার অপারেশন হল। প্রথমে চোখ অপারেশন হ'ল, দৃষ্টি ফিরে পেলাম। সবার প্রথমে দেখলাম শ্রী জীবনকৃষ্ণকে। তিনি সমুদ্রে ভাসছেন। পরে মুখের অপারেশন হল। মুখে কথা ফুটল। মুখে প্রথম যে শব্দ উচ্চারণ হল সেটা হল—''শ্রীরামকৃষ্ণ।'' পরে কানের অপারেশন হল। কান ঠিক হল—শ্রবণশক্তি ফিরে পেলাম। প্রথম যে শব্দ কানে শুনলাম তা হলো—''ওম্।'' আর তা বললেন সচ্চিদানন্দগুরু—অন্ধকারে একজন অজানা মানুষরূপে তাকে দেখা গেল। এরপর থেকে আমি যখনই কিছু দেখি সবার আগে দেখি শ্রীজীবনকৃষ্ণ সমুদ্রের উপর ভাসছেন। তারপর অন্য কিছু দেখি। যখন কিছু বলি সবার আগে রামকৃষ্ণ নামটা বলি। তারপর অন্য কিছু বলি। যখন কিছু শুনি সবার আগে সচ্চিদানন্দ গুরু ''ওম'' জপ করছেন শুনতে পাই, তারপর অন্য কিছু শুনি।....ঘুম ভাঙলো।

---শ্রাবন্তী রায়
ইলামবাজার

ব্যাখ্যা---

চৈতন্যের জাগরণ ঘটছে সাধারণ মানুষের জীবনেও। আর তার ফলে তাদের যোগদৃষ্টি লাভ হচ্ছে, চৈতন্যময় জগৎ দেখছে (ভবসমুদ্রে ভাসমান পরম এক জীবনকৃষ্ণকে দেখছে—ব্রহ্মময় জগৎ), ঈশ্বর প্রেমে ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরীয় কথা বলার সময় ''মা কথার রাশ ঠেলে দেন'' (শ্রীরামকৃষ্ণ যার

প্রতীক) আর ধর্মকথা যা শুনছে তার যোগাঙ্গ মাথায় ফ্লাশ (flash) করছে, ও যোগের কথাগুলি ভিতরের নির্গুণ ব্রহ্ম হতে উৎসারিত তা ধারণা হচ্ছে (যেন নির্গুণ হতে নাদ শোনা যাচ্ছে, সচ্চিদানন্দ ওম্ জপ করছে)।

● গতরাত্রে (2.8.2020) দেখছি—আমার জিভ অনেকটা কেটে গেছে। তখন আমি বাকী অংশটাও কেটে দিলাম। তারপর কাঁদতে লাগলাম ভয়ে যে খাব কী করে?....ঘুম ভাঙলো।

---অনুরাগ রায়
(ইলামবাজার)

ব্যাখ্যা---

পুরনো জিভ কেটে গিয়ে নতুন জিভ গজাবে যাতে ঠিক ঠিক ঈশ্বরীয় কথা উচ্চারিত হয়। এতে নিজেরও কিছু ভূমিকা থাকে—সম্পূর্ণতা আনার জন্য।

ওয়াজিদ

● স্বপ্ন দেখছি (11-8-20)—টিভি-তে যে সা রে গা মা পা লিট্ল চ্যাম্প্স—অনুষ্ঠানটি হয় তাতে আমি গেছি গেস্ট (guest) হিসাবে। ওখানে প্রতিযোগিরা (বাচ্চারা) বিভিন্ন গান করছে। কিন্তু আমি জাজদের বলছি, এখানে ওয়াজিদ খানের গান ছাড়া অন্য কারও গান গাওয়া যাবে না। আবদার করেই বলছি। জাজরা রাজী হলেন। বাচ্চারা যখন ওয়াজিদ খানের গানগুলি গাইছে তখন আমার অদ্ভুত আনন্দ হচ্ছে, আনন্দে চোখ দিয়ে জল ঝরছে।...

---মনোজ গায়েন
বেলঘরিয়া

ব্যাখ্যা---

আরবীতে ওয়াজিদ কথার অর্থ ঈশ্বর-প্রাপ্ত মানুষ। বাচ্চা ছেলে—দেবশিশু—divine persons. আত্মিক জগতের মানুষদেরকে ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত মানুষের সুরে সুর মেলাতে হবে, তাঁর প্রদর্শিত পথে ভগবৎ অনুশীলন

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...67

করতে হবে। জাজরা রাজী হল—ভালোবাসার জোর খাটানো যাচ্ছে মানে ঠিকঠিক ভালোবাসা জাগছে।

● স্বপ্নে দেখছি (4th oct., 2020)—আমি ঠাকুরের কাছে হাতজোড় করে কাতর হয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছি যে ঠাকুর আমায় ভিখারী করে দাও। ....ঘুম ভাঙতেই চমকে উঠলাম। এ আবার কেমন ধারা প্রার্থনা! আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?....

---পূর্ণচন্দ্র লাহা
বোলপুর

ব্যাখ্যা---

ভিখারী—প্রেমের ভিখারী। ঈশ্বর প্রেমের ভিখারী করো।

● দেখছি (20-10-20)—একটা ফোন এল। ফোনটা ধরতেই ওদিক থেকে জীবনকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। উনি জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছিস? বললাম, ভালো আছি। তারপর বললেন, এবার হাওড়ায় আয় আলোচনায়। আমি বললাম, বেশ। ....ঘুম ভাঙলো। মনে হচ্ছে ওনার ঘরে অনেকে সমবেত হয়ে যে উচ্চস্তরের আলোচনা হ'ত সেই পরিবেশে আমাকে যোগ দিতে বলছেন।

---সোহিত্রী সেন
নিউ আলিপুর

ব্যাখ্যা---

গবেষণামূলক পাঠে যোগ দেবার আহ্বান। যেখানে জগৎচৈতন্যের স্বরূপ প্রকাশ হচ্ছে।

এক সূত্রে গাঁথা

● Oct,2020, স্বপ্নে দেখছি— সুলতানপুরে আছি। জয় আমাদের বাড়ি এসেছে। ওকে দেখে আমার খুব আনন্দ হ'ল। গলা ধরে আদর করলাম। তারপর ওকে চা খাওয়ানোর জন্য চা তৈরি করলাম। তৈরী করার পর দেখলাম চা-টা একটু গন্ধ লাগছে। মন খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম, এই চা ওকে দেব না। কিন্তু জয় নিজে হাত বাড়িয়ে সেই চা-টা খেয়ে নিল।

বলল, দারুণ চা, খুব টেস্টি। তখন আমার খুব আনন্দ হল।

এরপর দেখছি—জয় একটা ঘড়া নিয়ে আমাদের বাড়ির পূর্বদিকে যে মোড়ল পুকুর আছে সেখানে গিয়ে এক ঘড়া জল ভরে আনলো। সেই জল কোথায় ঢালল দেখতে পেলাম না। তারপর পশ্চিম দিকের একটা পুকুরে প্রচুর পদ্মফুল ফুটে আছে, দেখছি সেখানে গিয়েও আবার একঘড়া জল ভরে আনলো। কিন্তু এবারও সেই জল কোথায় রাখলো দেখতে পেলাম না। মনে হচ্ছে এই কাজ ও করেই চলেছে। ....ঘুম ভাঙলো।

---পলি ব্যানার্জী

জামবুনি, বোলপুর

ব্যাখ্যা---

গন্ধ চা খেয়ে বলল টেস্টি—ভিতরের অঙ্কটবঙ্কট দূর করে এক পবিত্র সত্তা দ্রষ্টাকে আত্মস্থ করছে। বিভিন্ন পুকুর থেকে ঘড়ায় করে জল আনছে—বিভিন্ন পাঠচক্রের মানুষদের আত্মিক অনুভূতি সংগ্রহ করে সেগুলিকে একসূত্রে গাঁথছে একত্বের মহিমা তুলে ধরার উদ্দেশ্যে।

স্থিত সমাধি

● দেখছি (12 oct,2020)—একটা বড় মেলা হচ্ছে। একটা ছোট ছেলের সাথে আমি মেলা ঘুরছি। এক জায়গায় একটা অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় কয়েকজন দুষ্টু লোক আমাকে মারবে বলে পিছু নিল। আমি ওদের চোখ এড়িয়ে মেলার ভিতরেই একটা ক্যাম্পাসে ঢুকে গেলাম। দরজা বন্ধ করে দিলাম। ভিতরে বহু প্রাচীন স্থাপত্য কর্ম রয়েছে। হঠাৎ ভূমিকম্প শুরু হ'ল। চারিদিক দুলতে লাগল। সব পুরোন স্থাপত্য ধ্বংস হয়ে গেল। কে যেন বলল—এটা স্থিত সমাধি। স্থিত সমাধি মানে ব্রেন ডেসট্রয় (destroy)। অদ্ভুত লাগছে।

স্থিত সমাধি হলে দর্শন হচ্ছে কিভাবে? একথা ভাবতে ভাবতে ওখান থেকে বেরোনোর পর ছেলেটিকে আর দেখতে পেলাম না। এবার জগদ্ধাত্রী তলায় এলাম। দেখি রাস্তা ধ্বংস হয়ে গেছে। নতুন রাস্তা তৈরির জন্য লরি লরি বড় বড় হলুদ রঙের ছোলা নামানো হয়েছে রাস্তায়। প্রচুর ছোলা—এত ছোলা যে ছোলার ছোট ছোট পাহাড় হয়ে গেছে। সেই ছোলা

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...69

দিয়ে রাস্তা তৈরী হচ্ছে। কর্মীরা বলল, এই রাস্তা নিচের রাস্তার চেয়েও শক্ত ও মজবুত হবে—এটা কখনোই ভাঙবে না। খুব অবাক হলাম।

---শুভাশিস দাস

বোলপুর

ব্যাখ্যা---

স্থিত সমাধি—দ্বিতীয় স্তরে স্থিত সমাধি হলে সহস্রারে ব্যক্তিগত ধর্মীয় সংস্কার ধ্বংস হয়ে যায়। ছোলার রাস্তা—অসংখ্য মানুষের মধ্যে ব্রহ্মত্বের বিকাশ কাহিনী একসূত্রে গেঁথে বহুত্বে একত্বের তথা সত্য পথের দিশা। এ যুগে—I am the way না বলে We are the way বলার ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে। এটা যে সমষ্টির সাধনের যুগ।

● ২৪শে অক্টোবর, ২০২০ রাত্রে স্বপ্নে দেখছি— বাপের বাড়িতে আছি। ঘরের বাইরের দিকে ছোড়দা বসে আছে। ভিতরে বাবাই (সব্যসাচী) খালি গায়ে ধুতি পরে সামনে এসে দাঁড়ালো। ডান হাতের মধ্যমা দিয়ে ওকে ভাইফোঁটা দিলাম। চন্দনটা কপালে চামড়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটু ফুলে উঠল। স্থায়ীভাবে মিশে গেল। .....

---বিশাখা চ্যাটার্জী

জামবুনি,বোলপুর

ব্যাখ্যা---

ভাইফোঁটা—চৈতন্যকে বরণ। সব্যসাচী—আত্মিক অনুভূতির দুটি দিক আছে। তত্ত্বগত ও প্রায়োগিক দিক। ডান হাতের মধ্যমা দিয়ে বরণ—আত্মিক অনুভূতির Practical aspect-কে বরণ। নিজে মনন করে দর্শন-অনুভূতির মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম ও বাস্তব জীবনে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। ছোড়দা বাইরে বসে—এখন থেকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা পেতে পাঠক নির্ভরতা কমে যাবে। অনেক স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিজেই পারবে।

ধর্ম মা

● দেখছি (25.8.20)—বাবার মুখের উপর একটা আরশোলা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ পর আরশোলাটা ঐ মাপেরই একটা ছোট্ট বিড়াল হয়ে

গেল। আবার কিছুক্ষণ পর বিড়ালটি অদৃশ্য হয়ে গেল। সবাই তাকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু বিড়ালটিকে নয়, বিড়ালটির মা-কে। খুঁজতে খুঁজতে পাওয়া গেলো একটি সাদা কুকুর। তার দুটি চোখ ছাড়াও মুখের জায়গায় মুখের বদলে আরও একটি চোখ রয়েছে। মনে হচ্ছে ঐ কুকুরটিই যেন হারিয়ে যাওয়া বিড়ালটির মা। কুকুরটি মানুষের মতো কথা বলছে—গভীর জ্ঞানের কথা। ওর চোখ তিনটি উজ্জ্বল নীল। .....

---অঙ্কনা মাইতি
কাষ্ঠডাঙা

ব্যাখ্যা---

বাবা—পরম পিতা—শ্রী জীবনকৃষ্ণ। আরশোলা—ক্ষুদ্র জীব। মানুষ তার জীবত্ব দিয়ে জগৎচৈতন্যকে (বাবাকে) জানার চেষ্টা করে। কিন্তু জানতে পারে না। ঐ মাপের ছোট্ট বিড়াল হয়ে গেল—জগৎ চৈতন্য তার একত্ব বা ব্রহ্মত্ব দান করেন। তখন আরশোলা বিড়াল (divine) হয়। অণু পরিমাণ চৈতন্যসত্তা লাভ করে, যা দিয়ে জগৎ চৈতন্যকে জানা শুরু হয়। অবশেষে খুঁজে পায় বিড়ালটির মা-কে, সাদা কুকুরটিকে—অর্থাৎ মনুষ্যজাতির মধ্যে সমষ্টিচৈতন্যকে। তখন বহু মানুষ (ঈশ্বর অনুরাগীদের জগৎ—ধর্ম মা) তাদের দর্শনের কথা শুনিয়ে তাকে বহুত্বে একত্বের বোধ দান করে। এই-ই জ্ঞানের চূড়ান্ত কথা।

● দেখছি (2.11.2020)—রাস্তা দিয়ে একজন লোক যাচ্ছিল। আমাকে দেখতে পেয়ে সে জিজ্ঞেস করল, কী রে তিন্নি কেমন আছিস? মনে হল ও আমার বন্ধুর মতো। বললাম, ভালো আছি। ওর হাতে একটা কোরান ছিল। ভাবলাম ওকে একটা প্রশ্ন করে দেখি উত্তর দিতে পারে কিনা। জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা সুখ কি সত্যিই পাওয়া যায়? ও বলল, হ্যাঁ, মন সহস্রারে পৌঁছালেই সুখ পাওয়া যায়। আমি অবাক হলাম। এ তো বেশ জ্ঞানী।

---স্নেহা রায় (তিন্নি)
সখেরবাজার

ব্যাখ্যা : সুখ=সু—সুপ্রতিষ্ঠিত+খ—জ্ঞান।

নবীনা

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...71

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...73

ভারতীয় কবিতা

● আজ (30.6.2020)— আশ্চর্য এক স্বপ্ন দেখলাম। দেখছি—ভারতীয় ছন্দবদ্ধ কবিতায় আমি একটি অতি ক্ষুদ্র বিন্দু হয়ে বসে আছি, ফুল স্টপের মত বিন্দু। শরীর বলে কিছু নেই যেন। শেষ প্রান্তে বসে কবিতার উপরের অংশ দেখছি আর মুখে বলছি—"মুখস্থ করবে বলে, ভারতীয় কবিতায় আমাকে একটা বিন্দু করে নিলে।"

অনুভূতিটা কোনভাবেই লিখে বা বলে বোঝানো যাবে না। শেষ কথাগুলো মন্ত্রের মতো জপ করতে করতে ঘুম ভাঙলো। নিজের অস্তিত্ব যেন বিন্দু। অদ্ভুত আনন্দ শরীর ও মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

---বরুণ ব্যানার্জী
বোলপুর

ব্যাখ্যা---

ভারত আধ্যাত্মিকতার প্রতীক। ভারতীয় কবিতা—আত্মিক ছন্দবদ্ধ জীবন। নির্গুণ ব্রহ্ম শ্রী জীবনকৃষ্ণের তথা সমষ্টিচৈতন্যের ঘনমূর্তির জীবন। কবিতায় বিন্দু হয়ে থাকা—ঐ জীবনের সাথে ওতপ্রোত হয়ে, একত্ব লাভ করে, অস্তিমাত্র বোধে ঐ জীবনের মাধুর্য উপভোগ করবেন দ্রষ্টা। মুখস্থ করবে বলে—ধারণা করিয়ে দেবেন বলে। দ্রষ্টা বুঝবেন, তাকে অহংশূন্য করে, অস্তিমাত্র বোধে জগতে চৈতন্যের বিকাশের সকল সৌন্দর্য ও মাধুর্য রস আস্বাদন করাবেন।

● দেখছি (25-6-2020)—যাত্রাপথ বইটাতে সূর্যের মধ্যে জীবনকৃষ্ণের আউটলাইন আছে, আমি যেন তার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছি। তারপর দেখি একটা গ্রন্থাগার। আমি সামনের বেঞ্চে বসে আছি। একটা বিরাট বড় খাতা আমার হাতে। আমি লিখছি। সামনে ব্ল্যাকবোর্ড। ওখানে লিখে লিখে একটি অল্পবয়সী ছেলে পড়াচ্ছে। চোখে তার চশমা। একসময় আমার পাশে এসে বসলো। তখন মনে হল আরে এ তো বোলপুরের জয়দা। প্রচণ্ড আনন্দ হলো।

---মৌমিতা মুখার্জী
চন্দননগর

ব্যাখ্যা---

আত্মিক জগতে যাত্রাপথ জীবনকৃষ্ণে এসে থেমেছে। এরপর তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারে (লাইব্রেরী) ডুব দিতে তিনিই সাহায্য করবেন নতুন বিকাশে।

চৈতন্যের রমণ

● ৩০শে আগস্ট, ২০২০ স্বপ্নে দেখছি—পাঠচক্রের মেয়েরা সবাই মিলে খাওয়া দাওয়া করছি। তারপর আমি আর ইলা দোতলায় গেলাম। সেখানে দেখছি দুটি সাপ। একটির উপর আর একটি চেপে আছে। নীচের সাপটির গায়ে উপরের সাপটি জিভ বুলিয়ে দিল। অমনি নীচের সাপটির মুখটি একটি বৃদ্ধ মানুষের মতো হয়ে গেল। তিনি রাজমুকুট পরে আছেন। তার মুখে পাকা দাড়ি। উপরের সাপটির মুখ একটি যুবকের মুখ হয়ে গেল। তার মাথায় কিন্তু মুকুট নেই। কিন্তু সেও রাজবেশ পরে আছে। সে মাঝে মাঝে জিভটা সাপের গায়ে ঠেকাচ্ছে। তাই দেখে আমি ইলাকে বলছি যে ঐ দ্যাখ্ রমণ করছে। জগৎ-চৈতন্যের সাথে সমষ্টিচৈতন্যের রমণ হচ্ছে। হঠাৎ বয়স্ক মানুষটি বললেন, এটা তোমাদের দেখার সময় হয় নি। এটা দেখার ভাগ্য থাকা চাই। তোমরা এখান থেকে যাও। আমার একটু ভয়ও হল। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নীচে চলে এলাম। ....ঘুম ভাঙলো।

---শিখা মুখার্জী
কাগাস, আমোদপুর

ব্যাখ্যা---

নিচের সাপটি—জগৎচৈতন্য—শ্রী জীবনকৃষ্ণ। তিনি রাজা—পরম এক। উপরের সাপটি— সমষ্টিচৈতন্য—ইনিও রাজা কিন্তু সকলের সাথে সম্পূর্ণ এক হয়ে থাকবেন। তাই রাজমুকুট তথা স্বতন্ত্রতা নেই। জিভ দিয়ে চেটে রমণ—শ্রীজীবনকৃষ্ণের বাণী ও তাকে নিয়ে দর্শন অনুভূতির অনুশীলন ও স্বরূপ উন্মোচন করবেন আর দেহে জগৎচৈতন্যের সাথে রমণ সুখ অনুভব করবেন সেই মানুষটি যিনি সমষ্টিচৈতন্যের আধার। তার মননের ধারা অবলম্বন করে বহু মানুষও উপরমণ সুখ অনুভব করবে। এটা দেখার ভাগ্য চাই—দ্রষ্টা সৌভাগ্যবতী সেকথা ধরিয়ে দিচ্ছেন। সময় হয়নি—পাঠে বলা হয় সমষ্টিচৈতন্যের বিকাশ হবে, এখনও শুরু হয়নি। কিন্তু এই স্বপ্নে দ্রষ্টার

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...75

মারফৎ জানানো হল যে সেই বিকাশ শুরু হয়ে গেছে, জগৎকে জানাও। আর কেউ যেন না বলে যে নতুন বিকাশের এখনও সময় হয় নি।

অনুচৈতন্য

● স্বপ্নে দেখছি (22.6.2020)—একটা বড় হাতি দাঁড়িয়ে আছে। তার শুঁড়ের মধ্যে একজন ধুতি পাঞ্জাবী পরা মানুষ বসে আছে। হাতির পেটের মধ্যে একটি ভারতের ম্যাপ। ম্যাপের মধ্যে অনেক মানুষের মাথা গিজগিজ করছে। কোথা থেকে বিধান রায় এল। হাতে একটা ছোট লাঠি। লাঠিতে করে হাতির পেটে ম্যাপটা দেখিয়ে আমাকে বলছে, এই দেখ এটা অনুচৈতন্য।....

---সবিতা ঘোষ
চারুপল্লী

ব্যাখ্যা---

বড়ো হাতি—জগৎচৈতন্যের প্রতীক। শুঁড়ের উপর বসে থাকা মানুষ—শ্রী জীবনকৃষ্ণ, জগৎচৈতন্যের ক্রিয়াশীলতা যার মধ্যে দিয়ে বোঝা যায়। জগৎ চৈতন্য এখন সমষ্টিচৈতন্যে পরিবর্তিত হয়েছে যা অসংখ্য মানুষের মধ্যে অনুচৈতন্যের জন্ম দিচ্ছে। ভারতের ম্যাপ—আত্মিক জগৎ তথা ঈশ্বর অনুরাগীদের জগৎ। বিধান রায়—Cosmic law, ধর্ম জীবন্ত হয়ে দর্শন ও অনুভূতি-র লাঠি দিয়ে সত্য জানিয়ে দিচ্ছে।

● দেখছি (জুন,2020)—একটা হাতি শুঁড় তুলে আছে। হাতির ভিতরের দাঁতগুলো সব দেখছি। এরপর অনুভব করলাম হাতিটার গলা দিয়ে পেটের মধ্যে গিয়ে পৌঁছেছি। সেখানে একটা হাতির বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি। দেখছি হাতিটা বাচ্চাটাকে প্রসব করলো। আমিও অমনি ওর পেট থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম। আর গা থেকে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হবার পর যেমন গন্ধ থাকে তেমনি গন্ধ ও লালারস লেগে রয়েছে।

---সঞ্জয় রায়
বেহালা

ব্যাখ্যা---

হাতির ভিতরের দাঁত—হাতির বাইরের দাঁত শোভা, ভিতরের দাঁত দিয়ে সে খায়। মানুষ এতদিন জীবনকৃষ্ণের চিন্ময় রূপ দর্শন করলেও ঠিক

ঠিক গ্রাস করা হয়নি তাঁর। এবার সেই অধ্যায় শুরু হ'ল এবং তাঁর সত্তা লাভ করে অণু পরিমাণে চৈতন্য জাগ্রত হচ্ছে যার প্রমাণ দেবে অপর অনেকে (ভূমিষ্ঠ হওয়ায়)।

হও সচেতন

● ৩০শে অক্টোবর, ২০২০ স্বপ্নে দেখছি—একটা গরু হঠাৎ বাচ্চা (বাছুর) প্রসব করল। গরুটাকে দেখে মনে হচ্ছে সে জানত না যে সে সন্তান সম্ভবা। সন্তান হবার পরও কিছু বুঝতে না পেরে সন্তানকে ফেলে এগিয়ে চলল। তখন বাছুরটি দেখছি ছুটে গিয়ে মায়ের গা চাটতে লাগল। এবার মাও বাছুরটির গা চাটতে লাগল।.....

---প্রশান্ত রুজ
বোলপুর

ব্যাখ্যা---

দ্রষ্টার মধ্যে যে অনুচৈতন্য জাগ্রত হয়েছে দ্রষ্টা এ ব্যাপারে সজাগ নয়। তার মনে হচ্ছে যে আত্মিকে তার তেমন কিছুই অগ্রগতি হয় নি। ভিতরের সেই চৈতন্য এবার তাকে জানান দিচ্ছে এবং সে ধীরে ধীরে উপলব্ধি করছে তার সত্তার জাগরণকে।

● স্বপ্নে দেখছি (30.9.2020)—গ্রামের ভিতর বড় একটা দালান বাড়ি। শান্ত পরিবেশ। সেখানে পাঠের ছেলেরা রয়েছে অনেকে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একটা ইয়ং ছেলেকে বলছি—জানো, এখন ঋতম্ বদিষ্যামি, অমৃতজীবন এসব ডায়েরীগুলো পড়লে in between lines এ যে অনেক কথা আছে সেগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আগে ধরতে পারতাম না। ঐ ছেলেটি তখন আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, হ্যাঁ, নির্গুণের দ্বার খুলে গেলে এরকম হয়।।

---তন্ময় নাথ
শীলপাড়া, বেহালা

● স্বপ্নে দেখছি (31st oct, 2020)—রাস্তার উপর দুটি সুন্দর পাখি। একজন বলল, আমি মা পাখি, অপরজন বলল, আমি বাবা পাখি। ....বাড়িতে জীবনকৃষ্ণ এলেন। পাঠে বসলেন। পাখি দুটিও এল। পাঠক জীবনকৃষ্ণ

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...77

বললেন, ওনারা আমার মা ও বাবা। ....খুব অবাক হলাম।

---শ্বেতবরণী দত্ত
গড়গড়িয়া, বীরভূম

ব্যাখ্যা---

জীবনকৃষ্ণ—দ্রষ্টার দেবসত্তা—অনুচৈতন্য। বাবা পাখি—জগৎচৈতন্য। মা পাখি—সমষ্টিচৈতন্য—অসংখ্য অনুচৈতন্যের জন্মদাত্রী।

এষণা

● ২৮শে অক্টোবর, ২০২০ একটা স্বপ্ন দেখলাম। দেখছি—একটি মেয়ের নতুন বিয়ে হয়েছে। সে আমার ব্লাউজ তৈরী করে দেবে। তার দোকানের নাম লেখা রয়েছে এষণা। পরের দৃশ্যে দেখছি—বিছানায় শুয়ে আছি। পায়ের কাছে একটা সেলাই মেশিন রয়েছে। মেশিনের কাছে মেঝের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন স্নেহময়দা। ভাবলাম, উনিই কি ব্লাউজটা তৈরী করবেন? পরক্ষণে মনে হল, না, তৈরী করবে মন নামে একটি বৌ। খয়েরী রঙের ব্লাউজ পিসটা দেখতেও পাচ্ছি।.....

---চৈতালী পাল
আড়িয়াদহ

ব্যাখ্যা---

দোকান—জগৎ। এষণা—অনুসন্ধান—খোঁজা। এখানে আত্মানুসন্ধান। নতুন বৌ—দ্রষ্টা নিজে। তার নতুন জীবন লাভ হয়েছে। স্নেহময়দা—আত্মিক অনুশীলন তথা মননকারীদের জগতের প্রতিনিধি। শ্রী জীবনকৃষ্ণ বলেছেন, জগতের মানুষের মনে তিনি অমর হয়ে থেকে যাবেন। অর্থাৎ স্মৃতিমাত্র না হয়ে সদা ক্রিয়াশীল হয়ে থাকবেন। ভগবানকে দর্জির সঙ্গে তুলনা করা হয়। জীবনকৃষ্ণের সত্তা লাভে দ্রষ্টা দর্জির গুণ লাভ করেছে। তার মনও মননের ক্রিয়াশীলতা লাভ করেছে। মননকারী মানুষদের (স্নেহময়দা) সান্নিধ্যে দ্রষ্টা এখন দর্শন অনুভূতির মননে দেহকে যোগযুক্ত রাখা (মন কর্তৃক ব্লাউজ তৈরী) ও একত্বের রসাস্বাদনে সমর্থ হয়ে উঠছেন।

এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণা ব্যানার্জীর বহু আগে দেখা (আগস্ট, ২০১৭) একটি স্বপ্ন স্মরণ করা যেতে পারে। দেখছি—সবাই যেন স্বনির্ভর হবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। সবাই দর্জির কাজ শিখছি। প্রধান দর্জি তার দলবল নিয়ে চলে এসেছে কাজ শিখিয়ে দেবার জন্য। সবার জন্য মেশিনও কেনা হয়েছে।.....

● দেখছি---আমি যা কথা বলছি তা আমার কানে কানে অমরেশদা আগে আগে বলে দিচ্ছে। আমি নিজস্ব কোন কথা বলছি না।....অমরেশ—অমর যে ঈশ (দেবতা)—জীবনকৃষ্ণ। বুঝলাম তিনি আমার ভিতরে ক্রিয়াশীল।

---অভিজিৎ রায়
ইলামবাজার

আশ্চর্য পাখি

● আজ (12.7.2020) দুপুরে স্বপ্নে দেখলাম—ঘরে ধলকাকা, ছোট মামা, আমার ছাত্ররা ও আরও অনেকে রয়েছে। আলোচনা চলছে। একজন ছাত্র বলল, স্যার আপনি কী করে একটানা এত সুন্দর বলতে পারেন? আমি চুপ করে থাকলাম। পরে ছোটমামা ওদের বলল, মনে কর একটা পাখী আছে। ওরা পাখির বিষয়ে আমার পড়ানো কিছু কথা বলতে শুরু করল। বলছে, পাখি থাকলে এই হবে, ঐ হবে ইত্যাদি। আমি বললাম, না, না। ওসব নয়। এটা অন্য কথা। শোন। তখন ছোটমামা একটা টিফিন ক্যারিয়ার বের করল—সেটা খুলতেই একটা খুব সুন্দর লাল রঙের পাখির বাচ্চা বেরোল। ওটা ঈগল পাখির বাচ্চা বলে মনে হচ্ছে। পাখিটা আমার কাঁধে এসে বসল। আমি বললাম, তোকে আবার ঢুকিয়ে দিই। তা না হলে তো তুই উড়ে চলে যাবি। পাখিটি তখন ডানা দুটি দিয়ে আমাকে চেপে ধরল। বুঝলাম ও বলতে চাইছে—তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। তখন ওকে কাপড় রাখা আলনায় বসিয়ে দিলাম। সকলে ওকে দেখছে। ও খুব আনন্দ পাচ্ছে। হঠাৎ নজরে পড়ল একটা কুকুর ঘরে ঢুকতে চেষ্টা করছে। আমি ওকে তাড়িয়ে দিতে বাড়ির বাইরে গেলাম। ওকে তাড়িয়ে এদিক ঘুরে আবার বাড়ি এসে দেখি পাখিটা বসে আছে আলনায়, পালায় নি। এত আনন্দ হচ্ছিল ঐ পাখিটাকে দেখে যে কী বলবো! .....ঘুম ভাঙলো।

---জয়কৃষ্ণ চ্যাটার্জী
জামবুনি, বোলপুর

ব্যাখ্যা---

ঈগল পাখি—আত্মা পাখি—জগতাত্মা—সমষ্টিচৈতন্য। দ্রষ্টার ভিতর থেকে ঐ পাখী কথা বলেন। তাই একটানা এত সুন্দর বলতে পারেন। কুকুর—প্রচলিত ধর্মীয় সংস্কার। টিফিন ক্যারিয়ার থেকে বেরিয়ে এল পাখীটা—সমষ্টিচৈতন্য

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...79

ক্ষণকালের আভাস থেকে চিরকালের তরে প্রকাশ হয়ে পড়লেন।

পড়ানোর ঘর—অনুশীলন হচ্ছে যেখানে, সেখানে যেন চিন্তার জড়ত্ব, গতানুগতিকতা প্রশ্রয় না পায় তাই কুকুরটাকে তাড়ালেন।

প্রোজেক্ট

● স্বপ্নে দেখছি— কয়েকজন বন্ধুর সাথে কোথাও গেছি। কিছু বন্ধু আবার সেখান থেকে অন্য এক জায়গায় নিয়ে এসে ফেলল। সেটা একটা গ্রাম। অন্ধকার। বোনকে বললাম, চল্, আমরা আগের সেই জায়গায় ফিরে যাই। আসার সময় কিছু পুরোন বাড়ি দেখতে পেয়েছিলাম। সে রকম একটা বাড়িতে ঢুকে দেখি একজন অতি বৃদ্ধ মানুষ বসে রয়েছেন। তার কাছে বড় একটা টিয়াপাখী রয়েছে। অপূর্ব দেখতে। একটু অন্যরকম স্পেশাল। আমি বললাম, এর দাম কত? আমি এটা কিনতে চাই। উনি বললেন, প্রজেক্ট করলে তিরিশ (৩০) টাকা। মনে হল বলতে চাইছেন ৩০ টাকায় ভাড়া নিয়ে প্রোজেক্ট (Project) করতে পারি। আমি বললাম, না, না আমি ঐ পাখিটা কিনতে চাই। বৃদ্ধটি পাখিটাকে বলল, কী বলছে রে! তোকে নাকি কিনবে। তখন পাখিটা রেগে আমাকে আক্রমণ করল। আমি ভয়ে ছুটতে লাগলাম। ছুটতে ছুটতে একটা ঘরে ঢুকে পড়লাম দেখি ওটা পাঠের ঘর।...

---রোহিণী সিনহা
দক্ষিণেশ্বর

ব্যাখ্যা---

পাখি—আত্মা পাখি—নির্গুণ আত্মা। ঐ পাখিকে কেনা যায় না—নির্গুণ তথা সমষ্টিচৈতন্যকে পুরো ধারণা করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সেটি সম্ভব ১ম স্তরের সাধন যার সেই ঊর্ধ্বরেত পুরুষের পক্ষে। বৃদ্ধ মানুষ—সমষ্টিচৈতন্যের আধার। প্রজেক্ট করলে তিরিশ টাকা—নির্গুণের প্রসন্নতা লাভে ও তার সাথে একত্ব লাভ (মাঝে মধ্যে) হলে সাধারণ মানুষের মধ্যেও অনুচৈতন্য জন্ম নেয় ও প্রোজেক্ট তৈরী করা যায়। তখন সমষ্টিচৈতন্যের বিকাশের কিছু মহিমা তার মননে ধরা পড়ে ও সেকথা পাঠে বলা যায়—পাঠচক্রের সকলে আনন্দ পায়। ৩০ টাকা—৩০ সংখ্যাটি সৃষ্টিশীল ভাবনার প্রতীক।

প্রোজেক্ট করা— দর্শনের Practical aspect নিয়ে ভাবা।

আত্মারাম

● স্বপ্নে দেখছি (6.7.2020)—সোনারপুরে দিদির বাড়ি বেড়াতে গেছি। সেখানে চণ্ডীপুজোয় খুব ধূম হয়। দিদি আমাকে বলল, তুই যখন এসেছিস, লুচিগুলো ভেজে ফেল। আমি তরকারী করে রেখেছি। আমি লুচি ভাজলাম। এমন সময় সেখানে চণ্ডীপুজোর প্রধান পুরোহিত এসেছেন। বয়স ৫০/৫২ হবে। তার গলায় পৈতে, পরণে ধুতি। তার সঙ্গে একজন এসেছেন, বয়স ২৭/২৮ হবে, তার পরণেও ধুতি কিন্তু তার গলায় পৈতে নাই। দ্বিতীয় জন অর্থাৎ কম বয়সী ছেলেটি বলল, আপনার ভাজা লুচি খুব ভালো হয়েছে। প্রথম জন (পুরোহিত) বললেন, ও আমার লোক। আমার নাম আত্মারাম আর ওর নাম আত্মারামেশ্বর। ....স্বপ্ন শেষ।

---কেতকী পাঠক
সখেরবাজার

ব্যাখ্যা---

শ্রী জীবনকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মত্ব লাভ করলেন তিনি হলেন, আত্মারাম শিব। পরে তিনি যখন উপাধিশূন্য পরম এক হয়ে অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্ম রূপে অন্যদের মধ্যে ফুটে উঠছেন তখন তিনি আত্মারামেশ্বর শিব। যারা তাঁকে ভিতরে দেখছে তারা দ্বিতীয় স্তরে আত্মারাম শিব হন। স্বপ্নে দেখা আত্মারাম ও আত্মারামেশ্বর বস্তুত শ্রীজীবনকৃষ্ণের দুটি আত্মিক অবস্থাকে নির্দেশ করছে। আত্মারামেশ্বর অবস্থা পরবর্তীকালে হয়েছে, তুলনায় নবীন, তাই কম বয়সী। উপাধি শূন্য তাই গলায় পৈতে নেই।

● দেখছি (5.10.2020)—জয় কাকা রজনীগন্ধা ফুলের মধ্যে ঢুকে আছে। ফুলটা যত বড় হচ্ছে জয় কাকাও তত বড় হচ্ছে। যখন ফুলটা ঝরে গেল তখন কাকাও ফুল থেকে বেরিয়ে এল। কাকার গা থেকে রজনীগন্ধার গন্ধ উঠছিল। তারপর থেকে জয় কাকা যা যা করছে সেটাই সুন্দর হচ্ছে। ...

---শ্রাবন্তী রায়
ইলামবাজার

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...81

ব্যাখ্যা---

ফল হলে ফুল ঝরে যায়। চৈতন্যের বিকাশের পূর্ণ পরিণত রূপ Perfect one- কে জগতের সাধারণ মানুষ পাচ্ছে ও দেবত্ব পরিচালিত হয়ে তাদের জীবন সুন্দর হয়ে উঠছে।

তত্ত্বকথা নয়

● দেখছি (24-10-2020)—আমি আর জয়দা স্কুটি নিয়ে কোন দোতলা বাড়ির নীচে দাঁড়িয়ে আছি। কোন একটা বিয়ে বাড়ীতে যেতে হবে। সেখানে না গিয়ে বাকীরা পাঠ করতেই লাগলো। জয়দা স্কুটিতে বসে বলছে এগুলো ঠিক নয় জানিস তো? Oneness-এর Practical aspect টা কই? আমি বললাম, ঠিকই বলেছো। শুধু তত্ত্ব-গত পাঠ (theoretical) করেই যাচ্ছে দেখছি। বাকীদের মধ্যে সেই Urge টা নেই এক হওয়ার। জয়দা বলল, হবেই বা কী করে? ওরা ভাবে যে Oneness হবেই না। মানে বুঝছিস তো? মানে একটা ইনফিরিওরিটি কম্প্লেক্সে (হীনমন্যতায়) ভোগে।

তারপর কোন একজনকে ওই প্রশ্নটা করছি। সে সাদা রঙের বিরাট মানুষ, মনে হচ্ছে পৃথিবীর চেয়েও বড়। সে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমাকে ৮ ভাইয়ের কাছে ফিরে যেতে হবে এবার। ৮ ভাই মানে ক্ষিতি,অপ্,তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মহাকাশ, আর বাকী নাম দুটো কী বলল আমার মনে নেই। ও you-tube এর মাধ্যমে বলছে মনে হচ্ছে। পাশে you-tube live-এ আছে ভাইগুলো। যেমন Earth channel, water channel live ইত্যাদি।

---অমৃত চ্যাটার্জী (শঙ্খ)
ইলামবাজার

ব্যাখ্যা---

বিয়ে বাড়ি না গিয়ে পাঠ করতে লাগলো—নিয়ম করে, স্টিরিও টাইপ পাঠ করা। এতে সব মানুষের আত্মিক একত্বের (মিলনের) বাস্তব দিকটি উপেক্ষিত হয়। তাই বলছে oneness এর Practical aspect কই? শুধু তত্ত্বগত theoretical পাঠ হচ্ছে—এই তত্ত্বগত পাঠ দু'রকম।

১) Inducted theory এবং ২) Deducted theory ভিত্তিক পাঠ। Inducted theory হ'ল পাণ্ডিত্য দিয়ে, কল্পনা করে আত্মিক জগতে ভবিষ্যতে

কী হবে এ বিষয়ে আলোচনা করা। ভবিষ্যতে এই হতে চলেছে, এই হতে পারে, এই রকম ঘটবে—ইত্যাদি ভাবনা। Deducted theory হ'ল—অনুমান ছেড়ে বহু দর্শন-অনুভূতি থেকে আত্মিক জগতের বাস্তব অবস্থার তত্ত্ব-গত দিকটি বোঝা।

Practical aspect of oneness—একত্বের প্রায়োগিক দিকটি হল, ভাবনার জগতে পরিবর্তন, বোধের পরিবর্তন যা জীবনচর্যার পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষের মন ও মননের অভিমুখকে আত্মিক একত্ব অভিমুখী করে। একত্বলাভের তীব্র ব্যাকুলতা (Urge) জাগায়। হীনমন্যতায় ভোগে—মনের জোর কম, আমি জীবনকৃষ্ণেরই সত্তা—এই জাতীয় দর্শন-অনুভূতি হলেও Heroworship- এর (Hero-র নাম ও রূপের) সংস্কার ত্যাগ করতে পারে না। তাই অখণ্ড একের বোধ জাগে না।

সাদা রঙের বিরাট মানুষ—সমষ্টি চৈতন্য। আট ভাই—ছয় ভাইয়ের নাম মনে আছে। বাকী দু'জন হলো দৃষ্টি ও বাণী। দৃষ্টি-একত্বের দৃষ্টিভঙ্গী মাথায় জাগা। বাণী—সমষ্টির সাধনের নিরিখে যোগের ভাষার স্ফূর্তি। ভাইদের কাছে ফিরে যাওয়া—মনুষ্যজাতির পঞ্চভূতাত্মক দেহে বিলীন হওয়া ও আরও গভীরে গিয়ে তাদের নির্গুণের শক্তিতে, মননের দৃষ্টিতে এবং যোগের কথায় ক্রিয়া করা। You-tube channel-এ কথা বলা—মহাকারণ থেকে বলা।

● স্বপ্ন দেখছি---স্বপ্নের মধ্যে মনে হচ্ছে শ্রী জীবনকৃষ্ণ 1947 সালের 15 আগষ্ট দিনটির জন্য বিশেষভাবে অপেক্ষা করেছিলেন এবং দিনটিকে খুব গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তারপর দেখছি—আমি আমাদের ঘরের মধ্যে ডান হাতে একটা বেগুন ও বাঁ হাতে একটা আদার চাক নিয়ে জীবনকৃষ্ণের শ্যাডো ছবিটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। ...স্বপ্ন ভাঙল।

---সোমনাথ বিশ্বাস
সখেরবাজার

ব্যাখ্যা---

বেগুন—নির্গুণের শক্তি। আদা—গ্রন্থিযুক্ত কাণ্ড—জট পাকানো আত্মিক জ্ঞান। জীবনকৃষ্ণের শ্যাডো মূর্তি—নির্গুণ ব্রহ্ম শ্রীজীবনকৃষ্ণ। নির্গুণের ঘনমূর্তি রূপে জীবনকৃষ্ণকে দেখে ভিতরে নির্গুণের শক্তি জেগে উঠলে

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...83

মাথার মধ্যে যে সমস্ত আত্মিক চিন্তার গিঁট লেগে থাকে তা ছাড়ানো সম্ভব হয় এবং চিন্তা ও চেতনার মুক্তি ঘটে।

বরযাত্রী

● দেখছি (13.9.2020)—আমাদের গ্রামে টোটন (নীলোৎপল) বলে একটা ছেলের বিয়ে। বিয়ের কাজকর্ম করার জন্য আমাদের কয়েকটি ছেলেকে দায়িত্ব দিয়েছে কিন্তু তাদের সাথে আমার মতের মিল হচ্ছে না। খাবার নাকি কম আছে, সকলের হবে না ইত্যাদি বিষয় নিয়ে রাগারাগি করে বাড়ি চলে এলাম। বিকেলে আবার ছেলেগুলো ক্ষমা চেয়ে জোর করে আমাকে নিয়ে গেল। তারপর বরযাত্রীর গাড়িতে চেপে দেখছি বর আর কেউ নয়, ঠাকুর জীবনকৃষ্ণ স্বয়ং। অবাক হলাম।...

---দীপঙ্কর বারিক
সুলতানপুর, বোলপুর

ব্যাখ্যা---

বরযাত্রী—একত্ব আস্বাদনের অধিকারী মানুষ। খাবার নিয়ে ঝামেলা—এই মুহূর্তে বিষয়টি পাঠচক্র কেন্দ্রিক। কেন এই মুহূর্তে সকলের হচ্ছে না এ নিয়ে মান অভিমান করা যাবে না।

● দেখছি (20.10.2020)—এক জমিদার নেমন্তন্ন করেছে। আমি লুঙ্গি পরে সাদা পাঞ্জাবী গায়ে ডান বগলে একটা সাদা বালিশ নিয়ে জমিদার বাড়ির সামনে পৌঁছালাম। গেটের পাশে সিমেন্টের বসার জায়গায় জমিদার বাবু ও তার ছেলে বসে ছিল। জমিদার বাবুর বয়স 65/66, সবুজ শার্ট গায়ে আর ওনার ছেলের বয়স 30/32, গায়ে সাদা গেঞ্জি ও প্যান্ট পরে আছে। আমাকে দেখেই বলল, এসো, এসো। দরজা খুলে ভিতরে যেতে শুরু করল। আমিও ওনাদের পিছন পিছন গল্প করতে করতে যাচ্ছি। পথ আর শেষ হয় না। পিচের পথ—দু'ধারে ধেনো জমি, গাছপালা। অবাক হয়ে দেখছি। মূল বাড়ীটা গেট থেকে এতদূরে! ভাবতেই পারছি না। বাউণ্ডারীর মধ্যে যেন গোটা একটা জগৎ। প্রায় ২কিমি পথ হাঁটার পর মনে হচ্ছে আর পারছি না। তখন আর জমিদারবাবুকে দেখছি না। ওনার ছেলে বলল, এটা নটঘট স্টপেজ। এরপর যখন আসবে (যেন এবারের

যাওয়া এখানেই শেষ হল) তখন বাসে করে এখানে এসে নামবে। তারপরে ডানদিকের এই পাকা রাস্তা ধরে সোজা গেলেই আমাদের বাড়ি পৌঁছে যাবে। ... ঘুম ভাঙল। মনে হল, ওনাদের বাড়িটা হল নির্গুণের।

---স্নেহময় গাঙ্গুলী
চারুপল্লী, বোলপুর

ব্যাখ্যা---

জমিদার—জগৎচৈতন্য শ্রী জীবনকৃষ্ণ। জমিদারের ছেলে-সমষ্টিচৈতন্য। ভিতরে যেন গোটা জগৎ—সমগ্র আত্মিক জগৎ। লুঙ্গি পরে—যাদের ধর্মে নিরাকার নির্গুণের (আল্লার) কাছে আত্ম-সমর্পণে শান্তির কথা বলা হয়। মনে হল অনেক পথ হেঁটেছি-আলোচনা টু দি পয়েন্ট না হলে চর্চা ছড়িয়ে যায়। মনে হয় অনেক পথ (আত্মিকে) চলা হ'ল—বস্তুত তা নয়। আবার যখন আসবে—একটা জার্নি (Journey) শেষ হ'ল। এবার সমষ্টির যুগে নতুন করে একত্বের পথে যাত্রা শুরু হবে। তবেই গন্তব্য স্থলে (বহুত্বে একত্বের বোধ) পৌঁছানো যাবে। আর কষ্ট করে এতটা পথ একলা হেঁটে যাওয়া নয়—অনুচৈতন্য জাগ্রত হলে সত্যিকার ঈশ্বরপ্রেম জাগে ও তত্ত্ব (theory) ছেড়ে বাস্তব একত্ব লাভ সোজা পথে (Short cut) সম্মিলিত অনুশীলনের মাধ্যমে সম্ভব হয়। বাসে করে নটঘট স্টপে নেমে জমিদার বাড়ি যাওয়া—নটঘট শব্দটি অবৈধ প্রণয়কে বোঝায়। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে সত্যিকার ঈশ্বর প্রেম এতদিন যেন অবৈধ ছিল। এখন থেকে তা বৈধতা পেল। এই প্রেম লাভ করে সম্মিলিতভাবে নির্গুণের সাথে একীভূত হবার পথ উন্মুক্ত হল।

● দেখছি (3.11.20)—শুক্রবারের জুম্মার নমাজের জন্য এক জায়গায় গেছি। ওখানে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে এটি হল জীবনের শেষ পর্যায়ের নমাজ যেখানে আল্লার সাথে এক হয়ে যাওয়ার জন্য প্রার্থনা জানানো হয়। সেই সময় জীবনের ৩টি পর্বে ৩ ধরনের নমাজের কথা মনে এল। আগের দুটি নমাজের মধ্যে প্রথমটিতে বলা হয়—'আল্লা যেন আমাকে দেখা দেন।' দ্বিতীয় ধাপের প্রার্থনাটি হল—'তুমি কৃপা করে জানাও যে তুমিই একমাত্র আছো।'

---বরুণ ব্যানার্জী
বোলপুর

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...85

পাঠ প্রসঙ্গে

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...87

পাঠ প্রসঙ্গে

● পাঠ ও আলোচনা প্রসঙ্গে যে সমস্ত নতুন কথা উঠে আসে তার কিছু কিছু এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হল।

১. "**মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বম মহাপুরুষ সংশ্রয়**"—এই তিনটি জিনিস অনেক তপস্যায়, ভাগ্যে মেলে, একথা বলেছেন শঙ্করাচার্য।

মনুষ্য দেহ ধারণ করে যারা বিবেকাত্মক সংস্কার নিয়ে চলেছে তাদেরই মনুষ্যত্ব লাভ হয়েছে। তারপর মহাপুরুষ সংশ্রয়। মহাপুরুষ কে? না, ভগবান। সেই ভগবানকে যিনি নিজের দেহের ভিতর দেখতে পান তারই মহাপুরুষ সংশ্রয় হয়েছে।

আবার ভগবান দর্শনকারী ব্যক্তিটিকে যারা দেহের ভিতর দেখতে পান তারা ভগবানকেই পাচ্ছেন, তারাও এক অর্থে মহাপুরুষ হচ্ছেন। জীবনকৃষ্ণ বলতেন, তোরা যে আমায় স্বপ্নে দেখিস সে কী আমি: না রে, সে ভগবান। পরে বললেন, তাহলে মহাপুরুষ কে? তোরা-তোরা-তোরা। আমি নেই। আমি নিজেকে তোদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছি।

জগতে প্রথম মনুষ্যত্বের প্রকাশ ঘটল শ্রী জীবনকৃষ্ণের মধ্যে। মনুষ্যত্ব প্রকাশের বাধা হ'ল মানুষের পার্থিব কামনা বাসনা। শ্রী জীবনকৃষ্ণ ছিলেন সর্বপ্রকার কামনার সংস্কারমুক্ত। মাত্র ১২ বছর বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণরূপী ভগবানের প্রতি ভালোবাসা জন্মায়। শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁর ধ্যান জ্ঞান হয়ে ওঠেন। ঠাকুর তাঁকে ২৫ বছর বয়সে ভগবান দর্শন করান। তখন থেকে এই ভগবানের পরিচয় জানতে তিনি আগ্রহী হন। মুমুক্ষু হন। জাগতিক বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকেন। বিলাত ফেরৎ ইঞ্জিনিয়ার হয়েও সামান্য কেরাণীর চাকরী নিয়ে রামকৃষ্ণ অনুধ্যানে ও নিজ দর্শন অনুভূতির মননে অতি সহজ সরল ভাবে দিন যাপন করেন। পরে নিজেই ভগবান হয়ে ওঠেন, নিজেকে বহুর মধ্যে বিক্ষেপ করে—ঊর্ননাভের ন্যায় জাল বিস্তার করে, তাদের অন্তরে বিচিত্র ভাবে ফুটে উঠে নিজের বৃহৎ সত্তার (সর্বজনীন ও সর্বকালীন সত্তার) পরিচয় লাভ করেন। আপন প্রাণের সঙ্গে খেলা চলে তাঁর।

সাধারণ মানুষ, যারা এই মহাপুরুষ তথা মানবব্রহ্মকে অন্তরে দর্শন

করেন ও বোঝেন ইনি সবার স্বরূপ, পরম এক (Absolute one), তাঁর সঙ্গ লাভে তাদের মহাপুরুষ সংশ্রয় হতে শুরু করে। তারা প্রথমে তাঁর ব্রহ্মাত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হন। পরে একসময় তাদের মধ্যেও অণু পরিমাণ চৈতন্য জাগ্রত হতে শুরু করে তাদের নির্গুণের দ্বার খুলে গিয়ে। তাদের মধ্যে মুক্তির ইচ্ছা জাগে। পার্থিব কামনার ঊর্ধ্বে উঠে ঈশ্বরের সাথে মিলনাকাঙ্খা জাগে, প্রকৃত ঈশ্বর প্রেম জন্মলাভ করে। তখন তারা মুমুক্ষু হন। পরে এরা জীবসীমা অতিক্রম করে মানব হবে যখন আত্মিক একত্ববোধ দ্বারা পরিচালিত হবে। বহুত্বে একত্বের ধারণালাভে প্রকৃত বিবেকবান মানুষের জীবনযাপন করবে, একত্বের কৃষ্টি সম্পন্ন নতুন মানুষ হয়ে উঠবে। সেখানে কোন ব্যক্তি বিশেষ মহাপুরুষ—এই বোধ থাকবে না—Hero worship থাকবে না। একজন নির্বাসনা মানুষ মুমুক্ষু হবেন, পরে ভগবান দর্শন ও তার লীলা দর্শনে মহাপুরুষ সংশ্রয় হবে তার। তিনি মহাপুরুষ হয়ে উঠবেন। বিপরীত ক্রমে তিনি মহাপুরুষ তথা ভগবান হয়ে উঠলে তাঁকে অন্তরে দর্শন করে সাধারণ মানুষের প্রথমেই মহাপুরুষ সান্নিধ্য, পরে মুমুক্ষার জাগরণ ও শেষে মনুষ্যত্ব লাভ হওয়া সম্ভব।

২. বিপরীত রতি ঃ প্রাণশক্তি স্বভাবত নিম্নমুখী। কিন্তু ঈশ্বর নির্বাচিত সাধকের দেহে প্রাণশক্তি ঊর্ধ্বমুখী গতিলাভ করে ও সাধন হয়—প্রাণশক্তি আত্মায় পরিবর্তিত হলে সাধক দেহ ও আত্মার রমণ অনুভব করেন এবং এ বিষয়ে কিছু দর্শনও হয়। প্রতীকে এই অবস্থা বোঝাতে শায়িত শিবের উপর দণ্ডায়মান কালীর রূপ কল্পনা করা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, দেহ আত্মার রমণে জৈবী রমণ সুখের কোটিগুণ বেশি আনন্দ।

এই ভগবান রামকৃষ্ণের রূপে ব্যষ্টি চৈতন্য যখন শ্রী জীবনকৃষ্ণের দেহে খেলা করতে শুরু করল, শ্রী জীবনকৃষ্ণ দেহ আত্মার রমণ সুখ অনুভব করলেন, বিপরীত রতির অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। এরপর তার দেহে আবার একটি নতুন অবস্থা হল। তিনি রামকৃষ্ণময় হয়ে পরে সেই অবস্থাকে অতিক্রম করে রামকৃষ্ণকে অবলম্বন করেই নিজের সত্তার বিকাশ ঘটাতে লাগলেন, রামকৃষ্ণের সঙ্গে যেন তাঁর প্রকৃত বিপরীত রতি হতে লাগল। তিনি ব্যষ্টি চৈতন্যকে উন্মুক্ত করে তার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রকাশ করে তাকে অবলম্বন করে নিজের জগৎ চৈতন্য সত্তার প্রকাশ ঘটাতে লাগলেন।

নতুন যুগ। জগৎ চৈতন্য শ্রী জীবনকৃষ্ণ কোন বিশেষ আধার নির্বাচন

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...89

করে তার মধ্যে নিজেকে তিলে তিলে বিকশিত করবেন, তিনি জীবনকৃষ্ণময় হয়ে উঠবেন, ব্যক্তিগত ভাবে বিপরীত রতি সুখ লাভ করবেন, পরে জগৎ চৈতন্য জীবনকৃষ্ণের পরিচয় উন্মোচন করে, জগতের বহুমানুষের দেহ অবলম্বন করে নিজের সমষ্টিচৈতন্য সত্তার প্রকাশ ঘটাবেন—তখন সত্যিকারের বিপরীত রতি জগতের মানুষও অনুভব করবে ও আত্মিকে বহুত্বে একত্ববোধ জন্ম নেবে।

৩. নির্বীজ সমাধি ঃ ঠাকুর বলেছেন, সেঁধানো বীজ পুঁতলে গাছ হয় না। জীবনকৃষ্ণ বলছেন, এটি নির্বীজ সমাধির কথা বলছেন ঠাকুর। নির্বীজ সমাধি হলে কামনার বীজ পুড়ে যায়। মানুষটা সত্যিকার নিষ্কাম হয়।

ঠাকুর বলেছেন, বাজ পড়লে কালী বাড়ির দরজার স্ক্রুর মুখ উড়ে যায়। ঘরের শার্সি ঝন্‌ঝন্ করে ওঠে। বাজ হল পরমাত্মা সাক্ষাৎকারের প্রতীক। পরমাত্মা দর্শন হলে শরীরের উপর দিকে বিশেষ effect হয়, চক্ষু কর্ণ ভীষণ সংবেদনশীল হয়। এমন হয় যে কানে কোন অশ্লীল শব্দ (কান) শুনলে দেহ নিতে পারে না, প্রত্যাহার সমাধি হয় ও দেহ মন শুদ্ধ হয়ে যায়। সম্পূর্ণভাবে কাম উবে যায়। এর কোন অতীত রেফারেন্স নেই। তত্ত্বজ্ঞানের পর সহস্রারের ঢাকনা খুলে যায় ও সহস্রারে বিদ্যুৎ রেখা দর্শন হয়। এটি পরমাত্মা দর্শন। সম্ভবত পরমাত্মা দর্শনের ঠিক আগে নির্বীজ সমাধি হয়।

৪. কবিরাজেরা বোতলের ভিতর মকরধ্বজ তৈয়ার করে। চারিদিকে মাটি দিয়ে আগুনে ফেলে রাখে। বোতলের ভিতর যে সোনা আছে সেই সোনা আগুনের তাপে ও আরও অন্য জিনিসের সাথে মিশে মকরধ্বজ তৈরি হয়। মকরধ্বজ তৈরী হয়ে গেলে বোতলটি লয়ে কবিরাজ আস্তে আস্তে ভেঙে ভিতরের মকরধ্বজ রেখে দেয়। তখন বোতল থাকলেই বা কী আর গেলেই বা কী। ভগবান লাভের পর শরীর গেলেই বা কী। ---কথামৃত

কবিরাজ—নির্গুণ ব্রহ্ম। সোনা দিয়ে তৈরী মকরধ্বজ—আত্মা ও তার বিবর্তিত অবস্থা যা দর্শন ও লাভ করলে মানুষ ভব রোগ থেকে অব্যাহতি পায়। এ যুগে 1st generation ও 2nd generation এর পর 3rd generation এর মকরধ্বজ তৈরী হয়েছে যা সবচেয়ে বেশি কার্যকরী।

সচ্চিদানন্দ গুরুলাভে প্রাণশক্তি অগ্নিবিদ্যার তাপ পায়। দেহের প্রাণশক্তির নির্যাস আত্মারূপে দেখা যায়। 1st generation মকরধ্বজ তৈরি হয়,

তারপর সাধকের দেহ চলে গেলে ক্ষতি নেই। পরবর্তীকালে অপর একটি বোতলে অর্থাৎ দেহে ঐ মকরধ্বজ রেখে আবার তাপ দেওয়া হবে। সেই দেহে চৈতন্যের ঘনীভূত রূপ তথা ষোল আনা মানুষ রতন দর্শন হয় ও পরে গলতে শুরু করে, অর্থাৎ তার নির্যাস নির্গুণে পরিবর্তিত হতে থাকে। তখন তাকে বহু মানুষ সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ বা পরম ব্রহ্মরূপে দর্শন করে। 2nd generation মকরধ্বজ তৈরি হয়। তার দেহ চলে গেলে আর ক্ষতি হয় না।

ঐ সত্তা আবার একটি অন্য দেহে বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। সেখানে নির্গুণের শক্তি বিশেষ রূপ পায়। এই নির্গুণের ঘনমূর্তিই 3rd generation মকরধ্বজ। মকরধ্বজ তৈরী প্রক্রিয়ার এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটান কবিরাজ। কেননা এই মকরধ্বজ প্রয়োগে সর্বসাধারণের ভবরোগ সারবেই। তৃপ্ত কবিরাজ অনুভব করেন এটি তারই বিবর্তিত এক রূপ।

৫. **"একজন মেছুনী মালীর বাড়িতে অতিথি হয়েছিল। মাছ বিক্রি করে আসছে। আঁষচুপড়ি হাতে আছে। তাকে ফুলের ঘরে শুতে দেওয়া হল। অনেক রাত পর্যন্ত ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছে না। গিন্নীকে বলল, আমার আঁষচুপড়িটা আনিয়ে দিতে পারো? তাহলে বোধ হয় ঘুম হতে পারে। শেষে আঁষচুপড়ি আনাতে জল ছিটে দিয়ে নাকের কাছে রেখে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোতে লাগল।" —কথামৃত**

মালী- বনমালী- ভগবান। এখানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে। অতিথি মেছুনী—অবিদ্যামায়া আশ্রিত তমোগুণী ভক্ত যার মন লিঙ্গ গুহ্য নাভিতে—আঁষচুপড়িতে—এখানে কেশব সেন। তিনি মাঝে মধ্যে আসেন ঠাকুরের কাছে—তাই অতিথি। বাড়ীর গিন্নী-মালিনী-বিদ্যামায়া আশ্রিত শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তসত্তা। শুদ্ধাভক্তিতে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য নিয়ে আছেন যিনি। তিনি অপরের কল্যাণের জন্য ভগবৎ কথা বলেন। ফুলের ঘর-সহস্রার, মানুষের মন অন্তর্মুখী হয়। আঁষচুপড়ি—প্রাণময় কোষ—লিঙ্গ গুহ্য নাভি। জল ছিটে দেওয়া মনকে নামিয়ে আনা।

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসায় ও ভগবৎ চর্চা করায় কেশবের মন চড়ে গেছে—এ অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিবাস করলে তার ঘুম হবে না। ভোগসুখের চিন্তা করলে, মন নিম্নভূমিতে নেমে এলে তমোগুণ প্রকট হবে ও ভালো ঘুম হবে তমোগুণী ভক্তের। কেশব সেন যদি আরও বেশি সঙ্গ করতেন

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...91

তাহলে সত্ত্বগুণ প্রাপ্ত হতেন, তখন মন সহস্রারে অবস্থান করলেও কোন অসুবিধা হত না।

আবার অদ্বৈতের ব্যাখ্যায়—এই রূপকের সবটা একজন সাধকের ভিতরের অবস্থা। তার অহং বা আমি অতিথি। তা অবিদ্যামায়া আশ্রয় করে আছে। সে যে বাড়িতে অর্থাৎ দেহে থাকে সেখানে শ্রীভগবান আছেন। আছেন তাঁর ইঙ্গিতবাহী বিদ্যামায়া-গিন্নী। বিদ্যামায়া সাহায্য করলেও আবার মন নেমে যায়—সাধকের জীবসত্তা আঁষচুপড়ি চায়। মালী অর্থাৎ ভগবান স্বয়ং ক্রিয়াশীল হলে, কৃপা করলে ভগবানত্ব লাভ হয়, মেছুনী ও মালিনী থাকে না, দেহে মালীই বিরাজ করেন। মেছুনী সত্তা যে ক্ষণস্থায়ী, অতিথি, তা উপলব্ধি হয়।

৬. **"একজনের এক গামলা রঙ ছিল। অনেকে তার কাছে কাপড় রঙ করাতে আসত। সে লোকটি জিজ্ঞাসা করতো তুমি কী রঙে ছোপাতে চাও। একজন হয়ত বললে, আমি লাল রঙে ছোপাতে চাই। অমনি সেই লোকটি গামলার রঙে সেই কাপড়খানি ছুপিয়ে বলতো এই লও তোমার লাল রঙে ছোপানো কাপড়। আর একজন হয়ত বললে, আমার হলুদ রঙে ছোপানো চাই। অমনি সেই লোকটি সেই গামলায় কাপড়খানি ডুবিয়ে বলতো, এই লও তোমার হলদে রঙে ছোপানো কাপড়। এই রকমে যে যে রঙে ছোপাতে চাইতো তার কাপড় সেই রঙে সেই একই গামলা হতে ছোপানো হ'ত। একজন লোক এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখছিল। যার গামলা সে জিজ্ঞাসা করল, কেমন হে, তোমার কী রঙে ছোপাতে হবে? তখন সে বললে, ভাই! তুমি যে রঙে রঙেছ আমায় সেই রঙ দাও।" —কথামৃত**

রঙের গামলার অধিকারী পুরুষ—নির্গুণ ব্রহ্ম। গামলা-আধার, একটি মানবদেহ। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ। রং-দেহে প্রকাশিত আত্মিক তেজ। বিভিন্ন রঙে কাপড় ছোপানো—বিভিন্ন সংস্কারজ দেব-দেবীর রূপ দর্শন। যার যা ইষ্ট তার কারণ শরীর সেই রূপ ধারণ করে দেখা দেয় ঐ গামলার কাছে গেলে ও গামলার অধিকারী পুরুষটির অর্থাৎ নির্গুণের প্রসন্নতা লাভ করলে। ঠাকুর ভক্তদের বলতেন, মা আমার কথার রাশ ঠেলে দেন। এই মা নির্গুণ ব্রহ্ম, মন্দিরের ভবতারিণী নয়।

চালাক লোকটি বলল, আমাকে তোমার রঙে রাঙিয়ে দাও, অর্থাৎ আমাকে তোমার ঐ দৃশ্যমান সত্তা গামলার মতো করো। তোমার শান্তি

বাণীর মধ্যমা করো। শ্রীজীবনকৃষ্ণ রামকৃষ্ণরূপী গামলা অন্তরে দেখে বস্তুত গামলার অধিকারী নির্গুণ ব্রহ্মের প্রসন্নতা লাভ করলেন। তিনি ভগবান দর্শন করে রামকৃষ্ণময় হয়ে উঠলেন, পরে আরও বড় আধার বা গামলা হয়ে উঠলেন। তাঁর চিন্ময়রূপ সংখ্যাতীত নরনারীর অন্তরে ফুটে উঠতে লাগল। এ কিন্তু সংস্কারের রঙে রঙীন ইষ্টমূর্তি দর্শন নয়। তাঁর রূপে মানুষ ভগবান তথা পরম এককে দেখতে লাগলো। ইনি সর্বজনীন। এ সংস্কারের রঙে রঙীন কাপড় নয়, যেন আমাদের সংস্কারের রঙ ধুয়ে সাদা কাপড় করে দিচ্ছেন। পরে নিজে সাদা কাপড় গামলার অধিকারী নির্গুণ ব্রহ্মে পরিবর্তিত হয়ে নির্গুণের ঘনমূর্তি রূপে ফুটে উঠছেন। সত্যিকারের চালাক লোক হয়ে ধরা দিলেন। তাঁকে অন্তরে পেয়ে সাধারণ মানুষও তার সাথে একত্ব লাভ করে ছোট ছোট গামলা হয়ে উঠবে, চালাক লোক হবে ও শান্তিবাণীর মধ্যমা হয়ে উঠবে।

তাঁর চিন্ময় রূপে বহুর মধ্যে ফুটে উঠে বহু মানুষকে তাঁর সাথে এক করে নিয়ে তাঁর রঙের গামলা করে থাকেন। অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গামলা তৈরি হয়। মাঝে মাঝে চালাক লোক তথা সমষ্টি চৈতন্যের সাথে পূর্ণ একত্ব লাভ করে তারাও চালাক লোক হয়ে ওঠে, তার রঙে রাঙা হয়। উপলব্ধি করে জীবনের উদ্দেশ্য আত্মিকে বহুত্বে একত্ব লাভ করা ও একবোধে চালিত জীবনের পূর্ণতা লাভ করা। তখন মানুষ সত্য অর্থে মানুষ হয়ে উঠবে সকলে একের রঙে রাঙা হয়ে।

৭. গোপিনীদের দেওয়া ক্ষীর সর ননী পেট ভরে খেয়ে ব্যাস বললেন, হে যমুনে যদি কিছু না খেয়ে থাকি তাহলে দু'ভাগ হ'ও। অমনি যমুনা দু'ভাগ হ'ল। তার এই কথার অর্থ আহার গ্রহণ করেছেন হৃদয় মধ্যস্থ নারায়ণ, আমি না।

শ্রীরামকৃষ্ণের যুগ ঃ—বেদব্যাস—যিনি বেদকে ভেঙে বোঝাতে পারেন—ব্রহ্মবিদ পুরুষ—শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে। পেটভরে খেয়ে বললেন, যদি না খেয়ে থাকি.... তোমাদের ভক্তি সহকারে ঈশ্বর জ্ঞানে নিবেদিত ভোজ্য দ্রব্য গ্রহণ করেছি বটে তবে তা ভোগ গ্রহণ নয়, আহার গ্রহণ। সেই আহার্য্যবস্তুর মাধ্যমে তোমাদের ভক্তি হৃদয়মধ্যস্থ নারায়ণ গ্রহণ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদাই ঈশ্বরচিন্তায় রত থেকে যোগযুক্ত থেকেছেন। তিনি ভক্তবাড়িতে গেলে আহার গ্রহণ করতেন। তাকে কোন ভক্ত আহার দিতে

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...93

ভুলে গেলে সামান্য কিছু চেয়েও খেয়ে আসতেন। যমুনা-ভবনদী-সংসার। দু'ভাগ হ'ল—মাথায় সংসার চিন্তার নিরবচ্ছিন্ন ধারা ছিন্ন হ'ল সাময়িক কালের জন্য। গোপীরা—যারা সংসারে থাকলেও অন্তরে অর্থাৎ গোপনে ভগবানের প্রতি প্রেমের আকর্ষণ অনুভব করেন ব্রহ্মবিদের মুখে ভাগবৎ শুনে। বিষয় চিন্তার বাধা অতিক্রম করে ভগবৎ প্রেমতৃষ্ণা মিটত তাদের।

শ্রী জীবনকৃষ্ণের যুগ ঃ বেদব্যাস—জগৎ চৈতন্য শ্রী জীবনকৃষ্ণ—যিনি সর্বজনীন মানব। পেটভরে খেয়ে বললেন, যদি না খেয়ে থাকি—শ্রী জীবনকৃষ্ণ কারও কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করতেন না। তার কাছে মানুষ আসত তাদের দর্শন ও অনুভূতির ডালি নিয়ে। তিনি তা গ্রহণ করে তৃপ্ত হতেন ও সেই দর্শনের প্রকৃত মূল্যায়ণ করতেন। যমুনার ওপারে অর্থাৎ ভক্তের জগৎ তখন দ্রষ্টার অনুভূতিকে যথার্থ মূল্য দিতে পারতো। গোপিনীরা ক্ষীর সর ননী বিক্রি করে প্রচুর অর্থ পেল যেন। আমি না, হৃদয় মধ্যস্থ নারায়ণ খেয়েছেন—আমি বুদ্ধি (intellect) দিয়ে তোদের এই সব স্বপ্নের ব্যাখ্যা করছি না—ভিতরে ব্যাখ্যা flash করছে। বস্তুত ব্যক্তি জীবনকৃষ্ণ নন, জগৎ চৈতন্য জীবনকৃষ্ণ ঐসব দর্শন গ্রহণ করেছেন। তাই জীবনকৃষ্ণের দেহে সাড়া জাগছে—ব্যাখ্যা flash করছে। একদিন বললেন, একটা বিশেষ স্বপ্ন দেখার পর সমগ্র কথামৃতের ব্যাখ্যা আমার মাথায় flash করেছে। এসব যোগের ব্যাখ্যা জগৎ জানে না—সম্পূর্ণ নূতন। নির্গুণের সাথে যোগযুক্ত না থাকলে যৌগিক ব্যাখ্যা করা যায় না। অনেক সময় তার দেওয়া ব্যাখ্যার সমর্থন আসত দ্রষ্টার পরবর্তী স্বপ্নে বা অন্য কারও স্বপ্নে। দ্রষ্টার স্বপ্ন ভক্তের জগতে মূল্য পেত।

বর্তমান যুগ ঃ—বেদব্যাস—নির্গুণের পূর্ণ প্রকাশের আধার-সমষ্টি চৈতন্য তথা নির্গুণ ব্রহ্ম শ্রীজীবনকৃষ্ণ। যদি কিছু না খেয়ে থাকি—নারায়ণ খেয়েছেন—মানুষের দর্শন অনুভূতি বস্তুত কারও ব্যক্তিগত সম্পদ নয়, সব অনুভূতি সবার জন্য কিছু শিক্ষা বহন করে। তাই তা সকলে মিলে খাওয়া হয়, সকলের মধ্যে দিয়ে সকলের হৃদয় মধ্যস্থ এক অখণ্ড চৈতন্য তথা সমষ্টি চৈতন্য তা গ্রহণ করে।

৮. বাবুর সরকার বলে, এটা আমাদের বাগান, আমাদের খাট, কেদারা। কিন্তু বাবু যখন তাড়িয়ে দেন, তার নিজের আম কাঠের সিন্দুকটা নিয়ে যাবার ক্ষমতা থাকে না।

বাবু—ভগবান। যখন তাড়িয়ে দেন—যখন অহং তাড়িয়ে দেন—তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়—উপলব্ধি হয় সবই বাবুর ঐশ্বর্য, আমার কিছু নয়। এমনকি আমকাঠের সিন্দুক অর্থাৎ ভাগবতী তনুর লীলা প্রদর্শনে যে আত্মিক সম্পদ বা জ্ঞান অর্জন হয়েছিল সে সব কিছুই তার নিজস্ব নয়—সবই বাবুর। তার কৃপা না হলে দর্শন অনুভূতিও হয় না। সাধন করে রত্ন মেলে না।

৯. আত্মিক শক্তি ও জীবনশুদ্ধি ঃ ব্যবহারিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক এই তিন জীবনের মধ্যে মানুষকে যেটা প্রাথমিক ভাবে বেশি প্রভাবিত করে, তা হল ব্যবহারিক জীবন। এই ব্যবহারিক জীবনের দুটি দিক—(ক) বাস্তব জীবন , (খ) আচরণ গত জীবন।

(ক) বাস্তব জীবন ঃ খেয়ে পরে বেঁচে থাকার যে জীবন। সেখানে সে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করে চলে। এর জন্য কেউ শরীরকে কাজে লাগায়, কেউ মস্তিষ্ককে কাজে লাগায়। এখানে কেউ কেউ আবার রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন হয়। কাজের আশানুরূপ ফল না হলে কষ্ট পায়। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা এক এক জনের এক এক রকম। এক্ষেত্রে যাদের সাংস্কৃতিক জীবন (গান বাজনা, সাহিত্যচর্চা, ছবি আঁকা, অভিনয়, খেলাধূলা ইত্যাদি) খুব সমৃদ্ধ তারা কিছুটা ভারমুক্ত থাকে।

(খ) আচরণগত জীবন ঃ মানুষ সামাজিক জীব। তাই সে সমাজবদ্ধভাবে বাস করে। প্রত্যেক মানুষের একটি আচরণগত বৈশিষ্ট্য থাকে। আচরণের দিক দিয়ে এক এক মানুষ এক এক রকম। কখনো কখনো বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা আচরণকে প্রভাবিত করে। স্বার্থপরতা অনেক সময় মার্জিত আচরণের পরিপন্থী হয়। মানুষ বেশির ভাগ সময় নিজের দিকে খেয়াল না রেখেই অন্যের থেকে ভালো আচরণ আশা ক'রে বসে। অন্যের আচরণ কেন আশানুরূপ হল না, তার প্রকৃত কারণ না জেনেই তার সম্বন্ধে একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে এসে যায় ও ভুল হয়। সমাজ, সংস্কার এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নৈতিকতা এবং একটি বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল মানুষের এই আচরণগত জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে। যে সমাজে অস্পৃশ্যতা, ভেদবুদ্ধি প্রকট এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের বাস, তাদের আচরণ অমানবিক হওয়াই স্বাভাবিক। যারা একটি বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলের মধ্যে বড় হয়, সাধারণত তাদের আচরণ মার্জিত ও রুচিশীল হয়।

বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক চর্চা ও তার অনুকূলে গড়ে ওঠা জীবন চর্যা একটি

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...95

কৃষ্টি, যেখানে একের বোধ (ঈশ্বর এক এবং আমরা তাতেই বিধৃত) ধীরে ধীরে পুষ্টিলাভ করে। মানুষের দেহ এবং দেহস্থ চৈতন্য আধ্যাত্মিক চর্চার মূল ভিত্তি। নিজের ও অন্য বহু মানুষের দর্শন অনুভূতির মনন মানুষের আচরণগত জীবনকে মার্জিত ও মানবিক ক'রে এই কৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করে। মানুষের খেয়ে পরে বেঁচে থাকার যে বাস্তব দেহগত জীবন তার সঙ্গে আধ্যাত্মিক জগতের কোন সম্পর্ক নেই।

১০. শাশ্বত ক্ষুধা ঃ প্রাচীন ঋষিগণ বলেছেন, ''আত্মানম্ বিদ্ধি অর্থাৎ নিজেকে জানো।''

এখন কিভাবে নিজেকে জানবো তা আমাদের কাছে পরিস্কার নয়। মানুষ কেবলি নিজে কী, তাই জানাতে ব্যস্ত। নিজে কেউ শিল্পী, কেউ কবি, কেউ সাহিত্যিক, কেউ জ্ঞানী, কেউ পরোপকারী, কেউ রূপবান সুন্দর ইত্যাদি প্রমাণ করতে সদা ব্যস্ত।

সাধারণ ভাবে দেখলে মনে হয় সব প্রাণীর মতো মানুষও যেন সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে জন্মেছে। সকালে উঠে থেকে শুধু চাই চাই চাই। যা চাইছে তা পাওয়ার পরেও সন্তুষ্টি নাই। তার কারণ সে ওটা চাইছেই না। জ্ঞান হওয়ার পর যখন মানুষ বাইরে তাকায়, তখন সে বাইরের সবটা পেতে চায়। আসলে এটি তার ভিতরের চাওয়ার অর্থাৎ নিজেকে জানতে চাওয়ার বিকার দশা। এই নিজেকে জানতে চাওয়াই মানুষের শাশ্বত ক্ষুধা। বাইরের জগতে যেমন বিজ্ঞানীগণ বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য জানতে উন্মুখ, তেমনি আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ প্রাণের রহস্য জানতে উন্মুখ। প্রাণের রহস্য উন্মোচিত হলেই নিজেকে জানা সহজ হবে এবং শাশ্বত ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে। তখন মানুষ উপলব্ধি করবে সে অনন্তশক্তির আধার এবং নিজের বিচ্ছিন্নতা পেরিয়ে মনুষ্যজাতির সঙ্গে আত্মিক একত্ব অনুভবে সকলকে আপনার করে পায়।

১১. সেই ওঁ থেকে ওঁ শিব, ওঁ কৃষ্ণ হয়েছেন। নিমন্ত্রণে কর্তা একটি ছোট ছেলে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তার কত আদর। কেননা সে অমুকের দৌহিত্র বা পৌত্র।

দাদু বা ঠাকুরদা—নির্গুণ ব্রহ্ম। পিতা বা মাতা—নাদ-ওঙ্কার ধ্বনি। দৌহিত্র বা পৌত্র—শিব, কালী, রাম, কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, যীশু ইত্যাদি চিন্ময় রূপ।

এ যুগে দৌহিত্র বা পৌত্র হল—নির্গুণ ব্রহ্ম জীবনকৃষ্ণের চিন্ময় রূপ।

১২. একত্ব লাভে বংশগতির ভূমিকা ঃ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, পূর্বজন্মে কিছু করা চাই। আবার কোথাও বলেছেন, কাঁচে কালি মাখানো না থাকলে ছবি পড়ে না। শ্রী জীবনকৃষ্ণ বললেন, এর মানে হ'ল কিছু সংস্কার থাকা চাই। পূর্বজন্ম মানে বংশগত ভাবে পূর্বপুরুষ থেকে আগত। অর্থাৎ ঈশ্বরীয় দর্শন ও অনুভূতি লাভের জন্য বংশগতির ধারায় কিছু ঈশ্বরীয় সংস্কার পেতে হবে। তাহলে বোঝা গেল ভালো বংশে জন্মালে তবেই ঈশ্বর দর্শন হবে।

বস্তুতত্ত্বে ব্যষ্টির সাধনের ক্ষেত্রে কথাটি প্রযোজ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, মানব জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান দর্শন, ভগবান লাভ। কিন্তু শ্রীজীবনকৃষ্ণ তা বদলে দিয়ে বললেন, ঈশ্বর দর্শন নয়, একত্ব লাভই মানব জীবনের উদ্দেশ্য আর এই একত্ব হল মানুষের জন্মগত অধিকার। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষ তার চিন্ময়রূপ অন্তরে দেখে প্রমাণ দিল সে কথার। তাঁকে দেখার জন্য ভালো বংশে জন্মাতে হবে বা ঈশ্বরীয় সংস্কার থাকতে হবে তা নয়। তিনি সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ফুটে উঠছেন, তার জন্য তাদের কোন ঈশ্বরীয় সংস্কারের প্রয়োজন থাকছে না। কারণ তিনি দ্রষ্টাদের ব্যক্তিগত সংস্কার ধ্বংস করে নিজের গুণ, cult of his own দান করছেন ও সকলকে নিজের বংশের তথা নিজের সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত করে নিচ্ছেন ধীরে ধীরে। কিন্তু তাঁকে দেখার পর নিজের ব্যক্তিগত ধর্মীয় সংস্কার নাশ ও তাঁর সংস্কার লাভ করার ইচ্ছাটুকু বজায় রাখতে হবে দীর্ঘ সময় ধরে। সেটি সম্ভব হলে বলা যাবে আমরা সকলে একই বংশের লোক।

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। একজন জমিদার একটি এলাকার বিশাল জমির মালিক। তিনি সেই এলাকার সমস্ত মানুষকে তার জমি চাষ করা ও ফসল নেওয়ার অধিকার দিয়েছেন। এখন মানুষকে সেই সুযোগটুকু নেওয়ার কার্যকরী ইচ্ছা তো প্রকাশ করতে হবে। সমষ্টি চৈতন্যের বিকাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বহু মানুষ এই অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছেন। নিরন্তর অনুশীলন ও অনুভূতি তাদেরকে এক বংশের অন্তর্ভুক্ত করছে। ফলে বহুত্বে একত্ব প্রতিষ্ঠার পথে মানুষের ব্যক্তিগত সংস্কার আজ আর কোন বাধা নয়।

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...97

স্মৃতিচারণ

স্মৃতিচারণ

শ্রী জীবনকৃষ্ণের পুতঃসঙ্গ লাভে ধন্য কিছু মানুষের টুকরো কিছু স্মৃতিকথা এখানে উল্লেখ করা হলো।

আনন্দ মোহন ঘোষ

আমার বাবার মৃত্যুর পর জীবনকৃষ্ণের চরিত্রের একটি বিশেষ দিক আমাকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল। বাবা গত হওয়ার সংবাদটা তিনি কিভাবে পেয়ে গেছিলেন। পরদিন রামকৃষ্ণদাকে আমার বাড়ি পাঠিয়ে ছিলেন। বলে দিয়েছিলেন, 'বলবি আসতে বলেছি। যদি না আসতে চায় জোর করে নিয়ে আসবি।' আমার তো অশৌচের সংস্কার যায়নি। তাঁর ডাকে অশৌচের বেশেই ঘরে প্রবেশ করলাম। ওই পোশাকে তার কাছে না গিয়ে একটু দূরে মেঝেতে বসতে গেলাম। উনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, ওখানে কেন বাবা? এক্কেবারে খাটে উঠে আয়। আমার পাশে বস। ওনার কথামত খাটে উঠে বসলাম। বসার পর উনি আমার কাঁধে পিঠে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, ''তোর বাবা গত হয়েছেন, আমি খবর পেয়েই রামকেষ্টকে পাঠালাম। তা ভদ্রলোকের বয়স কত হয়েছিলো?'' বললাম, ৮৮ বছর। ''খুব দীর্ঘায়ু হয়েছিলেন তো তোর বাবা!'' তারপর বললেন, ''বাড়িতে বেশি থাকবি না। এখন তো ছুটি নিয়েছিস, বাড়িতে থাকলেই মন খারাপ হবে, এখানে চলে আসবি।'' এইসব কথাবার্তায় ঘরে পাঠ সাময়িক বন্ধ ছিলো। কিছুক্ষণ পর পাঠককে বললেন, ''নে এবার পড়।'' চেঁচিয়ে পড়, যেন গলির মুখ থেকে শোনা যায়।'' কিছুক্ষণ পাঠের পর আমার উদ্দেশ্যে বললেন, ''আমায় এক গ্লাস জল দে তো বাবা।'' ইতস্ততঃ করছিলাম। মনে চিন্তা, এই অশৌচ অবস্থায় ওকে জল দেবো? ঘরের দক্ষিণ দেওয়ালের তাকে জলের কুঁজো থাকে। কুঁজোর কাছে একজন বসেছিলেন। বললেন, ''আমি দিচ্ছি।'' উনি বললেন, ''না। আনন্দ, বাবা বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, তুই দে।'' জল দিলাম। উনি সেই জল পান করে 'আঃ' শব্দে পরিতৃপ্তির আওয়াজ তুললেন। গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, ''তুই ভেবেছিলি বোধহয় তোর অশৌচ অবস্থায় জল কেমন করে খাব?''

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...99

সর্ব সংস্কার মুক্ত জীবনকৃষ্ণ সেদিন কৃপা করে আমার অশৌচের সংস্কার দূর করে দিয়েছিলেন।

খগেন্দ্রনাথ ঘোষ

একদিন জীবনকৃষ্ণকে একলা পেয়ে বললাম, "সর্বদা আপনার কথা ভাবি, তা জানেন, ঘুমাতে যাচ্ছি, এই তন্দ্রা এসেছে, একদিন দেখছি আপনার মুখখানা। কেবল সমস্ত মুখখানা, আর কিছু না। উজ্জ্বল চোখ মুখ নিয়ে আমার মুখের কাছে মুখ আনলেন, যেন চুমু খাবেন। বেশিক্ষণ নয়, পলকের জন্য। এইরকম প্রায়ই হচ্ছে। ঘুম আসতে চায় না। পা কেঁপে ওঠে আর ওইরূপ দর্শন হয়। ঘুম ভেঙ্গে যায়। এরূপ কেন হয় বলুন তো?" উনি শুনে বললেন, "ওই যে তুই ১৫/১৬ বছর বয়সে দেখেছিলি : মা কালী খাড়া দিয়ে তোর দেহ কটি দেশ থেকে কেটে দু খণ্ড করে দিলেন, নিম্নাঙ্গ দূরে পড়ে, মা কালী কাছে দাঁড়িয়ে, এ তারই ফল। তোদের ঊর্ধাঙ্গের সাধন হবে। নিম্নাঙ্গের হবে না। তাই দেহটা বাদ দিয়ে কেবল মাথা দেখিস। ঠিক ঠিক হলে এসবের ফল দেহেতে বর্তায়। তবে বাবা, সময়ের দরকার হয়। আবার দেহ ব্যাপারে সব কিছু যে স্থির তাও নয়। সত্যি রে বাবা, এ শারীর বিদ্যা। 'ঠাকুর ঠাকুর' করে তাই দিন কাটাতে হয়। ঠাকুর বলতেন, 'মা একটা দিন চলে গেল!' আহা! এই জীবনেই একটা দিন কতই না মূল্যবান। এই জীবনেই সব বাবা। যা পারো, এই জীবনেই করে নাও। বহু সংস্কারের ফলে এই মনুষ্য জীবন পেয়েছিনু, তাই তো তাঁকে দেখলুম! আহা!"

অনাথনাথ মণ্ডল

ইংরাজী সাহিত্যে পান (Pun) বলে একটি অলংকারের প্রয়োগ আছে। এখানে দুই বা তার বেশি শব্দের উচ্চারণ একই কিন্তু অর্থ আলাদা। শেক্সপীয়ার তার অনেক লেখায় এর সুচারু প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

জীবনকৃষ্ণের কাছে একদিন আমরা এরূপ সুন্দর একটি পানের কথা শুনেছিলাম। ধীরেনদা তাঁর চিঠির উপরে 'ত্বং জাত ভবসি বিশ্বতোমুখো' কথাটি লিখেছিলেন। চিঠির শেষের দিকে লিখেছিলেন, "Your soul is the inner self of all things." এটা শুনে জীবনকৃষ্ণ বললেন, "রাধাকৃষ্ণণের এই ইংরাজী অনুবাদটি ভুল। তাহলে কি হওয়া উচিত? আরে এটা বুঝতে পারছিস না? বেদের এই ত্বং কোনটাকে বলছে, তোরাই বা কি দেখছিস? তাহলে ইংলিশ ট্রান্সলেশনটা এই রকম হবে, "Your living form made with god's light is the inner self of all beings" তা ছাড়া Soul বললে কোনো অর্থ হয় না। আচ্ছা, তোদের অভেদানন্দের জীবনের একটা ঘটনা বলি শোন। অভেদানন্দ যখন আমেরিকায় তখন তার আশ্রমের কয়েকটা বাড়ির পরে এক জুতোর দোকান ছিলো। ওই দোকানে কিভাবে আগুন লেগে যায়। আগুন নিভে যাওয়ার পর অভেদানন্দ দেখতে গেছেন। সেখানে একজন লোক দুঃখ করে অভেদানন্দকে বললেন, নট এ সিঙ্গেল সোল ইজ শেভড (not a single soul (sole) is saved) তাই হয়েছে রাধাকৃষ্ণণের Soul এর অর্থ। ঘরে হাসির রোল উঠলো।

বিনয় কুমার মুখোপাধ্যায়

কমিউনিষ্টরা মানুষের সাম্যের কথা বলে। তাদের মত হলো কেউ ছোট কেউ বড়, এটা ভাবা ঠিক নয়, সকলের সমান অধিকার এই পৃথিবীতে। কিন্তু বাইরের জগতে মানুষের মেধা এবং সম্পদের এতই বৈচিত্র্য যে সব মানুষকে এক ভাবা কঠিন হয়ে যায়। মেধার পার্থক্যের জন্যই ধর্ম জগতেও গুরুবাদ এবং Hero worship চলে এসেছে যুগ যুগ ধরে। শ্রী জীবনকৃষ্ণ ঘরে আলোচনা কালে বিভিন্ন প্রসঙ্গে কমিউনিষ্টদের কথা বলতেন। আমরা বুঝেছিলাম কমিউনিজমের কথা আত্মিক জগতে সত্য।

একদিন বেহালার সত্য একটি স্বপ্ন বললো। সে দেখেছে, দেশে গিয়ে সে তার বাবাকে বলছে, "সকলেই ব্রহ্ম।" জীবনকৃষ্ণ এই স্বপ্নের কথা শুনে বললেন, "সবাই যে ব্রহ্ম, একথা সত্য। স্বধামে গিয়ে তার বাবাকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বললো।"

"স্বপ্ন কি অদ্ভুত জিনিস" জাহাঙ্গীরের বন্ধু, সে বোম্বেতে থাকে। সে সেখান থেকে আমাকে স্বপ্নে দেখে চিঠি দিয়ে তার অর্থ জানতে চেয়েছিলো। আমি তো সেই চিঠিখানা পেয়ে ভাবলাম, কখন কত তাড়াতাড়ি করে চিঠিখানার জবাব দিয়ে ফেলি। ভাবছি দিলীপ ঘোষ এলেই তাকে দিয়ে একটা জবাব ঠিক করে লিখে পাঠাবো। তা সেদিন দিলীপ আর এলো না। তার পরদিন আমার ওই ভাবটা একটু কমে গেলো। কদিন পর ভাবলাম; যে তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছে, সেই ওকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়ে দেবে। এখন আমার কলাটা! তা দু মাস পরে সে নিজেই ওর স্বপ্নের ব্যাখ্যা পেয়েছে। দ্বিতীয় স্বপ্নে দেখছে, "আমি ওর কাছে গিয়ে ওর স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিচ্ছি।" এই কথা বলার

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...101

পরেই বললেন, ‘‘এখন তোরা বল দেখি এর চেয়ে বড় কমিউনিজম আর কি থাকতে পারে? আর এটা যদি জগৎব্যাপী হয়, তবেই শান্তি। তা না হলে মানুষের মধ্যে যে সব গণ্ডগোল, তা মিটতে পারে না।

সেদিন কমিউনিজমের একটা নতুন সংজ্ঞা পেলাম এবং বুঝলাম এটাই একমাত্র বিশ্বে শান্তি নিয়ে আসতে পারে, বাইরের কমিউনিজম নয়।

দিলীপ কুমার ঘোষ

১৯৫৮ সালের ৪ঠা জুনের পর আমরা সকলেই জীবনকৃষ্ণের কথা এবং আচরণের মধ্যে বিশেষ এক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলাম। সেই সময়কার একদিনের ঘটনা মনে পড়ছে।

ঘরে সেদিন পাঠ শেষে কথামৃত প্রণামের পর জীবনকৃষ্ণ সকলের প্রতি জোর গলায় বললেন, ‘‘কেউ প্রণাম করবি না, খবরদার! প্রণাম লোকে কেন করে শুনবি? সাইকো-এনালাইসিস কর। এক-আমি স্বীকার করছি, আমি ছোট তুমি বড়। এতে করে হয় কি, উভয়েরই ক্ষতি হয়। দুই—I envy you. Envy-এর দুটি লক্ষণ—নতি স্বীকার করা আর রিভোল্ট (Revolt)। রিভেল্ট করা বরং ভালো, কিন্তু নতি স্বীকার করা মোটেই ভালো নয়।’’ শেষে বললেন, ‘‘তোরা আসবি, পাঠ শুনবি, চলে যাবি—প্রণামের প্রয়োজন নাই। করবি না।’’ ভিড় যখন খুব পাতলা হয়ে গেল তখন আনন্দকে প্রণাম করতে উদ্যত দেখে জীবনকৃষ্ণ ভ্রূকুটি করে বলে উঠলেন, ‘‘এই দ্যাখ আনন্দ!’’ রামকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে বললো, ‘‘ওতে তো আমাদের আনন্দ আছে।’’ জীবনকৃষ্ণ একথা শুনে বললেন, ‘‘এহে হে! তোরা একি বলছিস! এতদিন তা হলে কি শুনলি? প্রণাম করলে নিজের ক্ষতি হয়, আবার যাকে প্রণাম করিস তারও ক্ষতি। এখানে কাকে আর প্রণাম করবি? আমরা তো সব এক। যা বাড়ি যা।’’

এইসব কথাবার্তা চলছে, এমন সময় দেখা গেল—বাইরের বারান্দায় তিন নম্বর জিতেনদা সাষ্টাঙ্গ দিচ্ছেন। জীবনকৃষ্ণ এটা দেখেই তৎক্ষণাৎ চিৎকার করে বলে উঠলেন, ‘‘ওরে কে আছিস? তাড়া, ওকে তাড়া—’’—বলেই বালকের মত হো হো করে হেসে উঠলেন। আমরাও তখন আর না হেসে থাকতে পারলাম না। উনি এরপর মিনতি ভরা কণ্ঠে বললেন, ‘‘ও বাবা জিতু, যা বাবা, বাড়ি যা।’’ নতুন এক অভিজ্ঞতা নিয়ে সেদিন বাড়ী ফিরে এসেছিলাম।

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...103

মানিক ৭৫ সংখ্যা

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...105

ভূমিকা

বহু যুগ ধরে মানুষ ভেবে এসেছে ঈশ্বরের স্বরূপ কি, মুক্তি কি ইত্যাদি নিয়ে। কোন আচার্য এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেন নি। তারা বর্তমান ছেড়ে অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে উত্তর খুঁজতে গিয়ে কল্পনায় হারিয়ে গেছেন। গান গেয়েছেন, ''কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই.....।'' কেউ বলেছেন মরে গিয়ে মুক্তির কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রশ্নটাকে সুনির্দিষ্ট করলেন। বললেন, আমি কে আর আমার সামনে এই যে মনুষ্যজাতি এদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? ছোকরাদের এই দুটি প্রশ্নের উত্তর জানলেই হয়ে যাবে। এই দুটি প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর পাওয়া গেল শ্রীজীবনকৃষ্ণের জীবনে।

তিনি সাধনের নানান ধাপে বিচিত্র অনুভূতি লাভ করে শেষে উপলব্ধি করলেন যে আত্মিকে তিনি একাই আছেন—''অহমস্মি।'' দ্বিতীয় কেউ নেই। ''একমেব অদ্বিতীয়ম।'' তিনিই অখণ্ড চৈতন্য তথা ঈশ্বর।

বহুযুগ থেকে চলে আসা—''আমি কে?'' এই চিরন্তন প্রশ্নের সমাধান হল। এরপরের আত্মিক অবস্থায় তিনি দেখলেন জগতের বহু মানুষ তাঁকে স্বপ্নে, ধ্যানে ও জাগ্রতে দর্শন করে সেকথা তাকে জানাচ্ছে। শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, হ্যাঁ, আপনারা আর আমি আত্মিকে এক—এই সত্য ঘোষণা করছে আপনাদের দর্শনগুলি। তিনি বুঝলেন, এখন জগতের এই মানুষগুলিরও অস্তিত্ব রয়েছে আত্মিক জগতে। যেহেতু দর্শন সাপেক্ষে তারা আধ্যাত্মিক চিন্তা করতে পারছে। তবে তাঁরই অনুমাত্র আত্মিক সত্তা লাভ করেছে তারা। বস্তুত পৃথক Identity তাদের নেই। তাঁর Brain faculty হয়েছে। আত্মিকে নতুন কিছু সৃষ্টির ক্ষমতা জেগেছে তার। আর বাকীরা তার অণু পরিমাণ সত্তা পাওয়ায় তাদের Brain capacity (power) জেগেছে। তারা তাঁর ব্রহ্মত্বের মহিমা তথা আত্মিক বিকাশ অনুধাবনে সমর্থ হচ্ছে। তিনি আর এই মনুষ্যজাতি বস্তুত আত্মিকে একই সত্তা। এই বোধেই চিরন্তন প্রশ্নের সমাধান হল।

কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে তার কাছে এই সব প্রশ্নের সমাধান হলেও জগতের মানুষের কাছে এই প্রশ্নের ধরণটা একটু অন্যরকম। যেহেতু তিনি ঈশ্বর হয়ে গেছেন তাই সাধারণ মানুষকে জানতে হবে ঐ মানবব্রহ্মের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কি? এবং জগতের অপর মানুষদের সঙ্গেই বা তাদের সম্পর্ক কি? এই দুই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা ও তা উপলব্ধির প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যুগ যুগ ধরে। তাই এক অর্থে এটাও eternal problem।

একটি উপমা দিয়ে বিষয়টি বলা যেতে পারে। শ্রীজীবনকৃষ্ণ যেন আমগাছ হয়ে উঠলেন। তার সাধনবৃক্ষ তথা অমৃতবৃক্ষ পূর্ণ পরিণত হল, তাতে প্রচুর আম ধরল। উনি যখন নিজের মধ্যে নির্গুণে লয় হয়ে গেলেন, তখন আমগাছের একেবারে উপরে উঠে গিয়ে দেখছেন যে তিনি একাই আছেন, অর্থাৎ আম গাছটাই আছে। পরে অবস্থার পরিবর্তন হলে, নিচে নেমে দেখলেন যে তার গাছে প্রচুর আম ধরে রয়েছে। এক একটি মানুষের ভিতর তারই এক একটি আম। মনুষ্যজাতির মধ্যে তাঁরই ব্রহ্মত্ব রয়েছে, তাঁরই চিন্ময় রূপে তার প্রকাশ ঘটছে। তাই জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বহু মানুষ তাঁকে নানা ভাবে স্বপ্নে, ধ্যানে, এমনকি জাগ্রত অবস্থায় দর্শন করছে।

এখন আমগুলিকে অর্থাৎ মানুষগুলিকে উপলব্ধি করতে হবে যে আমগাছরূপী জীবনকৃষ্ণ ও তারা এক—একীভূত সত্তা। আমগাছই নিত্য। আমগাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে আমের সত্তা পুষ্টিলাভ করবে না। তারপর জানতে হবে আমগুলির (মানুষগুলির) পরস্পরের ভিতর সম্পর্ক। তারা সকলেই আম। এক ব্রহ্মের কণা কণা ব্রহ্মত্বের আধার। পরস্পরের দর্শন অনুভূতি শুনে তাদের আত্মিক অভিন্ন সত্তা জেনে নিজেদের মধ্যে আচরণগত ব্যবহারিক জীবনে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটবে, জেগে উঠবে একত্বের কৃষ্টি।

বর্তমান পত্রিকায় সংকলিত সাধারণ মানুষের কিছু দর্শন অনুভূতি এই সত্যকে বুঝতে সাহায্য করবে সচেতন ও মননশীল পাঠকদের।

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮
চারুপল্লী, বোলপুর

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...107

স্বপন মাধুরী

জীবন্ত জিজ্ঞাসা

● দেখছি (21.01.21)—একটা অনেক বড়ো সাইজের ডিম। তার থেকে ছোট রামকৃষ্ণ বেরোল। আবার একটু পর ঐ ছোট রামকৃষ্ণের ভিতর থেকে ছোট্ট জীবনকৃষ্ণ বেরোল। পরে ঐ জীবনকৃষ্ণের দেহ থেকে একটা জীবন্ত জিজ্ঞাসা চিহ্ন বেরিয়ে এলো। ....খুব অবাক হলাম। ঘুম ভাঙলো।

---স্বর্ণদেব চট্টোপাধ্যায়
বেলঘরিয়া

ব্যাখ্যা---

বাইবেলে আছে— জগৎ সৃষ্টির পূর্বে একটা বড়ো ডিম ছিল (an egg of chaos)। তার উপর একটা পায়রা (dove, the holy spirit) বসে তা দিচ্ছিল। তারপর সেই ডিম ফুটে জগৎ বেরিয়ে এলো।

এখানে দেখাচ্ছে, ডিম—অজানা জগৎ—ভগবানকে নিয়ে নানা কাল্পনিক চিন্তার জগৎ। কল্পনা ছেড়ে প্রথম সত্য দর্শন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তার মধ্যে আত্মিক জগৎ বিশেষ রূপ পেল। পরবর্তী কালে তা স্পষ্টতর হল শ্রীজীবনকৃষ্ণের মধ্যে। এই আত্মিক জগৎকে জানতে গেলে অন্তরে আত্মজিজ্ঞাসা মূর্ত হয়ে উঠতে হবে। ''অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।'' শ্রী জীবনকৃষ্ণ মানুষের অন্তরে প্রকাশ পেয়ে এই জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলছেন।

● দেখছি (5.02.21)—আমার ছোট দিদির বিয়ে হচ্ছে। আমি তাকে সুন্দর করে সাজিয়েছি। সেই ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে—বর এসেছে। জানলা দিয়ে দেখছি বরযাত্রীরা এসেছে। বরকে দেখছি ধুতি পাঞ্জাবী ও টোপর পরে আছে। কিন্তু মুখ হাত পা অদৃশ্য (invisible)। ভীষণ অবাক হলাম।

---প্রার্থিতা ঘোষ
বেলঘরিয়া

ব্যাখ্যা---

অদৃশ্য বর—নিরঞ্জন-নির্গুণের ঘনমূর্তি—সমষ্টি চৈতন্য। নির্গুণের সঙ্গে যোগে সাধারণ মানুষেরও ধর্ম শুরু হচ্ছে।

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...109

হীরের মধ্যে সমুদ্র

● দেখছি (7.03.2021)—জয়ের বিয়েতে গেছি। রাত্রিবেলা কিন্তু দিনের মতো আলো। আমরা পাঠের সকলে গেছি। বিরাট বড় বাড়ি। সকলকে আলাদা আলাদা রুম দিয়েছে থাকার জন্য। বিয়ের অনুষ্ঠান হয়ে গেছে আগেই। কিন্তু সেই দৃশ্যটাও যেন দেখতে পেলাম। ডাকাত পড়ার সম্ভাবনা আছে। তাই জয় নিজে বিয়ে বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। একটা এ্যাটাচী রেখেছে। মনে হচ্ছে ওতে প্রচুর মূল্যবান বস্তু আছে। ডাকাতরা ভুল করে ওটা নিয়ে যাবে ও ঠকবে। এই রকম পরিকল্পনা। কিন্তু ডাকাত পড়ল না। পরদিন জয় আমাকে বলল, আমার ঘরটা ঝাঁট দিয়ে দাও। একটা ঝাঁটাও দিল। আর দু'হাত ভর্তি কালো কলাই দিল। গোটা কলাই ওগুলো। বললাম, কী করে ঝাঁট দেব? ও বলল, কলাইগুলো ঘরের মেঝেতে ফেলে ঝাঁট দিতে হবে। আমি ঝাঁট দিতে যাব এমন সময় অনুস্কা নামে একটি বাচ্চা মেয়ে ঐ ঘরে ঢুকে কথা বলতে লাগল আমার সাথে। ...ঘুম ভাঙল।

---মণি দেবনাথ
সখের বাজার

ব্যাখ্যা---জয়ের বিরাট ঘর—সমষ্টিচৈতন্যের ঘর, নির্গুণের ঘর। কলাই ফেলে ঝাঁট—শ্রী জীবনকৃষ্ণের অমৃতবাণী ও সাধারণের দর্শন-অনুভূতি পাঠচক্রে আলোচনার টেবিলে ফেলে মর্মার্থ উদ্ধার। এতে সমষ্টি চেতনার ধারণা স্পষ্ট হবে। অনুস্কা—অনুচৈতন্য।

● দেখছি (26.02.2021)—সমুদ্রের ভিতর থেকে একটা Diamond (হীরা) পাওয়া গেছে। দাদা ও জয়দা পাশে আছে। ওদেরকে ওটা দেখাচ্ছি। মনে হচ্ছে জয়দা ভারতীয় নয়, যেন ইহুদী। হীরেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছি। ওর ভিতর আর একটা সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। সেটাতেও ঢেউ উঠছে, সেটাও অনন্ত।...

---সোহিত্রী সেন
সোদপুর

ব্যাখ্যা---সমুদ্র—নির্গুণ ব্রহ্ম। হীরের মধ্যে সমুদ্র—অসীম নির্গুণ যে দেহে ঘনীভূত হয়ে ধরা পড়েছে। ইহুদী—"ইয়াহুদা" শব্দ থেকে এসেছে—ইহুদী ধর্মীয় জাতির স্রষ্টা---ইয়াকুবের পুত্র---সমষ্টিচৈতন্য। দাদা (দীপ)---জগৎচৈতন্য।

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...111

চালতা পাতা

● দেখছি—আমফান হয়ে গেছে। জল একটু একটু করে নামছে। এখন হাঁটুজল। আমি হাঁটছি। জলের ভিতর দুটি হাঁড়ি পেলাম। সে দুটো নিয়ে একটা বাড়িতে গেলাম। বাড়ির লোকদের খুব আপন মনে হচ্ছে কিন্তু চেনা মুখ নয়। ওরা বলল, ছোট হাঁড়িটা ওদের। আমি দুটোই দিয়ে দিলাম। বললাম, যদি কারও দরকার হয় তাকে দিয়ে দিও।

ওখান থেকে বেরিয়ে বড় একটা মাঠে এলাম। পাশে বন। বনের সরু পথ ধরে হাঁটছি। দেখি এক ভদ্রলোক বয়স্ক, মাথায় ছোট ছোট চুল, খালি গা, ধুতি পরে উবুড় হয়ে বসে কী যেন দেখছে। আমি ওনার দিকে এগিয়ে গেলাম। উনি চালতা পাতার মত একটা পাতা দেখিয়ে বললেন, এর রস খেলে এলার্জি ভালো হয়ে যায়। পাতাটা খুব সুন্দর দেখতে। আমার এলার্জি আছে। তাই ওকথা শুনে খুব আনন্দ হল। পরে মনোজের সঙ্গে দেখা হলো। ওকে বললাম, এলার্জির জন্য কত খাবার খেতে পাই না। এবার সব খাব। কী আনন্দ!

হঠাৎ দেখি ডানহাতের মাঝের আঙুল (মধ্যমা) থেকে পুঁজ রক্তের মতো কিছু বেরোচ্ছে। হাত ঝাড়া দিলাম। অমনি পাতলা পলিথিনে ভরা কিছু বেরিয়ে এসে মেঝেতে পড়ল। পলিথিন ছিঁড়ে দেখি অপরূপ সুন্দরী এক শিশুকন্যা। সদ্যোজাত হলেও দেখে মনে হচ্ছে পরিণত মুখ। তার চোখ দুটি ছবির চেয়েও সুন্দর। আমি চিৎকার করে বলছি, তোমরা একে নাও, তোমরা একে নাও। ....স্বপ্ন ভাঙলে বুঝলাম স্বপ্নদৃষ্ট বৃদ্ধ মানুষটি স্বয়ং জীবনকৃষ্ণ।

---মণিকা কর্মকার
বেলঘরিয়া

ব্যাখ্যা---

সদ্যোজাত শিশুকন্যা—দ্রষ্টার অনুচৈতন্য। অপরূপ সুন্দর চোখ—যোগের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি লাভ হয়েছে। পরিণত মুখ—দ্রষ্টা আত্মিক জ্ঞানের কথা বুঝতে সমর্থ। এলার্জি—ভবরোগ। সব খেতে পাব—যোগের দৃষ্টিতে সব কিছু দেখবো ও উপভোগ করব। চালতা পাতা—আত্মিক একত্ব অভিমুখী দর্শন অনুভূতি যা মানুষকে ক্রমাগত এগিয়ে চলার রসদ যোগায়। শ্রীজীবনকৃষ্ণ প্রদর্শিত ধারায় সূক্ষ্ম মনের সাহায্যে (মনোজ) দর্শন অনুভূতির মননে ক্ষুদ্র 'আমি'র নাশ ও বহুত্বে একত্বের উপলব্ধিতে প্রকৃত শান্তি লাভ হয়।

আজহার

● দেখছি (25.12.2020) দিলীপ বাবু (ঘোষ) ও আমি পাশাপাশি শুয়ে আছি। ওনার গায়ের সাদা পাঞ্জাবীর ঔজ্জ্বল্য দেখে আমি অবাক হচ্ছি। পরক্ষণে দেখি উনি আমাদের অধ্যাপক গোপালদা হয়ে গেলেন (যিনি বর্তমানে মৃত)। গোপালদা বললেন, তুমি চাকরীর জন্য "How to face interview" বইটা পড়। আজহারউদ্দিনের লেখা। দারুণ বই। ওটা পড়লে চাকরী পেতে কোনো অসুবিধা হবে না। ভাবছি এই বয়সে আবার চাকরীর জন্য পড়াশুনা করবো?....ভাবতে ভাবতেই ঘুম ভাঙলো।

---স্নেহময় গাঙ্গুলী
চারুপল্লী

ব্যাখ্যা---দিলীপ---সূর্য---ব্যষ্টিচৈতন্য। গোপাল---জগৎপালক, জগৎচৈতন্য। আজহারউদ্দিন---(১) যে সত্য ধর্মকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারে ও তা প্রচার করতে পারে---সমষ্টিচৈতন্য।

(২) আজাহার--- আজকের আহার---প্রতিদিন নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে জীবনকৃষ্ণের যেসব কথা ও দর্শন-অনুভূতি আলোচনা হচ্ছে, তা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে (আহার করতে হবে) চর্চা করে। তবেই ধর্ম চর্চায় কোন ভূমিকা পালন করা যাবে (চাকরী হবে)।

● দেখছি (20.12.2020)---আমার স্কুটিটা চুরি হয়ে গেছে। একটা বনে ঢোকার মুখে আছি। ওখানে একটা বিশেষ জায়গায় দাঁড়ালে কোন শব্দ শুনতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সামান্য এদিক ওদিক হলেই, টলে গেলেই অনেক আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। এক মুহূর্তকাল দাঁড়াতে পারছি ওখানে, পরক্ষণেই টলে পড়ে যাচ্ছি। সরে যাচ্ছি ঐ বিন্দু থেকে।

---বরুণ ব্যানার্জী
বোলপুর

ব্যাখ্যা---বন-দেহ। অন্তর্জগতে যখন একত্ব লাভ হচ্ছে নির্গুণের সাথে তখন ঠিক ঠিক সাম্যগুণযুক্ত অবস্থা (equilibrium condition) হয় ব্রেনের। স্কুটি চুরি হয়ে গেছে---ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (আত্মিকে) হারিয়ে গেছে, ক্ষুদ্র আমি নাশ হয়েছে।।

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...113

ছায়া

● দেখছি (25.04.21)---তরুণদা, স্নেহময়দা ও আমি আছি। তরুণদা বলছে, এত বছর পড়াশোনা করছি আমার কী হলো? তখন স্নেহময়দা বললো, সূর্যের সামনে দাঁড়াও। ঐ দেখ তোমার ছায়া পড়ছে। তোমার প্রচুর হয়েছে।.....

---প্রশান্ত রুজ
বোলপুর

ব্যাখ্যা---

সূর্য-সমষ্টিচৈতন্য। সমষ্টিচৈতন্যের অনুচৈতন্য লাভ হওয়ায় সাধারণ মানুষেরও ঈশ্বর বস্তুর এক কণা লাভ হচ্ছে---এই স্বপ্নে দ্রষ্টার ছায়া সেই বস্তুলাভের কথারই প্রমাণ দিচ্ছে।

● দেখছি (মার্চ ,2021)---মা মাছ রান্না করছে। আমাকে মাছ কাটতে বললেন। একজন মাটির কলসী তৈরী করেন। তিনি মাছ এনে দিয়েছেন। আমি বললাম, এই মাছ আমি খাব না। মাছটা অন্যরকম দেখতে। আমি মাছটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। মাছটা দু'খান হয়ে গেল। তখন দেখছি স্নেহময় কাকু আমাকে এক বাটি (সাদা বাটি) দই দিলেন।

---সঞ্চিতা চ্যাটার্জী
বোলপুর

ব্যাখ্যা---

মা-দেহ। মাছ রান্না---সংসারসুখ বা দেহ সুখের আয়োজনে ব্যস্ত। মাটির কলসী---স্থূল দেহ। যারা স্থূল দেহসুখ নিয়ে থাকেন তারাই ভোগের বস্তু সরবরাহ করেন। দ্রষ্টা পাঠে যুক্ত হয়ে ভোগের বস্তু সনাক্ত করতে পারছেন এবং আসক্তিশূন্য হতে পারছেন। তাই মাছ ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। মাছ দু'খান হল---বিশ্লেষণ করা গেল। স্নেহময় কাকু---সমষ্টি চৈতন্যের প্রতীক। দই দিলেন---দেহকে সাম্যগুণযুক্ত করে একত্বলাভের উপযোগী করে দিলেন।

পূরবী রাগে

● দেখছি (28.11.2021)—পূরবীদি পুরোন ফ্যাক্টরীটাকে নতুন স্থানে আধুনিক ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। উনি ফ্যাক্টরীর মালিক। আমি সেখানে জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে নিযুক্ত হয়েছি। পূরবীদি এই নতুন ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা হওয়ার খুশিতে একটি বৈকালিক চা চক্রের আয়োজন করেছেন। সেখানে আমি ও কারখানার বেশ কিছু বিশিষ্ট মানুষ নিমন্ত্রিত।

চা পরিবেশন কালে আমি দেখলাম আমার পাত্রে খুব সামান্য লিকার চা দেওয়া হয়েছে। মানে প্রায় না থাকার মতো। তা দেখে আমি যখন বিচলিত বোধ করছি, তখন পূরবীদি ব্যাপারটা দেখার জন্য এলেন। আর সেই সময় আমি দেখলাম আমার পাত্র খুব সুন্দর ফ্লেভারযুক্ত লিকার চায়ে আপনা হতে ভরে উঠল। বিস্ময়ে ঘুম ভাঙল।

---তন্ময় নাথ
শীলপাড়া, বেহালা

ব্যাখ্যা---

পূরবী—সন্ধ্যার রাগ, চৈতন্যের পরিণত রূপ—সমষ্টিচৈতন্য। মানুষের আত্মিক প্রাপ্তি এ পর্যন্ত যা ছিল তলানিতে তাঁর প্রভাবে তা এবার জীবনপাত্র পূর্ণ করে প্রকাশ পাবে। কারখানা— মানুষ তৈরির কারখানা। জেনারেল ম্যানেজার—যিনি data analysis করেন। তার এই ক্ষমতা বাড়ছে। লিকার চা—যা মনোযোগ বাড়ায় ও brain function improve করে। বিশিষ্ট মানুষ—Good cells of brain.

● দেখছি (4.12.20)— একজন পড়াচ্ছেন। পাশে বড় screen ঝুলছে। অ,আ, ইত্যাদি লেখা ঝুলছে। তার মধ্যে ''লি''-টা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ...পরের দৃশ্যে দেখছি, একটা ট্রেন। ঘনিষ্ঠ অনেকে রয়েছে। খুব ভীড়। সবাই উঠল কিন্তু আমি উঠতে পারছি না। গাড়ী ছাড়ার মুহূর্তে একটা কামরায় উঠলাম। দেখি সেখানে ভীড় নেই। ৪/৫ জন লোক। অভিজিৎ দা আমাকে দেখে হাসছে। কী অপূর্ব লাগছে ওকে। খেয়াল করলাম আমার বগলে একটা বালিশ।

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...115

পরের দৃশ্যে একজনকে বলছি—স্বপ্নে দেখালো ''লি'' মানে লিখে লিখে অনুশীলন করতে বলছে।...ঘুম ভাঙলে বুঝলাম স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন দেখছিলাম।

---স্নেহময় গাঙ্গুলী
চারুপল্লী

ব্যাখ্যা ঃ অভিজিৎদা—সমষ্টিচৈতন্য।

বগলে বালিশ—অনুচৈতন্য লাভ হলে তাকিয়া পাওয়া যায়।

বরণ

● দেখছি (27.12.20)—বিশাল বড় মাঠ। ১০ থেকে ১৪ বছরের প্রচুর ছেলে এসেছে। ওরা খেলবে। খেলার আয়োজন হয়েছে। ওদের বরণ করার জন্য বড় একটা থালায় অনেকগুলো মোমবাতি জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। আমাকে একজন বললো এটা নিয়ে তুমি ছেলেদের বরণ করে নেবে। তারপর ওরা খেলা শুরু করবে। আমি থালাটা নিয়ে ওদের কাছে গেছি। হঠাৎ একটা দমকা বাতাস এল। সব মোমবাতি মিশে একটা বড় মোমবাতি হল। তার আলোও বেশি উজ্জ্বল। ওটার ক্ষয় হচ্ছে না। জ্বলেই যাচ্ছে। ছেলেগুলো ঐ আলোয় আকৃষ্ট হয়ে সকলের কাছে এল ও মিলে মিশে এক হয়ে গেল। আমি মোমবাতির আলোর শিখাটার দিকে নির্বাক হয়ে, মোহিত হয়ে তাকিয়ে আছি। ....

---রূপা মাজি
আমতলা

ব্যাখ্যা---

১০ থেকে ১৪ বছর বয়সের ছেলে —ঈশ্বর কর্তৃক নির্বাচিত মানুষেরা যারা তাঁর লীলাখেলায় অংশগ্রহণ করবেন। খেলাটা হল—বহুত্বে একত্ব উপলব্ধি। ছেলেদের বরণ করতে হবে—বহুত্বে একত্বের যে বাস্তব উদাহরণ ফুটছে তাকে বরণ করে নিতে হবে। সব মোমবাতি এক হল ও শিখা অনির্বাণ—একজ্ঞানের আলো অনির্বাণ থাকবে।

● গত 27/12/2020 পাঠ শুনতে শুনতে দর্শন হ'ল—শ্রী জীবনকৃষ্ণের কালো শ্যাডো মূর্তি। তার মাথার পিছনে জ্যোতি। আমি লাল পাড় সাদা শাড়ি পরে আছি। জীবনকৃষ্ণের হাতে অনেক সাদা ফুল। ঐ ফুলগুলো উনি আমার গায়ে ছুঁড়ছেন। আমি আশ্চর্য হলাম। খুব আনন্দ হচ্ছে। আবার ভাবছি, এ কী হচ্ছে? কিছুক্ষণ পর দেখি আমি একটা ফুল কুড়িয়ে গন্ধ শুঁকছি। খুব মিষ্টি গন্ধ। হঠাৎ দেখি ঐ ফুল থেকে প্রচুর ছোট ছোট জীবনকৃষ্ণের শ্যাডো মূর্তি বেরিয়ে আমার সারা শরীর ঢেকে দিল (যেন Sticker লাগলো)। আমি তখন নিজেকে আর দেখছি না। দেখি বড় জীবনকৃষ্ণের শ্যাডো মূর্তি হয়ে গেছি। ....খুব আনন্দ হল।

ব্যাখ্যা---

নির্গুণের ঘনমূর্তি সমষ্টি চৈতন্যরূপী জীবনকৃষ্ণের প্রসন্নতা লাভে দর্শন অনুভূতির মননে তাঁকে আপন বৃহৎ সত্তা বলে উপলব্ধি হচ্ছে।

---মৌমিতা মুখার্জী
চন্দননগর

ভালোবাসা কারে কয়

● দেখছি (30/11/2020)—অমরেশ কাকুর ছেলে শঙ্খর বিয়ে। আমরা সবাই আমন্ত্রিত। কিন্তু যে শঙ্খের বিয়ে তাকে ১০/১১ বছর বয়সের দেখছি। বিয়ে উপলক্ষ্যে পাঠের আয়োজন হয়েছে। পাঠে কী গান গাওয়া হবে স্নেহময় জেঠু সেটা দেখছে। 'ভালবেসে সখী নিভৃতে যতনে'—এই রবীন্দ্রসঙ্গীতটি নির্বাচন করল। রেকর্ডিং বাজানোর কথা ভাবছিল। তখন বাবা বলল, তুতুন গানটা জানে। ও গাক। জেঠু সম্মতি দিল। পাঠ শুরু হল। পাঠের মাঝে গানটা হবে। আমি জেঠুর পাশে বসে আছি। এমন সময় জয় দাদা এল। জেঠু গীতবিতান খুলে গানটা বার করছে। জয় দাদা বলল, কই কী গান গাইবে দেখি—এই বলে গীতবিতান হাতে নিল। জেঠু বলল, তুতুন করবে "ভালবেসে সখী" গানটা। জয়দা বলল, তুই গানটা শিখেছিস? বললাম, শিখিনি। তবে শুনে শুনে তুলেছি। তখন জয়দা নিজেই গানটা গাইতে লাগলো। আমিও গীতবিতানে লিরিক্স (গানের কথাগুলো)

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...117

খুঁজে বের করার অপেক্ষা না করে গাইতে শুরু করলাম। আমি শুরু করতেই জয়দা গান থামিয়ে চোখ বন্ধ করে শুনতে লাগলো।...স্বপ্ন ভাঙলো।

---প্রকৃতি ব্যানার্জী
জামবুনি, বোলপুর

ব্যাখ্যা---

১০ বছর বয়সের শঙ্খ— ঈশ্বরের লীলাখেলায় নির্বাচিত মানুষ। বিয়ে হবে—মিলন, একত্ব লাভ হবে। এই স্বপ্নে দেখাচ্ছে ঈশ্বর মানুষকে আগে ভালবাসেন—ভিতর থেকে দর্শন ও প্রেরণা দেন—তবেই মানুষ তাঁর সুরে সুর মেলাতে পারে, একত্ব লাভ হয়।

● দেখছি (জানুয়ারী, 2021)—একটি মসজিদে বহু মুসলিম জড়ো হয়ে চিৎকার করে আল্লা নাম করছে। কিন্তু কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। খেয়াল করলাম দূরে জয় হাঁ করে বসে আছে আর ঐ শব্দ যেন মসজিদ থেকে উঠে জয়ের মুখে ঢুকে যাচ্ছে....।

ব্যাখ্যা---

মানুষের অন্তরে ধ্বনিত ঈশ্বরের নামের উৎস ঈশ্বর স্বয়ং। তিনি এ যুগে নিজেকে ধরা দিচ্ছেন, প্রকাশ করছেন।

---শোভন ধীবর
অবিনাশপুর

ভিতরের দাঁত

● দেখছি (22.11.2020)— পানা ঠেলে তরী বেয়ে একটা পুকুরের কিনারায় দাঁড়ালাম। কষ্টিপাথরের গোল পুকুর। জল খুবই পরিষ্কার। সেখানে মাঝখানে একটা বড় পদ্ম ফুটে রয়েছে। তাকে ঘিরে অনেকগুলি ছোট ছোট পদ্ম। মুগ্ধ হয়ে দেখছি।....

---কমল মালাকার
জীবনকৃষ্ণ পল্লী

ব্যাখ্যা---

কষ্টিপাথরের পুকুর—পাঠচক্র। মাঝের বড় পদ্মটি সমষ্টি চৈতন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেছিলেন একজন ছোটলোক পানা ঠেলে জল খেল। ব্যক্তিগত

ভাবে তিনি ভগবৎ কৃপায় মায়া মুক্ত হয়ে ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন করেছেন। এ যুগে পাঠচক্রে এসে সমষ্টিচৈতন্যের প্রকাশ প্রত্যক্ষ করে বহু সাধারণ মানুষের সহস্রার ক্রিয়াশীল হচ্ছে ও ভগবৎ তৃষ্ণা মিটছে, ব্রহ্মানন্দ লাভ হচ্ছে।

● দেখছি (20.11.2020)—বড় রাস্তা ধরে হাঁটছি। সামনে থেকে পুরাণের কৃষ্ণ হাসতে হাসতে আসছে। কাছে এলে আমি বললাম, তোমার দাঁতগুলো নষ্ট হয়ে গেল কী করে? উনি বললেন, তুমি জানো না? আমি বললাম, না। বললেন, জীবনকৃষ্ণের নতুন দাঁত বেরিয়েছে যে! বললাম, তাই? তখন দেখি বিরাট মাকড়সার জাল। সেই জালে মাকড়সার পরিবর্তে জীবনকৃষ্ণ বসে আছেন। তিনি হাসছেন। তাঁর ছোট ছোট সুন্দর দাঁতগুলি দেখা যাচ্ছে। যেন দুধ দাঁত। সবে বেরিয়েছে। ...খুব আনন্দ হল।

---সবিতা ঘোষ
চারুপল্লী

ব্যাখ্যা---

পুরাণের কৃষ্ণের দাঁত নষ্ট—পৌরাণিক সংস্কার যা মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করত (দাঁত দেখাতো) এবং বিপথগামী করতো, তা শক্তিহীন হ'ল। জীবনকৃষ্ণ বলতেন, 'তোরা যে আমায় স্বপ্নে দেখিস সে শোভা, হাতির বাইরের দাঁত। হাতি ভিতরের দাঁতে খায়। আমি ভিতরের দাঁতে খেতে পারছি না।' এখন তিনি ভিতরের দাঁতে খেতে পারবেন, আমাদের অহং নাশ করে (খেয়ে নিয়ে) একত্ব আস্বাদন করাবেন।

নাদ

● স্বপ্ন দেখছি (24.12.2020)—আমাকে হেড অফিস থেকে একজন ফোন করে বলল যে পায়ের (গ্রামের নাম) Health centre এর Untied fund এর Utilisation certificate দেওয়া হয়নি। প্রথমে পুরুষ কণ্ঠ পরে নারী কণ্ঠ শুনলাম। তৎক্ষণাৎ কিছু মনে পড়ল না। তারপর বললাম, নতুন যে Community Health Officer কাজে যোগ দিয়েছেন তিনি U.C দেবেন। ...ঘুম ভাঙল।

---সবিতা পাল
ইলামবাজার

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...119

ব্যাখ্যা---

Health sub-centre—পাঠচক্র। Untied fund—স্বপ্ন ও অনুভূতি। Utilisation certificate (U.C)—পাঠের আলোচনা ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা ধারণা ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগ কতটা হচ্ছে তার তথ্য। নতুন কমিউনিটি হেলথ অফিসার—সমষ্টিচৈতন্য। হেড অফিস—মনুষ্যজাতি।

● গত ২৬.১২.২০২০, পাঠ চলছে। জয় অনেক কথা বলছে। হঠাৎ দেখলাম মা কালী জিভ বের করে আছে। জিভের ওপর একটা ঘন্টা। আর শ্রীরামকৃষ্ণ যেন একটা ছোট ছেলে। ধুতি পরে আছেন। তিনি আনন্দে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছেন। ....

---জ্যোৎস্না গাঙ্গুলী
চারুপল্লী

ব্যাখ্যা---

ঘন্টা—নাদ, জিভে ঘন্টা—যার কথা নাদ। মহাকালী অর্থাৎ নির্গুণ থেকে আসছে নাদ। তা শুনে ঈশ্বর প্রেমে বালকবৎ অবস্থা হচ্ছে যাদের (বালক রামকৃষ্ণ) তারা ব্রহ্মানন্দ ভোগ করছেন।

● দেখছি (21.12.2020)—একটা কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ওর মাথা নেই। মনে হচ্ছে অন্য কুকুর মারামারি করে ওর মাথা কামড়ে ছিঁড়ে দিয়েছে।...

---চন্দ্রা ঠাকুর
দীঘা, বীরভূম

ব্যাখ্যা---

দ্রষ্টাকে ভাবতে বলছে বিধিবাদীয় ধর্মের মাথামুণ্ডু নেই। তার কী কী সংস্কার গেছে তা নিয়ে চিন্তা করতে হবে, নাহলে অলক্ষ্যে থেকে যাবে, সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হবে না। অন্য কুকুর—Vivid Powerful and true religion-এর প্রতীক।

ফেং শুই

● দেখছি (4.04.2021)— একজনের accident হয়েছে। আমি তাকে নিজের অ্যাক্সিডেন্টের কথা বলে আশ্বস্ত করছি। হঠাৎ দৃশ্য পরিবর্তন, মনে হচ্ছে অন্‌লাইনে (Online-এ) পাঠ শুনছি। স্নেহময় কাকু বলছেন, ''সব চুপ কেন? এই অর্ণব হাতির কানা দেখাটা বর্ণনা কর।''...

---অর্ণব পাল,
জিনাইপুর, বীরভূম

ব্যাখ্যা---

কানার হাতি দেখা—যার জ্ঞানচক্ষু লাভ হয়নি, সে হাতির দেহের কোন একটি অংশ—কান, পেট, পা, লেজ বা শুঁড়ে হাত দিয়ে অনুভব করে। অর্থাৎ আংশিক অনুভূতি লাভ করে, ষষ্ঠভূমিতে ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয় মাত্র।

অপর পক্ষে—

হাতির কানা দেখা মানে—একজন মানুষকে পূর্ণ ব্রহ্ম (নির্গুণ) রূপে দেখে তার সাথে একত্ব লাভ হলে হাতি তথা ঈশ্বরের অঙ্গীভূত হয়ে অন্যদের দিকে তাকিয়ে দেখে যে তারা কানা। তারা এই মানব ঈশ্বরকে দর্শন করলেও তাকে ভগবান বা ব্রহ্ম বলছে, আপন বৃহৎ সত্তা বলে উপলব্ধি করতে পারছে না।

● ভোরের দিকে স্বপ্ন দেখছিলাম (7.04.2021)—আমি আর মৌমিতা শুয়ে আছি। ও বাঁ দিকে পাশ ফিরে শুতে শুতে বলল, ''চশমারও একটা ফেং শুই আছে।''...খুব অবাক হলাম।

---রোহিণী সিনহা
দক্ষিণেশ্বর

ব্যাখ্যা---

সমষ্টিচৈতন্যের অনুসত্তা লাভে একত্বের মধুপিয়াসীদের (মৌমিতা) আত্মিকে (বাঁ দিকে) এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী জাগে। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে (চশমায়) ঈশ্বরীয় কথা ও দর্শন-অনুভূতির practical aspect অর্থাৎ বাস্তব জীবনের শুভদায়ক দিকটি (ফেং শুই) নজরে আসবে।

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...121

● দেখছি (8.11.2020)—একটা বইয়ের পাতায় VERGINITY শব্দটি কেউ একজন দেখিয়ে দিয়ে বলছেন—তোদের VERGINITY (কুমারীত্ব) থাকছে। স্বপ্নের মধ্যেই ঘুম ভাঙল। স্বপ্নটা মনে রাখার জন্য আর একবার মনে করে নেওয়া হল তারপর সত্যিকার ঘুম ভাঙল।

---শুভাশিস দাস
বোলপুর

ব্যাখ্যা---VERGINITY থাকছে—দেহ যোগযুক্ত থাকছে, নির্গুণের প্রসন্নতা লাভে।

সূর্যের বাড়া

● দেখছি (25.04.2021)— একজন মহিলা ফেরীওয়ালা প্লাস্টিকের কিছু জিনিসপত্র বিক্রি করতে এসেছে। আমি ওর কাছ থেকে ১৫ টাকা দিয়ে একটা পা-পোশ কিনলাম। অপরদিকে দেখছি যে স্নেহময় কাকু পাঠ চলাকালীন পাঠের কোন টপিক নিয়ে সকলকে বোঝাচ্ছেন। পাঠে রয়েছেন অর্চনাদি। তিনি বারবার বলছেন, আমাকে বলতে দিন। তখন স্নেহময় কাকু ঐ দিদিটাকে বলছেন, আমি শুনলাম আপনি নাকি বাবুদা (অমর)-কে বলেছেন, আপনি কোনদিনই মারা যাবেন না।

---শুক্লা লাহা
বোলপুর

ব্যাখ্যা---

১৫ সংখ্যাটি একটা স্তরে পূর্ণ আত্মিক শক্তির ও জ্ঞানের প্রকাশকে ইঙ্গিত করে। ঈশ্বরীয় চর্চায় ষোল আনা মন দিলে সর্বদা গ্লানি মুক্ত থাকা যায় (পা-পোশ কেনা যায়) ও নিজের শাশ্বত সত্তার পরিচয় লাভ করা যায় (যা মারা যায় না)। মহিলা ফেরীওয়ালা—সমষ্টিচৈতন্য।

● গত ২৮ শে এপ্রিল সন্ধ্যা দিদার পাঠ শুনছিলাম। শুনতে শুনতে চোখটা লেগে গিয়েছিল। তারই মধ্যে স্বপ্ন দেখছি—একটা ঘরে পাঠ

হচ্ছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন স্নেহময় মামা, সন্ধ্যা দিদা ও আরও কয়েকজন। আমিও দেখছি দিদা মামাকে বললেন, আমার নাতনী (অর্থাৎ আমি) একটা স্বপ্ন দেখেছে। সে তোমার সঙ্গে সূর্যের কাছে গেছে। আর সেটা আমি স্বচক্ষে দেখলাম। এটা শুনে মামা বললেন, বাঃ। এরপর আমি বললাম, আমি কিন্তু আরও দেখেছি যে আমি সূর্যের কাছে যাওয়ার পর সূর্যের ঠিক পাশে শ্রীজীবনকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন। ওনাকে সূর্যের থেকেও বড়ো দেখাচ্ছে। আর উনি চকোলেট রঙের পাঞ্জাবী আর সাদা ধুতি পরে দাঁড়িয়ে আছেন। এটা দেখতে দেখতে মা ডেকে দেওয়ায় ঘুমটা ভেঙে গেল।

---ঈশানী দে
বালী, বাদামতলা

ব্যাখ্যা---

সূর্য—ভগবান। সূর্যের চেয়েও বড়ো—জীবনকৃষ্ণ এখন নির্গুণ ব্রহ্ম বা সমষ্টিচৈতন্য রূপে প্রকাশ পাচ্ছেন।

ইঁদুর ছানা

● স্বপ্নে দেখছি (24.01.21)—প্রবাহ বইটা দেখছি। প্রবাহ লেখাটার মধ্যে জীবনকৃষ্ণের মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তবে ওনার বয়সটা একটু কম মনে হচ্ছে। কিন্তু বলিষ্ঠ ও মুখ থেকে আলোর আভা বেরোচ্ছে। ....খুব আনন্দ হল।

---তনুশ্রী চ্যাটার্জী
শীলপাড়া, বেহালা

ব্যাখ্যা---

বয়সটা কম, চিরনবীন—প্রবাহ বইয়ের অনুভূতিতে নির্গুণব্রহ্ম জীবনকৃষ্ণের পরিচয় ধরা পড়েছে।

● দেখছি (এপ্রিল,২০২১)—একটা বড় ইঁদুর। তার দুধ খাচ্ছে একটা ছানা। বড় ইঁদুরটার মুখে একটা বিস্কুট। আমি লাথি মেরে বিস্কুটটা দূরে

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...123

উঠোনে ফেললাম। অমনি সেটা একটা কাক নিয়ে চলে গেল। আর ইঁদুর দুটো আমার পা দিয়ে দেহের ভিতর ঢুকে গেল।...

---পার্থ দাস,
কড়িধ্যা, সিউড়ী

ব্যাখ্যা---

ইঁদুর—জীবত্ব। ইঁদুরের ছানা—জীবত্ব বংশ বিস্তার করেছে। কারণ খাবার পাচ্ছে। বিস্কুট দূরে ফেলল—খাবার দিল না, প্রশ্রয় দিল না। দেহে ঢুকে গেল—ওটি নিজেরই দেহস্থ জীবত্ব তা বুঝিয়ে দিল। প্রশ্রয় দিলে জীবত্ব বাড়ে।। কাক—ঝাড়ুদার পাখী—নির্গুণ ব্রহ্ম। লাথি মারা—পুরুষকার প্রয়োগ।

● দেখছি (Feb,2021)—আমি শুয়ে আছি। ডান হাত পেঁচিয়ে ধরে আছে একটা জাত সাপ। আমার দিকে তাকিয়ে আছে আর হিসহিস শব্দ করছে। ভয়ে ভয়ে আছি। কিন্তু কোন ক্ষতি করছে না। ও ক্ষতি করবে না সেটা বুঝতে পারছি।

পরের দৃশ্যে স্নেহময়দাকে বললাম স্বপ্নটা। দাদা বলল, কুণ্ডলিনী সুরে জেগেছে। আর ডান হাতে জড়িয়ে কেন তার ব্যাখাটা কী বলল মনে নেই।

---মৌসুমী সিংহ জানা
বাউড়িয়া, হাওড়া

ব্যাখ্যা---

জাত সাপ-জগৎ চৈতন্য। হিসহিস—সুরে জাগছে, চৈতন্য জাগ্রত হয়ে মুখ দিয়ে যোগের ভাষা বেরোবে। ডান হাত ব্যবহারিক জগৎ। ব্যবহারিক জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করবে আত্মিক চৈতন্য। দিনে দিনে তা উপলব্ধির বিষয়—বলে বোঝানোর নয়।।

আজব গাছ

● দেখছি (11.05.21)—বনের পথ ধরে যাচ্ছি। এক জায়গায় দেখলাম সুন্দর সবুজ পাতায় ভরা একটা সুপারী গাছ। তাকে কেউ যেন আকাশ থেকে ধরে আছে। গাছের গোঁড়া মাটিতে নেই, শূন্যে। ওখান থেকে খুব সরু সরু শিকড় নেমে এসে মাটিতে ঠেকেছে ও মাটি থেকে রস নিচ্ছে।

এটা কিভাবে সম্ভব হল ভাবছি। হঠাৎ স্নেহময়দা এলেন। বললেন, বরুণ দু'বার এসে কিছু না বুঝে বিরক্ত হয়ে চলে গেছে। তৃতীয়বার এসে বুঝে চলে গেছে। কিন্তু কী বুঝেছে তা না বলেই স্নেহময়দা চলে গেলেন।

ঘুম ভাঙল। তন্দ্রায় দেখছি—বড়ো বড়ো কালো আঙুল দিয়ে কে যেন গাছটাকে ধরে রেখেছে আর বড়ো গোল পৃথিবী থেকে সূক্ষ্ম জালের মতো শিকড় দিয়ে রস টেনে নিচ্ছে। ...

---স্বপন ভট্টাচার্য্য
বাগুইহাটি

ব্যাখ্যা---

সুপারী গাছ—যে দেহে বস্তুতত্ত্বের সাধন হয়। তার জাগতিক সম্পর্ক (স্থূলে) যেটুকু থাকে তা সূক্ষ্ম মনের দ্বারা সাধিত হয়। আর এ সম্ভব হয় নির্গুণের সহায়তায়। তৃতীয় বারে অর্থাৎ সমষ্টির যুগে এ তত্ত্ব বোঝা যাচ্ছে।

● দেখছি (12.05.2021)—মামার বাড়িতে আছি। মায়ের অনুরোধে দিদিমা আমাকে রেখেছে। কিন্তু মামার ইচ্ছা নেই, ভাবছে আমি তার সম্পত্তি নেব। দিদিমা বলল, ''তোকে চলে যেতে হবে।'' আমি বোনকে ওখানে রেখে নতুন একটা সাইকেল নিয়ে একাই বাড়ি চলে এলাম। আমাদের বাড়িটা যেন অরুণবাবুর বাড়ি। এরপর থেকে যা কথা বলছি বা আলোচনা করছি সেই বিষয়টা চোখের সামনে ভেসে উঠছে আর সমস্ত কথা সমষ্টিগতভাবে হচ্ছে। আমার অস্তিত্ব তাতে হারিয়ে যাচ্ছে। ভাষায় ঠিক প্রকাশ করতে পারবো না।...

---বাপী পাল
হাওড়া

ব্যাখ্যা---

দ্বৈতবাদ ও ব্যষ্টির অদ্বৈতবাদ থেকে বহুত্বে একত্ব তথা সমষ্টির অদ্বৈতবাদে উত্তরণ ঘটলো।

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...125

নবীনা

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...127

ষ্টিফেন হকিং

● স্বপ্ন দেখছি—(16.04.21) আমাকে এক বন্ধু রেস্তোঁরা জাতীয় এক জায়গায় ডেকেছে। বন্ধুটি টাইম মেশিনে ভিন্ন কালে ভ্রমণ বিষয়ে গবেষণা করছে। এ ব্যাপারে তার সাফল্যের কথা আমাকে বলতে চায়। সেখানে গিয়ে দেখি তার পাশে কোট ও টুপী পরে একজন বসে আছে। তার মুখটি ঢাকা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, পাশের উনি কে? বন্ধুটি বলল, নিজেই দ্যাখ, তবে অন্য কেউ যেন না দেখে। তখন লোকটি আমাকে রেস্তোঁরার এক কোণে নিয়ে গিয়ে তার টুপী খুলে মুখ দেখালো। দেখি উনি বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ষ্টিফেন হকিং (যিনি সম্প্রতি মারা গেছেন) কিন্তু তার দেহটা জীবনকৃষ্ণের। আমি জীবনকৃষ্ণরূপী হকিং-কে দেখে খুব অবাক ও উত্তেজিত হলাম। তারপর বন্ধুর কাছে ফিরে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কী করে এটা সম্ভব হল? বন্ধুটি বলল, আমি ওনাকে অতীত থেকে পেয়েছি। আমি ভাবলাম, ও অতীতে ফিরে গিয়ে বিজ্ঞানীকে ভবিষ্যতে নিয়ে এসেছে।

আমি হকিং-এর সাথে বিজ্ঞান বিষয়ে নানা কথা বলতে লাগলাম। পরে আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, উনি যে ভবিষ্যতে মারা যাবেন সেটা উনি জানেন কিনা। উনি বললেন, উনি তা ভালোভাবেই জানেন। তার মৃত্যুর দিনক্ষণও বলে দিলেন। আমি অবাক হয়ে বললাম, কী করে এতো নিখুঁতভাবে এসব জানলেন? বন্ধুটি তৎক্ষণাৎ বলল, কারণ উনি কখনোই মারা যাননি। উনি টাইম মেশিনে ভবিষ্যতে চলে এসেছেন—একথা সকলকে বলে তো বোঝানো যাবে না। কেউ বিশ্বাসও করবে না। তাই তার মৃত্যু নিয়ে একটা গল্প বানিয়ে তা রটানো হয়েছে।

যেহেতু টাইম মেশিনে হকিং-কে ভবিষ্যৎকালে পাঠানো হয়েছিল তাই বন্ধুটি ভবিষ্যতে তার আসার জন্য অপেক্ষা করছিলো। সে জানতো উনি কখন আসবেন। এখন যেহেতু সবাই জানে যে হকিং মারা গেছে তাই এক্ষুনি সকলকে তাঁর বেঁচে থাকার কথা বলা ঠিক হবে না। তাহলে অনেকে টাইম মেশিনের প্রযুক্তি চুরি করবে ও নানারকম ভুল কাজ করবে। তাই হকিং বেঁচে আছে ও টাইম মেশিন কাজ করে একথা গোপন রাখতে হবে।...

—দেবায়ণ দাস (ব্যাঙ্গালোর)

ব্যাখ্যা---

স্টিফেন হকিং-এর গবেষণার তিনটি বিষয় এখানে প্রাসঙ্গিক

১) কালের ইতিহাস—কালের শুরু—বৃহৎ বিস্ফোরণ (Big Bang) ও শেষ কৃষ্ণ গহ্বর (Black hole)।

২) কৃষ্ণ গহ্বর—অতীতে ধারণা ছিল যে কৃষ্ণ গহ্বর সম্পূর্ণ কালো—কোন শক্তি বিকিরণ করে না। হকিং বললেন, কৃষ্ণ গহ্বরও বিকিরণ ঘটায়।

৩) String theory (তন্তু তত্ত্ব)—Cosmic law প্রতিষ্ঠায় String theory ভূমিকা পালন করতে পারে। Cosmic law হ'ল unification of four fundamental forces- Quantum Gravity, একটাই Force বা law দিয়ে Micro ও Macro world-এর সব গতিবিধি ব্যাখা করা যায়।

এই স্বপ্নে রেস্তোঁরা =পাঠচক্র। বিজ্ঞানী বন্ধু = অনুচৈতন্য লাভকারী মানুষের জগৎ যারা সত্যান্বেষী হয়ে উঠেছে—কালাতীত সত্তার বিকাশ কালের গবেষণায় রত। স্টিফেন হকিং—নির্গুণের বিকাশের দুটি পর্যায়ে দুটি মূর্ত রূপ। (১) জগৎ চৈতন্য—প্রথম পর্যায়—সময় ভ্রমণ (Time travel)—নাদ থেকে বিশ্বব্যাপীত্ব লাভ।

(২) সমষ্টিচৈতন্য— বিরাট নক্ষত্রের চুপসে গিয়ে কৃষ্ণগহ্বর হওয়ার ন্যায় জগৎচৈতন্যের নির্গুণের ঘনমূর্তি হয়ে ওঠা-কালের শেষ ও শাশ্বতকাল বা মহাকাল হয়ে ওঠা।

স্বপ্নে দেখাচ্ছে ১ম পর্যায়ের বিকাশের পরবর্তী অংশে জগৎচৈতন্যের ইচ্ছামৃত্যু অর্থাৎ সমষ্টিচৈতন্যে রূপান্তর কাল। এই পর্যায়টা তার ভবিষ্যতে থাকা মনে হচ্ছে। আসলে বর্তমানেই আছেন। রূপান্তর সম্পূর্ণ হয়েছে। সাধারণের বোধে প্রকাশ হচ্ছে যে ভবিষ্যৎকালে হবে।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিস্কার হবে। যদি ৪ আলোকবর্ষ দূরের কোন নক্ষত্র নিভে যায় ও কৃষ্ণ গহ্বরে পরিণত হয়, তাহলেও পরবর্তী ৪ বছর ধরে পৃথিবীর মানুষ ঐ আগের নক্ষত্রের আলোটিই দেখবে। তাই মনে হবে ভবিষ্যতে নক্ষত্রটি কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হবে।

এখন নির্গুণের ঘনমূর্তি রূপে প্রকাশিত হয়ে অনুসত্তা দান করে বোঝাচ্ছে যে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় নয়, নির্গুণ ক্রিয়াশীল। নির্গুণের এই প্রকাশ Cosmic law হয়ে উঠেছে। অন্তর্জগতে নির্গুণের প্রকাশ যে শক্তি দান করে (String-

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...129

এর ক্ষুদ্র কম্পনে সৃষ্ট শক্তি কণা) তা-ই ব্যবহারিক জগতকে নিয়ন্ত্রণের শক্তি দেবে (String-এর বৃহৎ কম্পনে সৃষ্ট শক্তিকণা)। সুতরাং নির্গুণের সাথে একত্ব লাভ হলে বোঝা যায় যে সব কিছু নির্গুণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

শুধু দ্রষ্টাকেই দেখতে বলছে—নিজেকে আগে বোধে বোধ করতে হবে। অন্যদের কাছে গোপন রাখতে হবে—এই মুহূর্তে শুধু পাঠচক্রে আলোচনা ও নিজস্ব মননে রাখতে হবে। উচ্ছ্বসিত হয়ে সবার কাছে বলার দরকার নেই। লোকে এই প্রযুক্তি চুরি করে ভুল প্রয়োগ করবে—এই সময় ভ্রমণের তত্ত্বকে নিজেদের মতো করে পরজন্মের তত্ত্ব হিসাবে খাড়া করবে ও নিজেদের গুরুদেব ও অন্যান্যদের নিয়ে নানা বিভ্রান্তিমূলক গল্প রটাবে। নানা রকম কল্পনা করবে।

● দেখছি (25/2/21)—আমি আমার দিদার বাড়ির খাটে শুয়ে আছি। আমি যে খাটে শুয়ে আছি মা ও দিদা সেখানে বসে আছে। দাদু আছে কিন্তু তাকে দেখতে পাচ্ছি না। মনে হল দাদু যেন খাটের পাশে যে সোফা আছে, সেখানে বসে আছে। আমার সামনেই একটা জানলা আছে। ওখানে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর একটি ছায়া-মূর্তি আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকালো। তারপর এক ছুটে সরে গেল। আমার যেন একটা ঘোর কেটে গেল। যেন স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন হ'ল। হাসতে হাসতে মা-কে বললাম, মা আমি বাস্তবে জীবনকৃষ্ণকে দেখলাম এইমাত্র।

---অগ্নিশ চ্যাটার্জী
শীলপাড়া, বেহালা

ব্যাখ্যা---

স্বপ্নের ভিতর স্বপ্ন— তূরীয় অবস্থা। ছায়া মূর্তি— নির্গুণের ঘনমূর্তি। নির্গুণের ঘনমূর্তি রূপে তাঁকে (জীবনকৃষ্ণকে) দেখা যেন বস্তুগত ভাবে দেখা—সত্য সূর্য দেখা, সমষ্টিচৈতন্যকে দেখা।

সোনার কয়েন

● দেখছি (16.03.2021)— ভ্যানে করে যাচ্ছি। সামনে দুটো মেয়ে আর আমার সাথে দর্শন বলে একটি ছেলে বসে। দ্বিধা নিয়ে ছেলেটির হাতে হাত রাখলাম। সে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। সামনে একটা বড় হলঘর। সেখানে যেতে বললো। গিয়ে দেখি ১২৮ জন সেনা দাঁড়িয়ে রয়েছে। জয় বলে একটি ছেলে আমার হাতে একটি সোনার কয়েন দিয়ে বলল, তুমি এই সোনার কয়েন ক্যারামের ঘুঁটির মতো ছোঁড়। আমি সেটা ছোঁড়া মাত্র একটি সেনার পায়ে গিয়ে লাগলো। তার কাছে অনেক সোনা হয়ে গেল। এবার সেই সেনা তার কাছে থাকা সোনা অন্যদের পায়ে ছুঁড়ল। যার পায়ে ঠেকল তার কাছে অনেক সোনা হয়ে গেল। এভাবে 128 জন সেনা তাই করতে লাগলো। তাদের মাঝে আমার সোনার কয়েনটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। লক্ষ্য করলাম প্রত্যেক সেনা ঐভাবে খেলছে কিন্তু দর্শন নামে ছেলেটি শান্ত। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার সোনার কয়েনটা দেখেছো? ও হাত খুলে দেখালো সেটা ওর হাতেই রয়েছে। হাতটা এমনভাবে বাড়িয়ে দিল যেন আমার জন্যই সে অপেক্ষায় ছিল। ...ঘুম ভাঙলো।

---সায়েরী রাউত
বেহালা

ব্যাখ্যা---

ভ্যানে করে যাওয়া— মনের অন্তর্মুখী যাত্রা। সামনে দুটি মেয়ে ও দর্শন সাথে আছে— দ্বৈতবাদের জগৎকে সামনে রেখে যে দর্শন (Philosophy), প্রথমে দ্বিধা থাকলেও সেই দর্শনকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে হয়। এর অর্থাৎ দ্বৈতবাদের দর্শনের জ্ঞান পূর্ণতা লাভের পর এই দর্শনই তাকে সমষ্টিগত একত্বের অনুশীলনের ঘরে পৌঁছে দেয়। সেনা—অহং কমে গিয়ে চৈতন্যলাভের জন্য সদাসতর্ক ও পূর্ণ মনোযোগী হয়ে অনুশীলন করে যারা।

১২৮ জন সেনা—১২৮ সংখ্যার অর্থ একদল মানুষ যারা একটি গ্রুপে সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করতে পারেন, আবার আপন জগতে ডুবে থাকতে ভালোবাসেন। তখন জয় অর্থাৎ সমষ্টিচৈতন্য সোনার কয়েন অর্থাৎ একত্বের অনুভূতি দান করেন ও সমষ্টিগতভাবে মনন করতে বলেন। ক্যারামের ঘুঁটির মতো ছোঁড়ে—সবাই সবার অনুভূতি নিয়ে মনন করে

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...131

আর যত মনন করে ততই আত্মিক ঐশ্বর্য্য বাড়ে। হলঘরে থাকা শান্ত দর্শন— বহুত্বে একত্বের দর্শন (Philosophy)। দ্রষ্টার লক্ষ্য স্থির। (একত্ব বোধে বোধ করাই লক্ষ্য) তাই দর্শন শান্ত। এই অনুশীলন চলতে চলতে একসময় বহুত্বে একত্বের দর্শন তার ধারণা হয় ও একত্বের বোধ স্থায়ীভাবে লাভ হয়। একটাই Golden coin–স্বপ্ন একটাই। পায়ে পায়ে অনেক সোনা জমল—আলোচনায় অনেকের মধ্যে আত্মিক জ্ঞানের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি হল।

● দেখছি (মার্চ, 2021)—সিগারেট খাবার জন্য দেশলাই বাক্স বের করে সেখান থেকে একটা কাঠি বের করলাম। আগুন জ্বালাতে গিয়ে খেয়াল করলাম দেশলাই বাক্সটা ভিজে আছে। এতে কাঠি ঘষলে আগুন জ্বলবে না। হঠাৎ চোখে পড়ল দেশলাই বাক্সের ভিতরের দিকের গায়ে একটা ছোট্ট বারুদের বিন্দু রয়েছে। সেটা কিন্তু শুকনো। ওখানে কাঠিটা ঘষতেই ফস করে আগুন জ্বলে উঠল। তখন সিগারেট ধরালাম।...ঘুম ভাঙলো।

---অভিজিৎ রায়
ইলামবাজার

ব্যাখ্যা---সাধারণ মানুষের দেহ বিষয়াসক্ত—ভিজে দেশলাই। কিন্তু এ যুগে অর্ন্তমুখী হলে নিজের মধ্যে অনুচৈতন্যের জাগরণ অনুভব করা যায়। সেই অনুচৈতন্যের (বারুদ বিন্দুর) সাহায্যে নিবিড় অনুশীলনে অহংনাশের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

● দেখছি (8.03.2021)—৭ই জ্যৈষ্ঠ উপলক্ষ্যে কিছু মানুষ বোলপুরে যাব বলে ট্রেনে উঠেছি। ট্রেনে ওঠা মাত্র এক সেকেণ্ডে বোলপুরে পৌঁছে গেলাম। গিয়ে দেখলাম অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। সেখানে পাঠের সবাই রয়েছে। আলোচনা হচ্ছে। আলোচনার প্রসঙ্গই ছিল কিভাবে আমাদের অহংনাশ হবে। হঠাৎ দেখছি চারদিক যেন কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে গেল। কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। আমার শরীরও দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু কী আশ্চর্য জয়ের মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ও হাসতে হাসতে বলছে, তোমাদের ক্ষুদ্র অহংগুলোকে আমার এই বৃহৎ অহং-এ পরিবর্তিত করে নেব। এই আমার শেষ কথা।...ঘুম ভাঙলো। অনির্বচনীয় এক আনন্দে দেহমন ভরে গেল।

---রাজীব রায়চৌধুরী (সখের বাজার)

ব্যাখ্যা---বোলপুর—বলিপুর—যেখানে ক্ষুদ্র অহং বলি হয়।

ঘনক

● দেখছি (16.12.2020)—একটা বড় হলঘর। সেটা পাত দিয়ে অনেক গুলি কক্ষে বিভক্ত। উপরের অংশ খোলা। তাই একটা কক্ষ থেকে দেখা যাচ্ছে প্রতিটি কক্ষের মাথায় একটা করে ঘনক (Cube) ভাসছে। সেগুলো ঘুরছে। প্রতিটা ঘনক অসংখ্য পিক্সেল (pixel) দিয়ে তৈরী। আর প্রত্যেক ঘনকের একটা দিকে জয়দার ছবি রয়েছে। বাকী দিকগুলো কালো বা সেটাও ঐ pixel দিয়ে তৈরী।....

---সাগর ব্যানার্জী
বোলপুর

ব্যাখ্যা---

বড় হল ঘর—এক বৃহৎ মানবের বৈশ্বিক দেহ (Cosmic body)। যাকে সমষ্টিচৈতন্য নামে অভিহিত করা যেতে পারে। অনেকগুলি কক্ষ—অসংখ্য মানুষ। সব কক্ষে একটি করে ঘনক—প্রত্যেকের ভিতর সমষ্টিচৈতন্যের এক এক কণা ঘনীভূত চৈতন্য—অনুচৈতন্য। ঘনকের একদিকে জয়দার ছবি—সমষ্টিচৈতন্যের মূর্ত রূপ। জগৎচৈতন্য শ্রীজীবনকৃষ্ণ নিজেকে অসংখ্য পিক্সেল কণায় ছড়িয়ে দিলেন মনুষ্যজাতির মধ্যে। তাই তাকে অসংখ্য মানুষ অন্তরে দর্শন করে। বর্তমানে সমষ্টিচৈতন্য এক একজনের মধ্যে তার চৈতন্যের বহু pixel কণার ঘনীভূত রূপ তথা অনুচৈতন্য দান করছেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণকে দেখে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হোত মানুষ, Abstract equality লাভ হোত। সে যেন একের গুণ একত্ব পাওয়া, সূর্যের আলো পাওয়া। আর এ যুগে সূর্যেরই অতিক্ষুদ্র একটি কণা আমি—এই বোধ জেগে ওঠা, একের সঙ্গে একত্ব উপলব্ধির, ক্ষণিকের জন্য nearer approach to Absolute equality-র সুযোগ হচ্ছে সাধারণ মানুষের।

● গত 1.02.21 পাঠ চলছে। ঘুমিয়ে পড়েছি। স্বপ্ন দেখছি—একটা মোটা কালো বই। আমার সামনে খোলা রয়েছে ৬৯ পাতা। মনে হচ্ছে বইটা ধর্ম ও অনুভূতি। ...স্বপ্ন ভাঙলো। দেখি পাঠে প্রবাহ ২নং গ্রন্থের ৬৯ নং পাতা থেকে পড়া হচ্ছে।

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...133

ব্যাখ্যা---

দর্শন অনুভূতি সমৃদ্ধ প্রবাহ গ্রন্থটির গুরুত্ব কতখানি তা এই দর্শনে জানা গেল।

---সঞ্চিতা চ্যাটার্জী
বোলপুর

শিবের সাথে ঘর করি

● দেখছি (18.01.21)—জয়ের এক ছাত্রের বাবা টিউশন ফি দিতে এসেছে জয়কে। ওকে না পেয়ে স্যারের মা বলে আমাকে টাকাটা নিতে বলল। আমি বললাম, বেশ, দিন। টাকা দিয়ে চলে যাবার সময় দাঁড়িয়ে গিয়ে ওর স্বপ্ন বলতে লাগল। আমি শুনতে লাগলাম। পঞ্চানন শিব সম্পর্কে বলছেন। শুনতে শুনতে আমি কেমন হয়ে গেলাম। বলছি, থাক্ আর বলবেন না। আমি যে ঐ শিবের সঙ্গেই বাস করি। একসাথে থাকি। আমার শরীর কেমন হচ্ছে। তখন দেখি হাতে রাখা টাকাগুলো টাকা নয়, খবরের কাগজ কাটা। ....ঘুম ভাঙলো।

---বিশাখা চ্যাটার্জী
জামবুনী

ব্যাখ্যা---

পঞ্চানন শিবকে সাধারণ মানুষও চিনতে পারছে। আর তাকে নিয়ে দর্শন অনুভূতির (টাকা) মূল্যায়ণ ধারণা হচ্ছে।

● দেখছি (Dec,2020)—একটা ঘরে পাঠ হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমি, বরুণদা, স্নেহময়দা, জয়দা, দীপদা সবাই আছি। কিন্তু কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। অথচ সবার অস্তিত্বের অনুভূতি স্পষ্ট। পাঠ শুরু হবে, পাঠের কথা খাতায় লেখা হবে। লেখার আগে হেডিং (Heading) কি লেখা হবে সেটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। কেউ বলছে পাঠ লিখন, কেউ পাঠ প্রসঙ্গ, কেউ খাতা পেন্সিল ইত্যাদি। সবাই বলছে এবং তার পিছনে কারণটাও বলছে। জয়দা বলল, তোমরা যে যা বলছ, ঠিক আছে, আমি কিন্তু বলব সম্পর্ক। মনে হচ্ছে বৈদিক ঋষিরা যেমন শ্লোকের মধ্যে সম্পর্কটাকেই লিখে রাখার

চেষ্টা করেছে সেই রকম আমাদেরও পাঠে সেই সম্পর্কটাকে লিপি-বদ্ধ করতে হবে। এই শেষ লাইনটা যেন আমাদের সবার উপলব্ধি হচ্ছে। কেউ একা বলছে না, সবাই মিলে বুঝছে। ভাষা দিয়ে অনুভূতিটা বোঝানো একটু মুশকিল।....

---শুভজিৎ মল্লিক
লণ্ডন, যুক্তরাজ্য

এনট্রপি

● গতকাল (2/4/2021) একত্ব বিষয়ে জয় যে আলোচনা করেছিল তাতে আমার বোঝার অভাবে মন অশান্ত ছিল। ব্রেনে disorder ছিল। ভোরের দিকে স্বপ্ন দেখলাম—

জয় এসেছে আমাদের বাড়িতে ওর আলোচনাটা বোঝাতে। বিশাল সুন্দর উজ্জ্বল চেহারা। ও এসে বসল। আমি ওর পাশে বসে আছি। ও কিছু বলতে যাবে তখন সমর বলল, net-এ দেখবো। আমি বললাম, না, না ওর ভিতর থেকে আসছে। আমরা কত নীচে থেকে কথা বলি। এই বলে যেই আমি ওর কোলে হাত রেখেছি অমনি আমি অসাড় হয়ে গেলাম। মনে হচ্ছে ওর প্রচণ্ড তেজ। আমি তাকিয়ে আছি ওর দিকে। দেখছি ও একটা শ্লেটের মতো কালো জিনিসের উপর লিখছে Entropy-র সমীকরণ ds=dq/T. কয়েক সেকেণ্ড পর ওর স্বাভাবিক অবস্থা হ'ল। তখন দেখি ওর পাশে রুদ্রনাথ বসে আছে। এবার আমার সাথে শঙ্খ-র বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলো। তারপর পুরোপুরি ঘুম ভাঙার আগে আমার মনে হ'ল—এই তো জ্ঞান। তারপর ঘুম ভাঙল। এরপর মন পুরোপুরি শান্ত হয়ে গেছে।

---অমরেশ চ্যাটার্জী
ইলামবাজার

ব্যাখ্যা---

জয়—নির্গুণের ঘনমূর্তি—নির্গুণের তেজ জাগরণের উৎস।

Entropy is the measure of disorder caused for thermal energy per unit temperature that is unavailable for a useful work। এনট্রপি হল একটি দরকারী কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় তাপশক্তির

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...135

অভাব মেটাতে কোন বস্তুর মধ্যে যে পরিমাণ আণবিক পরিবর্তন ঘটে (disorder) তার পরিমাপ।। দেহ অসাড়—দেহ যেন তখন শুষ্ক কাঠ। যে কাঠে আগুন লেগে প্রয়োজনীয় তাপশক্তি জাগে ও ভাত রাঁধা হয়। সেই ভাত খেয়ে শান্তি ও তৃপ্তি হয় অর্থাৎ নির্গুণ থেকে প্রচণ্ড আত্মিক তেজ জাগে ও দেহের (ব্রেনের) আণবিক পরিবর্তনে একজ্ঞান ধারণা হয়। কাঠ ছাই হয়ে যায়। রুদ্রনাথ—শিব—একজ্ঞান মূর্ত হয়ে ওঠে—বোধে বোধ হয়।

সত্য দৃষ্টি

● আজ (15.02.2021) ভোর রাতে স্বপ্ন দেখছি—আমরা পাঠের লোকজনেরা কোন একটি সমুদ্রে বেড়াতে গেছি। মনে হচ্ছে যেন পুরী। আমরা বাসে করে ফিরছি। বাসের মধ্যে আমি, বরুণকাকু, স্নেহময় মামা, ভাই, শোভন, বাদশা সকলকেই যেন দেখছি। হঠাৎ করে পিছন থেকে একটি লোক, যাকে দেখতে পাচ্ছি না, সে যেন বলছে, শুনেছ, জয় সমুদ্রে লীন হয়ে গিয়েছে। আগে দু'বার ও সমুদ্রকে জেনে সমুদ্রে লীন হতে গিয়েছিল কিন্তু তখন হয়নি। এবার সমুদ্রে লীন হয়ে গিয়েছে। একথা শুনে স্নেহময় মামা আক্ষেপের সুরে বলল, এবার কী হবে? এই বলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আমার অত্যন্ত খারাপ লাগছে। আমি বেশ জোরে জোরেই কাঁদছি। এবার যেন ঘুমটা ভাঙবে কিন্তু তখনও স্বপ্নের মধ্যেই আমি রয়েছি। আমার মনে হচ্ছে জয়-ই তো সেই সমুদ্র। আমি মুখে বলছি সমুদ্র কিন্তু মনে হচ্ছে ওটাই আসলে নির্গুণ। একই সঙ্গে আমার মনে হচ্ছে জয়-ই নির্গুণ Personified.

---রামরঞ্জন চ্যাটার্জী
চারুপল্লী

● দেখছি—একজন যেন হাত বাড়িয়ে দেখাচ্ছে। শুধু তার হাতটা দেখতে পাচ্ছি। বলছে, দ্যাখ, জীবনকৃষ্ণ আসছে। তখন আমি জীবনকৃষ্ণের দিকে তাকিয়েছি। উনি বললেন চিন্তা করিস না। মৃত্যুর পর তুই আমার চোখ দিয়েই দেখবি। তখন দেখছি—আমার মরবার সময় হয়ে গেছে। আমি মরে গেলাম। কিন্তু চোখ বন্ধ হয়নি। দৃষ্টিশক্তি রয়েছে। আস্তে আস্তে আমার দৃষ্টি উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। তারপর নীচের দিকে তাকিয়ে দেখছি,

আমার দেহটা বিছানায় পড়ে আছে। আর মনে হচ্ছে—আমি যে এই চোখ দিয়ে জগৎটা দেখছি এটা জীবনকৃষ্ণের চোখ।.....

---অর্পিতা সাহা (সখের বাজার)

ব্যাখ্যা---শ্রী জীবনকৃষ্ণের সঙ্গে একত্ব লাভ হলে জীবন্মুক্ত হয়ে জগতের সত্যরূপ দর্শন হয় (সত্যদৃষ্টি লাভ করে)। একজন—নির্গুণ। মৃত্যু—অহংনাশ।

পরিচালক স্বয়ং

● দেখছি (9.12.2020)—আমি ও স্নেহময়দা একটা জায়গায় বসে আছি। ওপরে কালো আকাশ। যেন রাত্রিবেলা। হঠাৎ দেখি কালো আকাশে একফালি চৌকো ফাঁক। যেন একটি জানলা খোলা হয়েছে। সেখানে একটি বিন্দু মতন আলো দেখা যাচ্ছে। চোখের দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। ঐ আলোর দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে বুঝলাম আমরা আসলে যেটিকে আকাশ ভাবছিলাম সেটি আকাশ নয়, যেন একটা প্রকাণ্ড dome (যেমন অডিটোরিয়াম) তার ওপরেও ঘর আছে। আর ঐ লাল আলোটা সিগারেটের আলো। কেউ জানলার মতো একটি অংশ খুলে সিগারেট খাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর লোকটি ঐ সিগারেটের শেষ অংশটি ওপর থেকে ফেলে দিলো, আমি দেখছি সেটা ওপর থেকে পড়ছে।

পরের দৃশ্যে দেখছি—স্বনাম ধন্য পরিচালক সৃজিত মুখার্জী আমাকে একটি স্ক্রিপ্ট দিয়েছেন। একটি পার্ট (যেমন শ্রুতিনাটকে) আমাকে পড়তে হবে। লালমোহন গাঙ্গুলীর পার্টটা যিনি পড়বেন তাকে বাদ দিয়ে সৃজিত বাবু নিজেই সেটি পড়বেন। আমি সৃজিতবাবুকে বলছি, আচ্ছা যিনি লালমোহন বাবুর পার্টটা পড়বেন তার গলার Voice আমাদের সঙ্গে Synchronise করবে না বলে আপনি তাকে বাদ দিয়ে নিজেই পড়বেন? যাতে পুরোটাই Synchronised হয়? সৃজিত বাবু বলছেন, একদম ঠিক বলেছ। তারপর দেখছি আমি সৃজিত বাবু ও আমার সেলফি নেবার চেষ্টা করছি কিন্তু ছবির মধ্যে অন্য দৃশ্য ঢুকে যাচ্ছে। ভালো সেলফি নেওয়া গেল না। কিছু একটা তোলা হ'ল। আমি সৃজিতবাবুকে বলছি, আপনি ইতালি গেলে আমাকে ফোন করে দেবেন। আমি তো মাঝে মাঝে ওখানে যাই, আপনার কাছে চলে আসবো।।....

---সৌম্যদীপ সেন
নিউ আলিপুর

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...137

ব্যাখ্যা---

নির্গুণের ঘনমূর্তি যিনি তিনি তার নেশা এবার সঞ্চারিত করবেন জগতের মানুষের মধ্যে। নেশা—আত্মিকে সকলে এক হোক-এই আকাঙ্খা। পরিচালক নিজে অভিনয় করবেন যাতে Voice synchronise হয়—আধ্যাত্মিক চর্চা যেন একসুরে হয়, সকলের ভাবনা চিন্তার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে। পরিচালক—সমষ্টিচৈতন্য—নির্গুণের ঘনমূর্তি। সেলফি নেওয়া—এক হতে চাওয়া। অন্য দৃশ্য ঢুকে পড়ছে—মন বহির্মুখী হয়ে যাচ্ছে। সৃজিত বাবু—যিনি ধর্মজগতে নতুন ধারণা (Concept)-র জন্ম দেবেন।

কাপড় কাচা

● স্বপ্নে ভাবছি (4.4.2021)—আমাদের ক্ষেত্রে কিভাবে নিজের ক্ষুদ্র আমি ছাড়িয়ে বৃহৎ আমিতে মিলাবো, অখণ্ড চৈতন্যকে অদ্বৈতবোধে আপন সত্তা বলে উপলব্ধি করবো? এই ভাবতে ভাবতে টেলিফোন বেজে উঠল। আমি স্কুলে প্রায় ২৯ বছর চাকরী করেছি, সেখান থেকে ফোন। আমার জায়গায় যে মেয়েটি কাজ করছিল হঠাৎ কোন ব্যক্তিগত কারণে সে ছেড়ে দিয়েছে। আমাকে ওরা খুব অনুরোধ করল যে একটা টার্ম (term) যেন আমি আবার জয়েন (Join) করি।

পরের দিন তৈরী হয়ে স্কুলে গেলাম। ওখানে শুনলাম প্রবীণ বলে একটা লোক যে সহায়ক কর্মী (auxiliary staff) মারা গেছে। এবার টিফিন টাইমে আমার এক সহকর্মীর সঙ্গে কথা বলে ফিরছি। প্রিন্সিপাল ওনার ঘর থেকে ডাকলো। আমি ওনার ঘরে ঢুকে গুড মর্নিং বলে ওনার দিকে তাকাতেই ঘাবড়ে গেলাম। দেখছি একদম আমার মতো দেখতে—একই রকম চশমা, একই ঘড়ি, প্যান্ট ও শার্ট। আমি ধাতস্থ হতে হতেই উনি বললেন, You are looking graceful and confident. আমি বললাম, আপনার জন্যই হয়েছে। উনি দাঁড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করতেই মনে হল দৈহিক সংশ্রব (Physical touch) নেই, আমি কোথায় হারিয়ে গেলাম। .....ঘুম ভাঙল। বুঝলাম অনুভূতি দিয়ে আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন নির্গুণ ব্রহ্ম তথা সমষ্টিচৈতন্য।

---সুস্মিতা সিনহা
দুবাই, UAE

ব্যাখ্যা—

প্রবীণ—পুরোন ঈশ্বরীয় ধ্যান ধারণা। প্রিন্সিপাল—সমষ্টিচৈতন্য। আবার জয়েন করা—নতুন করে চর্চা করতে হবে, তবে ধারণা হবে যে সমষ্টিচৈতন্য আমার বৃহৎসত্তা। Looking graceful and confident—অনুচৈতন্য লাভ হয়েছে তাই।

● দেখছি (12.04.2021)—আমাকে যেন কেউ কাপড় কাচার মতো ওয়াশ (Wash) করছে। তারপর নিংড়ে দিল। এবার তারে মেলে দেবে। তখন দেখছি একটা তারে বেশ বড়ো একটা কাপড় কেউ মিলল। ভালো করে তাকিয়ে দেখি ঐ তারে আরও অনেক ছোট ছোট কাপড় মেলা।.....

---কৃষ্ণা ব্যানার্জী

বোলপুর

ব্যাখ্যা—কাপড়-দেহ-মন। 'মন যেন ধোপা ঘরের কাপড়, যে রঙে ছোপাবে, সেই রঙ হয়ে যাবে।' তারে মেলা—এক সূত্রে গ্রথিত। বড় কাপড়—অখণ্ড মন। কাচা—অনুশীলন। কেউ একজন—নির্গুণ ব্রহ্ম।

সমুদ্রের পাড়

● দেখছি (28.03.2021)—মাতৃগর্ভে একটি শিশুর মুখটি বাদে সারা শরীর সাদা কাপড়ে ঢাকা। একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছি। খুব সুন্দর দেখতে। যখনই আমি অন্যদিকে তাকাচ্ছি তখনই ও কেঁদে উঠছে। বললাম, কাঁদছ কেন? ও বলল, চুপ চুপ। আমি এখন ভগবান দর্শন করছি। খুব অবাক হলাম। দৃশ্য বদলে গেল।

একজন অজানা লোক এসে আমাকে উল্টে দিল। হাত ও পা ভাঁজ করে মাথা নিচের দিকে করে দিল ঠিক যেমনভাবে মাতৃগর্ভে শিশু থাকে। একটু পর বোন এসে বলল, তুই এভাবে আছিস কেন? আমি বললাম, চুপ চুপ, আমি এখন ভগবান দর্শন করছি। অথচ কিছু দেখছি না। ও অবাক হয়ে চলে গেল। অনেক পরে ওকে আবার ডেকে বললাম, আমাকে সোজা

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...139

করে দে তো। ও যখন হাত পা সোজা করছে মনে হচ্ছে সব অসাড় হয়ে গেছে।....

---তাপসী মণ্ডল

বেহালা ১৪ নং

ব্যাখ্যা---

শিশু—দ্রষ্টার অনুচৈতন্য। যেন জীবনকৃষ্ণ দৃষ্ট বাবুর শৈশব দশা। ভগবান দর্শন করছি—ঈশ্বরীয় কথা ও দর্শন অনুভূতি মনন করছি। অন্যদিকে তাকালেই কান্না—অনন্যমন হয়ে মনন করতে বলছে। বোন-সংসার।

● দেখছি (9.03.2021)—সামনে সমুদ্র। একটা চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছি। একজন কম বয়সী লোক সঙ্গে রয়েছে। দেখছি—দুটো হাতি সমুদ্রে নেমে পাড় বাঁধাচ্ছে। ভাবছি লোকে পুকুরের পাড় বাঁধায়, এখন দেখছি সমুদ্রেরও পাড় বাঁধানো হয়। হাতি দুটোর গা খুব পরিষ্কার। দেখে এতো ভালো লাগছে যে আদর করতে ইচ্ছা করছে।

---সান্ত্বনা চ্যাটার্জী

বেলঘরিয়া

ব্যাখ্যা---

হাতি—মন। দুটি হাতি—দ্বন্দ্বমূলক অধ্যাত্মবাদ। কম বয়সী লোক—সমষ্টিচৈতন্যের ব্যক্তি রূপ। সমুদ্র—চতুর্থ হালদার পুকুর, আর পুকুর নয় যেন সমুদ্র। সমুদ্রের পাড় বাঁধানো—সমষ্টির ধর্মের প্রমাণ ফোটা ও দ্বান্দ্বিক চিন্তা ও মননের মাধ্যমে দর্শন অনুভূতির ব্যবহারিক দিকটি (Practical aspect) উপলব্ধি ও আচরণগত ব্যবহারিক জীবনের পরিবর্তন।

জাম

● দেখছি (8.01.2021)—বাসে করে একটা জায়গায় গেলাম। সেখানে একটা ঘরে বাচ্চার কান্না শুনে বলছি, আহা কী হয়েছে, কাঁদছো কেন সোনা। ঘরের দরজা খুলতেই দেখি একজন বিরাট মানুষ শুয়ে আছে পাশে আর একজন আছে। সেই লম্বা মানুষটি বলল, তুমি আর সময় পেলে না?

এই সময়ে এলে? ওনার গায়ে কাপড় নেই। উনি নারী বা পুরুষ নন। আমি ভয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। বলছি—এ বাড়িতে আমি থাকবো না বাবা! তখন ঐ ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে আমাকে আদর করে ডেকে নিয়ে গেলেন। ওনাকে দেখতে ঠিক জীবনকৃষ্ণের মতো।

---আদরিণী চ্যাটার্জী
ইলামবাজার

ব্যাখ্যা---

বাচ্চা—দ্রষ্টার অনুচৈতন্য। এই অনুচৈতন্য জেগেছে বলেই সময় হয়েছে নিরাবরণ জীবনকৃষ্ণকে অর্থাৎ জগৎচৈতন্যকে জানার।

● স্বপ্নে দেখছি (20.01.21)—শ্রীজীবনকৃষ্ণ আমাকে পড়াচ্ছেন। ওনার মাথাটা ভীষণ বড়ো কিন্তু শরীরটা বাচ্চাদের মতো ছোট। সারা শরীরে ছোট ছোট জাম সেঁটে আছে।.....

---স্নেহা রায়
সখের বাজার

ব্যাখ্যা---

মাথাটা ভীষণ বড়—জগৎচৈতন্য শ্রীজীবনকৃষ্ণ সমষ্টিচৈতন্য হয়ে উঠেছেন। তার Brain faculty হয়েছে। এর দ্বারা তিনি মনুষ্যজাতিকে তার ইচ্ছামতো আত্মিকে নিয়ন্ত্রণ করবেন ও শিক্ষা দেবেন। জাম—কৃষ্ণফল—অনুচৈতন্য। বহু মানুষ তার অনুচৈতন্য লাভ করে তার অঙ্গীভূত হয়ে তার লীলা অনুধাবন করবে।

● দেখছি (13.02.2021)—মশারীর ভিতর শুয়ে আছি। বিড়ালটা পাশের ঘর থেকে চলে এল এ ঘরে। মশারীর ভিতর একটা সাপ, বিষাক্ত নয়-সেটা উপর দিকে উঠছে। বিড়ালটা তা দেখছে। হঠাৎ সাপটা আমার মাথার দিকে সরে এল। তারপর পড়ে গেল। আমি ধড়মড় করে উঠে খুঁজে দেখতে গেলাম। কিন্তু দেখতে পেলাম না। ...ঘুম ভাঙল।

---জয়কৃষ্ণ চ্যাটার্জী
জামবুনী, বোলপুর

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...141

ব্যাখ্যা---

বিড়াল—অনুচৈতন্যলাভকারী মানুষের জগৎ। সাপটি বিষাক্ত নয়—আত্মিক চৈতন্য Perpetual positive।

মহাকালী

● দেখছি (মার্চ,2021)—শ্রীজীবনকৃষ্ণ বর বেশে বসে আছেন। গলায় রজনী গন্ধার গোড়ের মালা। বিশাল আকৃতির মালা। উনি পেটের কাছে মালাটার বাড়তি অংশ জড়ো করে ধরে রেখেছেন। আমরা অনেকে ওনার সাথে দেখা করে মাথা নীচু করে নমস্কার করছি। হঠাৎ উনি মালাটা ছড়িয়ে দিলেন। ...আমাদের সবার গলায় ওটা পড়ল। তখন দেখি জবা ফুলের মালা ওটি।...

---রেনু মুখার্জী
সখের বাজার

ব্যাখ্যা---

রজনীগন্ধার মালা—দুঃখের রজনী দূর করে ভক্তের জীবন তিনি ফুলের মতো গড়ে তোলেন। তিনি বর—স্বামী বা অবলম্বন। জবাফুলের মালা—বহুত্বে একত্ব লাভ হলে মহাকালীর প্রকাশ ঘটে। নৃমুণ্ডমালিনী মহাকালী যেন এক আত্মিক সত্ত্বায় বহুর অস্তিত্ব মাত্র হয়ে বিরাজ করা।

● দেখছি (1.04.2021)—বোলপুরে জয় কাকার বাড়ির সামনে এক সাধু যজ্ঞ করছে। জয় কাকা বাড়িতে ছিল না। বাড়ি ফিরে ঐ সব দেখে বলল, এখানে কেন যজ্ঞ হচ্ছে? আমি এসব মানি না। এক বালতি জল ঢেলে দিল যজ্ঞের আগুনে। সাধুটা রেগে বলল, দেখবে তোমার কী হয়। জয় কাকা বলল, কিছুই হবে না। আমার সঙ্গে রামকৃষ্ণ ও জীবনকৃষ্ণ আছে। সাধুটা বলল, ও তোমার কথার কথা। তাই কি হয়? তখন দেখি জয় কাকার শরীরের বাঁ দিকটা রামকৃষ্ণ, ডান-দিকটা জীবনকৃষ্ণ, আর মাঝখানটা নিজের। অর্থাৎ জয় কাকার। কী অপূর্ব যে লাগছিল দেখতে কী বলবো!

---শ্রাবন্তী রায়
ইলামবাজার

ব্যাখ্যা---

ভ্রান্ত ধর্মভাবনার বশবর্তী হয়ে মানুষ নানা বৈধীকর্ম (যজ্ঞ) করছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীজীবনকৃষ্ণের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত চৈতন্যের উত্তরাধিকার লাভে এ যুগে পূর্ণ সত্য প্রকাশ পাচ্ছে, ধর্ম জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

● দেখছি (13.02.2021)—পাঠে জয়ের কথা শুনছি। কথাগুলো আমার দেহে আছড়ে পড়ে চামড়া পুড়িয়ে দিচ্ছে। বুকের মধ্যে একটা গর্ত হয়ে গেল। ভিতরে দেখা গেল একটা সমুদ্র। তাতে ছোট ছোট ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছে। মনে হল সমুদ্রটা জয় আর আমি সেই সমুদ্রের একটা ঢেউ। সমুদ্র বক্ষে ঢেউ হয়ে খেলা করছি—সমুদ্রের শীতল জলে আছাড় খেয়ে বারবার গা ভিজিয়ে নিচ্ছি।....

---স্নেহময় গাঙ্গুলী
বোলপুর

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...143

পাঠ প্রসঙ্গে

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...145

পাঠ প্রসঙ্গে

পাঠ ও আলোচনা প্রসঙ্গে যে সব নতুন ভাবনা উঠে আসে তারই কিছু কিছু সংকলিত হল এই অধ্যায়ে।

১. “**বিশ্বাস হলেই সব হয়ে গেল....।**” ....শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলেছেন, ওরে এসব কথা যারা বলে তাদের brain টা blunt (ভোঁতা)। They can not probe the thing. তারা কিছু গভীরভাবে অনুসন্ধান করে না। অন্যের কথা চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করেছে। যার ঈশ্বরীয় দর্শন অনুভূতি হয়, সে অনুভূতিমূলক ধর্মের কথা শোনার পরও যদি মনন না করে, স্বেচ্ছায় বহির্মুখী থাকে, তার ব্রেন ভোঁতা (blunt)।

কোন কাজ আমার দ্বারা সম্পন্ন না হয়ে অন্যের দ্বারা সম্পন্ন হলে তখন তা বিশ্বাস করার প্রশ্ন আসে। কিন্তু আমি নিজে যে কাজ করেছি সেটা বিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠে না। যা আমার অঙ্গীভূত তাকে বিশ্বাস করা বা না করার কথাও ওঠে না। যেমন কেউ যদি প্রশ্ন করে, আপনার যে ডান হাত আছে, এটা আপনি বিশ্বাস করেন? প্রশ্নটা অবান্তর বলে মনে হচ্ছে আপাত দৃষ্টিতে। প্রশ্নটার ভিতরেই উত্তরটা লুকিয়ে আছে। ওটা যে আমারই ডান হাত।

আমি যখন কিছু সত্য বলে উপলব্ধি করব তখন এই বিশ্বাসের কথাটা খাটবে না। আমরা যখন কোন কথা, কারুর মুখ থেকে শোনা কথা, বিশ্বাস করছি বা করছি না তখন বুঝতে হবে বিষয়টা আত্তীকরণ করিনি। যতক্ষণ না পর্যন্ত কোন ধর্মকথা আমরা internalise করতে পারছি, বোধে বোধ করছি, ততক্ষণ তা বিশ্বাসের প্রশ্ন থেকে যায়, অর্থাৎ কেউ বিশ্বাস করে আবার কেউ করে না। আত্তীকরণ হলে বিশ্বাস কথাটা খাটবে না।

২. **মহামায়া মুগ্ধ করে** .....শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

এই মহামায়া বলতে মানুষ সাধারণত কালীকে বোঝে। কিন্তু যার দেহে পূর্ণ যোগ হয়েছে তিনি উপলব্ধি করেন যে মহামায়া হল তার দেহটি। দেহ ষোল আনা অনুকূল হওয়ায় তিনি ভগবান দর্শন করেছেন। তার Brain

faculty হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে মনই সব। মনই মানুষকে চঞ্চল করে ও বাইরের দিকে ঠেলে দেয়। তাই তাদের ক্ষেত্রে মহামায়া হল মন। সমষ্টির নিরিখে মনই দেহ।

তাহলে দেহ যোগযুক্ত হলে দেহজ্ঞান চলে যায় একথার মানে—স্থূল মন পরিবর্তিত হয়ে যায় সূক্ষ্ম মনে। এই সূক্ষ্ম মনে ঈশ্বরীয় চিন্তা করা যায়, ঈশ্বরতত্ত্ব ধারণা করা যায়।

স্থূল মনে শুধু বাহ্যিক চিন্তা ভাবনা করা যায়। সূক্ষ্ম মনে ঈশ্বরীয় চিন্তা ভাবনা করা যায় আর তার effect পড়ে কারণ শরীরে। বস্তুতত্ত্বের সাধন যাদের তাদের সূক্ষ্মমন অত্যন্ত শক্তিশালী। সেই সূক্ষ্ম মনে ঈশ্বরীয় চিন্তার effect, তাদের স্থূল দেহে পড়ে। যেমন স্থূলে কুণ্ডলিনী জাগরণ, টাকা ছুঁলে হাত বেঁকে যাওয়া, নারী কাছে এলে চোখে জাল পড়া ইত্যাদি। স্থূলমনের অস্তিত্বই আর থাকে না। সাধারণ মানুষের মন কখনও স্থূলমন কখনও সূক্ষ্ম মন হয়। ওঠা নামা (flactuate) করে।

দেহ দিয়ে ঈশ্বর তত্ত্ব বোঝা মানে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে সূক্ষ্মমন দিয়ে বোঝা। বস্তুতত্ত্বে সাধন যার সম্পূর্ণ হয়েছে তার মন স্থায়ীভাবে অতিসূক্ষ্ম মনে পরিবর্তিত হয়ে যায় যা অত্যন্ত শক্তিশালী। তিনি স্থূল, সূক্ষ্ম ও অতি সূক্ষ্ম মনের পার্থক্য ও ক্রিয়া বুঝতে পারেন। তার দেহে চৈতন্যের মূর্ত প্রকাশ (embodiment) ঘটে। তিনি স্পষ্টভাবে ধারণা করেন ঈশ্বর তত্ত্ব ও জগতের মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে এই সত্য জানাতে পারেন নিজস্ব ঢঙে।

কিন্তু তার স্থূল দেহ তো আছে তাই তাকে দেহবান ব্রহ্ম বলা যায়। সাধারণ মানুষের মন ঐ স্তরে যেতে পারে ক্ষণিকের জন্য, তুরীয় অবস্থায়। বেশিক্ষণ ঐ অবস্থা তাদের দেহ সহ্য করতে পারে না। দেহ টুটে যায়। তাই তারা দেহবান ব্রহ্মের ব্রহ্মত্বের এক কণা আস্বাদন করতে পারে।

স্থূল মনে ঈশ্বরীয় কথায় interest পাওয়া যায় না। কারণ তা সূক্ষ্ম মনে পরিবর্তিত হয় নি। কিন্তু বার বার ঈশ্বরীয় কথা শুনতে থাকলে এ বিষয়ে ভালোবাসা জন্মাতে পারে, তখন সূক্ষ্মমন লাভ হয় ও আপনা হতে আত্মিক উন্নতি তথা ধারণাশক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। স্থূল মনের বিভ্রান্তি সৃষ্টির ক্রিয়া তথা মায়ার ক্রিয়া থেকে মুক্ত হয়ে শান্ত হয়। স্থূল মনের সূক্ষ্ম মনে পরিবর্তন না হতেই জোর করে ঈশ্বরের প্রকাশ ঘটলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...147

ঘটে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, ‘‘বিষ্ঠার পোকা বিষ্ঠায় ভালো থাকে ভাতের হাঁড়িতে রাখলে হেদিয়ে হেদিয়ে মরে যাবে।’’

দেহ দিয়ে সত্য উপলব্ধি মানে স্থূল দেহ দিয়ে নয়, মন দিয়ে উপলব্ধি, মনের পরিবর্তন। দেহ দিয়ে ঠাণ্ডা, গরম, আরাম, ইত্যাদি অনুভব করলেও মানসিকতার পরিবর্তন হয় না। তাই মায়ামুক্তি মানে যে যোগের মাধ্যমে দেহের পরিবর্তন তা বস্তুত মনের পরিবর্তনকেই বোঝায়, স্থূল থেকে সূক্ষ্ম এবং মাঝে মাঝে অতি সূক্ষ্ম মনে পরিবর্তন।

৩. যদি আমার এক ঘটি জলে তৃষ্ণা যায় পুকুরে কত জল আছে এ মাপবার আমার কী দরকার? আমি আধ বোতল মদে মাতাল হয়ে যাই, শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে এ হিসাবে আমার কি দরকার? অনন্তকে জানার দরকারই বা কী?.... (কথামৃত ১/৩/৫)

আধ বোতল মদে মাতাল হওয়া—ষষ্ঠভূমিতে ইষ্টমূর্তি তথা সগুণ ব্রহ্মের সাকার রূপ দর্শনে তৃপ্ত হওয়া। যেমন হনুমান রাম রূপ ভালোবাসে। ঐ রূপ ছাড়া সে অন্য কোন ঈশ্বরীয় রূপ দেখতে চায় না। তাই বলা হয়েছে দ্বাপরে হনুমানের সন্তুষ্টির জন্য শ্রীকৃষ্ণ রামরূপ ধারণ করেছিলেন। অবতারের রূপ দর্শনেই সে তৃপ্ত।

এক ঘটি জলে তৃষ্ণা যাওয়া — উঁচু সাকার ঘর যার তিনি ঈশ্বরীয় বহুবিধ রূপ দর্শনে তৃপ্ত হন। রাম,কৃষ্ণ,শিব, কালী, রামকৃষ্ণ ইত্যাদি সব রূপ দর্শন করে ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করে তৃপ্ত হন। তবে পূর্ণ তৃপ্তি ঘটে একজন মানুষকে ভগবান বা ব্রহ্মরূপে অন্তরে দর্শন করে। এই হ'ল ঠিক ঠিক এক ঘটি জলপান করে তৃপ্ত হওয়া।

অনন্তকে জানা মানে নির্গুণকে জানা। ঠাকুর বললেন, অনন্তকে জানার দরকার কি? অর্থাৎ দরকার নেই। সে যুগে অনন্তকে, নির্গুণকে জানা বা জানানো সম্ভব ছিল না। প্রথম নির্গুণকে জানলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। তিনি অনন্ত হলেন, কিন্তু তিনি সগুণ পূর্ণব্রহ্মরূপে মানুষের অন্তরে পরিস্ফুট হতে লাগলেন।

এ যুগে নির্গুণের ঘনমূর্তিরূপে সমষ্টিচৈতন্যকে ভিতরে দেখে মানুষের অনুচৈতন্য লাভ হচ্ছে। এই অনুচৈতন্য অনন্তের ক্ষুদ্র রূপ, নির্গুণ তথা সমষ্টিচৈতন্যের ক্ষুদ্রতম একক যেন। তাকে পেয়ে অনন্তকে জানার সূচনা হয়। পরে ক্ষুদ্র আমি নাশ হয়ে সমষ্টিচৈতন্যের সাথে একত্ব উপলব্ধি হলে

নিজের বৃহৎ সত্তা, অনন্ত সত্তার পরিচয় লাভ হতে থাকে। অনন্তকে তথা নির্গুণকে সম্পূর্ণ জানা কখনোই হয়ে ওঠে না।

৪. জমিদার নাবালক পুত্র রেখে মারা গেলে অছি সেই নাবালকের ভার লয়।

ব্যষ্টি ঃ জমিদার—স্থূল অহং। নাবালক—বালকের আমি। পরমহংস অবস্থা। অছি—ভগবান।

সমষ্টি ঃ জমিদার—স্থূল অহং। অছি অর্থাৎ ভগবান, সমষ্টিচৈতন্যরূপে যার প্রকাশ। তিনি অনুচৈতন্য দান করেন। এই অনুচৈতন্য লাভ হলে জমিদার অর্থাৎ স্থূল অহং মুমূর্ষু হয় ও বালকবৎ আমি জন্ম নেয়। অবশেষে সমষ্টিচৈতন্যের সঙ্গে একত্ব লাভ হলে স্থূল অহং মারা যায় ও 'বালকের আমি'র পুরো দায়িত্ব নেন অছি অর্থাৎ সমষ্টিচৈতন্য।

একত্বলাভের পর মননশক্তি বৃদ্ধি পায়, অদ্বৈতজ্ঞান লাভ হয়। জমিদার পুত্র আর নাবালক থাকে না। সাবালক হয়। উপলব্ধি করে অছি অর্থাৎ সমষ্টিচৈতন্যের সঙ্গে সে ওতপ্রোত। তার পৃথক সত্তা নেই। সে সমষ্টি চৈতন্যের মহিমা প্রকাশের এক ক্ষুদ্র মাধ্যম মাত্র।

৫. জীব চার প্রকার, বদ্ধ জীব, মুমুক্ষু জীব, মুক্ত জীব, ও নিত্যজীব। .....শ্রীরামকৃষ্ণ।

বদ্ধ জীব ঃ যাদের ঈশ্বরের কথা শুনতে ভালো লাগে না। এরা ঈশ্বরীয় কথা হলে সেখান থেকে উঠে যায়। বিষ্ঠার পোকা বিষ্ঠায় ভালো থাকে, ভাতের হাঁড়িতে রাখলে হেদিয়ে হেদিয়ে মরে যায়।

মুমুক্ষু জীব ঃ যাদের ঈশ্বরীয় কথা শুনতে ভালো লাগে, আনন্দ হয়। একলা একলা ঈশ্বরের জন্য কাঁদে। কিছু কিছু ঈশ্বরীয় দর্শনও হয়। বিধিবাদীয় ধর্ম নিষ্ঠা সহকারে করে।

মুক্ত জীব ঃ যাদের ভগবান দর্শন হয়। তারা দর্শন অনুভূতির গুরুত্ব বোঝে, দর্শনের মর্মার্থ ভেদ করতে সক্ষম হন। ঈশ্বরীয় কথায় দেহ সাড়া দেয়, ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়, যেন মৌমাছি হয়ে মধুপান করেন। মৌমাছি কেবল ফুলের উপর বসে মধুপান করে। মুক্ত জীব সংসারে থেকেও সর্বদা ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকেন।

নিত্য জীব ঃ ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত মানুষ। যিনি সর্বজনীন ও সর্বকালীন হয়ে যান। যাকে জাতিধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষ অন্তরে দর্শন করে।

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...149

সাধারণ মানুষ এই নিত্যজীবের অনুচৈতন্য সত্তা লাভ করলে তার সাথে আত্মিক একত্ব লাভ করতে পারে ও আত্মার নিত্যতার পরিচয় পায়। একত্ব লাভের মুহূর্তটিতে তিনি যেন নিত্যজীব হয়ে যান। যদিও সাধারণ মানুষের মন আবার নেমে আসে ও তখন তিনি মুক্ত জীবের জীবন যাপন করতে পারেন।

বস্তুতত্ত্বের সাধনে যিনি নিত্যজীব হয়ে ওঠেন, তিনি যেন অনন্ত অসীম, আর তার সঙ্গে আত্মিকে এক হয়ে যারা জীবসীমা অতিক্রম করে অসীমের গুণ প্রাপ্ত হন তারা যেন অনন্ত অসীমের মধ্যে সীমায়িত অসীম সত্তা। তাদের মতো বহু অসীমকে ধারণ করেন বিরাট অসীম বা নিত্যপুরুষ।

শ্রীজীবনকৃষ্ণের সঙ্গকারী ধীরেন রায় এক স্বপ্নে দেখেছিলেন, বিরাট দেহী জীবনকৃষ্ণ বসে আছেন এক মেলার গেটে। তাঁর প্রতি লোমকূপে একজন করে ছোট ছোট জীবনকৃষ্ণ বসে আছে। ঐ ছোট ছোট জীবনকৃষ্ণও অসীম। ওগুলি সাধারণ মানুষের স্বরূপ। সমষ্টির সাধনে অনুচৈতন্য লাভ করে একত্ব লাভ হলে তখন বোঝা যায়।

এ যেন মধুপোকা যে মধু খায় আবার গা থেকে মধু নিঃসৃত হয়, অর্থাৎ এক নিত্যজীবের অঙ্গীভূত হয়ে তার প্রকাশের মাধ্যম হয়ে ওঠেন।

জীব মূলত দু'রকম। বদ্ধজীব আর মুমুক্ষু জীব। মুমুক্ষু জীবের পরিবর্তন হয়। মুমুক্ষু জীবই মুক্তজীব হয়, পরে আরও পরিবর্তন ঘটলে নিত্যজীব হয়ে যান।

৬. সাঁকো ঃ মাষ্টারমশাই এক স্বপ্নে দেখলেন, সমুদ্রের উপর এক জাহাজে উনি আছেন। এক ব্রাহ্মণ জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছেন। উনি ব্রাহ্মণকে দাঁড়াতে বললেন, তার সাথে যাবেন বলে। ব্রাহ্মণটি বলল, তোমার আসতে দেরী হবে। জলের তলায় সাঁকো আছে। এই পথ দেখে রাখো। এই পথ ধরে আসতে কোনো অসুবিধা হবে না।

এই সাঁকোটি আসলে কী?

শ্রীরামকৃষ্ণ তার নিজস্ব দর্শন অনুভূতিকে ভিত্তি করে কোন্ উপলব্ধির স্তরে পৌঁছেছেন সেটা সাধারণের বোধগম্য হয়নি। নানা কথার জাল বুনে, বহু প্রকার উপমার সাহায্যে সাধারণ মানুষকে তিনি দিব্যজীবনে উত্তরণের পথ তথা সাঁকোর সন্ধান জানাতে চেয়েছিলেন। তাঁর কথার শব্দার্থ ভেদ করে মর্মার্থ জানতে না পারায় মানুষ কথামৃত রূপ বাণী সাগর পেলেও

তার তলায় শ্রীরামকৃষ্ণ রচিত সাঁকোটির খোঁজ পেল না।

পরবর্তীকালে শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেহে ব্যষ্টির সাধনের সকল রহস্য উদ্ঘাটিত হল আপনা হতে অজস্র দর্শন অনুভূতি হওয়ায়। তিনি আবিষ্কার করলেন কথামৃতের প্রতিটি কথার মর্মার্থ, সাগরের তলায় লুকিয়ে থাকা সাঁকো, এবং তা ধর্ম ও অনুভূতি গ্রন্থের মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরলেন।

তাঁর এই গুরু দায়িত্বের আভাস ফুটেছিল ছোটবেলায় তার এক স্বপ্নে। তিনি দেখলেন, একটা জায়গায় একটা বাঁশের সাঁকোর দুদিকে পা ঝুলিয়ে তিনি দোল খাচ্ছেন। হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ এসে রেগে চিৎকার করে বললেন, ওখানে বসে কী হচ্ছে? অমনি উনি লাফ দিয়ে নেমে মার ছুট।

রামকৃষ্ণ কথার মর্মার্থ জানলে ব্যষ্টির সাধনতত্ত্ব জানা যায়। এই ব্যষ্টির সাধন সব মানুষের হয় না, খুব কঠিন। পরবর্তীকালে তাঁর দেহে বিশ্বব্যাপিত্বের সাধন হ'ল। যার প্রমাণ ফুটল বহু মানুষের দর্শনে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষ তাঁকে স্বপ্নে, ধ্যানে, জাগ্রতে দর্শন করতে লাগল। তাঁর চৈতন্য জগৎব্যাপ্ত হল তারই চিন্ময় রূপ ধরে। একজন মানুষকে কেন্দ্র করে আত্মিকে সকল মানুষের এই একীকরণই প্রকৃত ধর্ম। এই ধর্মের পথটি তিনি কথার পর কথা গেঁথে স্পষ্টভাবে তুলে ধরলেন "ধর্ম ও অনুভূতি" গ্রন্থের ৩য় ভাগে। এটি বাঁশের সাঁকো নয়, মজবুত এক সেতু। এখানে তিনি উপমার সাহায্য নেননি, মানুষের দর্শন অনুভূতির উল্লেখে মূল সত্যটি বিবৃত করেছেন। ফলে শব্দারণ্যে হারিয়ে যাবার ভয় নেই, পাঠক তাঁর চিন্ময়রূপ দর্শন করে এই সেতু ধরে সংসার সমুদ্র পার হবার সুযোগ লাভ করে।

আত্মিকে তিনি পরম এক হয়ে তাঁর একত্ব বা ব্রহ্মত্ব তারই চিন্ময় রূপে মানুষকে দান করেছেন। সাধারণ মানুষ তার ক্ষণিক আস্বাদন পেলেও স্থায়ীভাবে তাদের এক বোধের জাগরণ তথা বহুত্বে একত্বের প্রতিষ্ঠা হল না। এ বিষয়ে তার কথাগুলির মর্মার্থ উপলব্ধি করা গেল না। মানুষ দ্বৈতবাদেই রয়ে গেল। সেইজন্য পরবর্তীকালে আর একটি সেতুর প্রয়োজন অনুভূত হ'ল। তবে তাকে সেতু না বলে Overbridge বলা ভালো।

আজকের দিনে বিশ্বব্যাপীচৈতন্য বা জগৎচৈতন্য জীবনকৃষ্ণকে নয়, সমষ্টিচৈতন্য রূপে বা নির্গুণের ঘনমূর্তিরূপে তাঁকে অন্তরে দেখে তাঁর অনুসত্তা লাভ হচ্ছে মানুষের। এই অনুচৈতন্যের ইঙ্গিতে একত্ব বোধ দান

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...151

কারী দর্শন অনুভূতি সমূহ অবলম্বন করে মানুষ জগৎ চৈতন্য জীবনকৃষ্ণের সব কথার মর্মার্থ অনুভব করতে করতে একবোধ লাভ তথা পূর্ণ মুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। এই ওভারব্রীজে একসঙ্গে বহু মানুষ উঠতে পারছে, সমষ্টির ধর্ম তথা সাধারণের ধর্ম হচ্ছে, যদিও এই ব্রীজের অপর প্রান্ত এখনও কিছুটা কুয়াশায় ঢাকা, আগামী দিনে সমষ্টি চৈতন্যরূপী জীবনকৃষ্ণকে জেনে ও তার মৌলিক চিন্তা হৃদয়ঙ্গম করে তা স্পষ্টভাবে চোখে পড়বে।

৭. **জপসিদ্ধ ঃ** শ্রীরামকৃষ্ণের কথামতো নারায়ণ শাস্ত্রী একদিন কেশব সেনকে দেখে এসে বললেন যে কেশব জপসিদ্ধ আর ঠাকুরও তাতে সায় দিলেন।

প্রচলিত মতে কোন মন্ত্র অসংখ্যবার বলাকে জপ করা বলে। এতে ইষ্ট সাক্ষাৎকার পর্যন্ত হতে পারে। জপ করে ইষ্ট সাক্ষাৎকার হলে তাকে জপসিদ্ধ বলে।

উড্রফ্ সাহেবের Serpent power বইতে বলা হয়েছে অতিরিক্ত জপের ফল হল Speechlessness and immobility অর্থাৎ মানুষটা পাগল হয়ে যায়। কিন্তু ঠাকুর তো এই রকম জপ করতেন না। তিনি বলছেন, হ্যাক থু? আমি জপ করবো? অথচ তিনি জপ করতে গেলেই তাঁর সমাধি হয়ে যাচ্ছে। ঈশ্বরে লীন হয়ে যাচ্ছেন। তাহলে প্রকৃত জপসিদ্ধ তিনিই। এখন এই জপসিদ্ধ কি? আর কেশব সেন কোন অর্থে জপসিদ্ধ?

এখানে জপ বলতে একটি বিষয়কে নিয়ে বিভিন্নভাবে চিন্তা করা, মনন করাকে, Thinking and Rethinking কে বোঝায়। বারবার চিন্তন ও মনন করলে ব্রেনের চিন্তা করার ক্ষমতা (Thinking power) বাড়ে। এই Thinking and Rethinking এর মাধ্যমে চেতনার গভীরে এক বিশেষ স্তরে পৌঁছালে তাকে জপসিদ্ধ বলা যায়।

তাই ইষ্টমন্ত্র না জপ করে ও ইষ্টদর্শন না করেও জপসিদ্ধ হওয়া যায়। এই অর্থে কেশব সেন জপসিদ্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণ যদিও ব্যক্তিগত উচ্চস্তরের বহু দর্শনের মননে কেশববাবুর চেয়ে চেতনার গভীরতর স্তরে পৌঁছেছিলেন।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ ১৫ বছর বয়সে তার এক দর্শন সাপেক্ষে নিজেকে জপসিদ্ধ বলেছেন। তিনি প্রখর রোদের মধ্যে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন। তখন কোথা থেকে এক টুকরো মেঘ এসে তাকে ছায়া প্রদান করতে লাগলো যতক্ষণ না তিনি বাড়ি পৌঁছালেন। বাড়ি পৌঁছালে ঐ মেঘের টুকরো আর দেখা

গেল না। পরে বুঝেছিলেন সত্যিই বাইরে কোন মেঘ ছিল না। এটি তার দর্শন, অর্থাৎ ভিতরে দেখেছিলেন। সাধারণ মানুষ Re-think করে না বলে একে বাইরের অলৌকিক ঘটনা বলে বিবেচিত করে। এটি আসলে তার ব্রেনের স্থায়ী শান্তভাব লাভের ইঙ্গিত যাতে তিনি নিরন্তর অনুশীলন করতে পারেন।

১২ বছর ৪ মাস বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখলেন ও যাকে দেখলেন তিনি যে শ্রীরামকৃষ্ণ সেকথা জানলেন ১৫ বছর বয়সে। তখন থেকেই রামকৃষ্ণ নাম জপ হতে লাগল আপনা হতে আর তিনি রামকৃষ্ণ কথামৃত পড়তে শুরু করলেন। খুব অল্পদিনের মধ্যেই ঐ বছরেই আত্মিকের কোন বিষয় নিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে নিরন্তর মনন করার ক্ষমতা একটা পরিণত অবস্থা লাভ করে গেল। তাই দেখি তখন থেকেই তিনি নিত্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করছেন ঘন্টার পর ঘন্টা। কথামৃত পাঠ করে তা মননের মাধ্যমে চেতনার এক বিশেষ স্তরে পৌঁছে গেছেন। সেখান থেকে ধর্মজগতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও কথামৃতের অনন্যতা অনুধাবনে সমর্থ হয়েছেন।

পরবর্তীকালে দেখা গেছে তিনি কোন দেবস্বপ্ন বা আধ্যাত্মিক কথা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করছেন, বহু পরেও আবার সে বিষয়ে পুনর্চিন্তন (Re-think) করছেন অর্থাৎ চিন্তন ও পুনর্চিন্তনে তিনি সিদ্ধ হয়েছেন। জপসিদ্ধ হয়েছেন।

৮. **"জটিলে কুটিলে না থাকলে লীলা পোস্টাই হয় না।"—শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণকথামৃত।**

ব্যষ্টির সাধনে ঃ প্রথম দৃষ্টিভঙ্গী ঃ জটিল—দেহ। কুটিল—আত্মা। লীলা পোস্টাই—দেহ না থাকলে আত্মার পূর্ণ প্রকাশ হয় না।

ব্যষ্টির সাধনে ঃ দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গী ঃ জটিল—বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন মানুষ। যেমন হাজরা বাবু, তিনি শ্রী রামকৃষ্ণের কথা মানতেন না তর্ক করতেন। কুটিল—শ্রীরামকৃষ্ণ, কূটস্থ বুদ্ধি যার, যিনি অন্তর্মুখী, মন সর্বদা যোগযুক্ত। লীলা পোস্টাই—শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। সবই ব্রহ্ম। তার এই কথা নিয়ে হাজরা মশায় ও নরেন হাসি ঠাট্টা করল। বলেছিল, তাহলে ঘটিও ব্রহ্ম, বাটিও ব্রহ্ম! ঠাকুর জানতে পেরে নরেনকে কাছে ডেকে হঠাৎ তার বুকে পা তুলে দিলেন—নরেনের বোধ হল জগৎ সংসার শূন্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ভয়ে চিৎকার করে উঠে বললেন,

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...153

ওগো তুমি আমার একী করলে, আমার যে মা আছে, ভাই আছে.....। ঠাকুর পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, তবে এখন থাক। নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়—এই অবস্থা নরেনের ৩ মাস ছিল। তিনি যেন ঘোরে ছিলেন। বুঝলেন, ঠাকুরের কথা ঠাট্টার বিষয় নয়। এই উপলব্ধিই হল লীলা পোস্টাই।

ব্যষ্টির সাধনে ঃ তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গী ঃ জটিল—অবতার পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ এবং রূপকের মাধ্যমে বলা তার অনুভূতির কথা-ব্যষ্টির সাধন কথা সমৃদ্ধ গ্রন্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। কুটিল—কূটস্থ বুদ্ধি যার, শ্রীজীবনকৃষ্ণ ও তার দেওয়া কথামৃতের দেহতত্ত্বে ব্যাখ্যা—ধর্ম ও অনুভূতি গ্রন্থ। লীলা পোস্টাই—বোধগম্য না হওয়া ধর্ম ও অনুভূতির ব্যাখ্যা দর্শন অনুভূতি লাভে উপলব্ধি হওয়াই লীলা পোস্টাই হওয়া।

বিশ্বব্যাপীত্বে ঃ এক অর্থে—জটিল—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ও বিভিন্ন শ্রেণীর অসংখ্য মানুষ। কুটিল—যিনি নিজের ভিতর সমগ্র জগৎকে দেখতে পান, উপলব্ধি করেন এক তিনিই আছেন। তিনি পূর্ণ। যেমন—শ্রীজীবনকৃষ্ণ। লীলা পোস্টাই—জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বহু মানুষ তাঁকে অন্তরে দেখে। হিন্দুরা ভগবান বা ব্রহ্মরূপে, মুসলমানরা আল্লা রূপে, খ্রীষ্টানরা গড্ রূপে, আপন আপন ইষ্টরূপে বিচিত্রভাবে তাকে দর্শন করে ও সেকথা তাকে জানায়। উপলব্ধি হয় মানুষ বাইরে ভিন্ন জাতি, ভিন্ন সম্প্রদায়, ভিন্ন দেশের মানুষ হলেও আত্মিকে এক। বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন সব মানুষ তার আত্মিক একত্বের ভাবধারা গ্রহণ করে ও লীলা পোস্টাই হয়।

অন্য অর্থে—জটিল—ধর্ম ও অনুভূতির ৩য় ভাগে ও সঙ্গকারীদের কিছু দিনলিপিতে যে একত্বের কথা বলা হয়েছে। কুটিল—সমষ্টিচৈতন্য তথা নির্গুণের ঘনমূর্তি থেকে আগত ব্যাখ্যা-নতুন দৃষ্টিভঙ্গী যার কিছু আভাস ফুটছে প্রবাহ পত্রিকায়। লীলা পোস্টাই—জীবনকৃষ্ণের একত্বের কথার গভীর অর্থ উদ্ধার ও দর্শন অনুভূতি সাপেক্ষে তা উপলব্ধি করাই লীলা পোস্টাই।

সমষ্টির সাধনে ঃ জটিল—সাধারণ মানুষ, যাদের "ক্ষুদ্র আমি" বা "বজ্জাৎ আমি" প্রকট। কুটিল—সমষ্টিচৈতন্যের ঘনমূর্তি যিনি উপলব্ধি করেছেন তিনিই মনুষ্যজাতি হয়েছেন, তার আমি "বৃহৎ আমি।" লীলা পোস্টাই—সমষ্টিচৈতন্যের সঙ্গে একত্ব লাভে সাধারণ মানুষের ক্ষুদ্র আমি নাশ ও এক বৃহৎ আমির আস্বাদনে বহুত্বে একত্ব বোধের জাগরণ।

অন্য অর্থে—জটিল-সাধারণ মানুষের অনুচৈতন্য জাগরণ ও অহংনাশের প্রমাণ বহন কারী কিছু দর্শনের সংকলন। কুটিল—ঐ দর্শন সমূহের ব্যাখ্যা অনুশীলনে বহুত্বে একত্বের রূপরেখা ধীরে ধীরে ফুটে ওঠার কথা যেখানে সংকলিত হচ্ছে। লীলা পোস্টাই—বহুত্বে একত্বের বোধ জাগরণের ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগ তথা একত্ব বোধ দ্বারা পরিচালিত জীবন লাভই লীলা পোস্টাই।

৯. রাজযোগই যোগ।

যোগ মানে পরিবর্তন। হটযোগ, মন্ত্রযোগ বা ভক্তিযোগ, লয়যোগ ইত্যাদি যোগ সাধনার মাধ্যমে কি দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন তথা মনের উচ্চভূমিতে উত্তরণ ও সেখানে স্থিতিলাভ ঘটে? না, ঘটে না।

রাজযোগ না হলে মন সহস্রারে থাকতে পারে না। মন ৪র্থ ভূমিতে নেমে আসে আর সেখানেই থাকে। অবতার বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মা সাক্ষাৎকার হয়েছিল সহস্রারে কিন্তু তার মন সহস্রারে অবস্থান করতে পারে নি। তার প্রমাণ ঐ যে দুজন মাঝি ঝগড়া করতে করতে একজন অপরজনের পিঠে চড় মারলে সেই চড়ের দাগ ফুটে উঠেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের পিঠে। শরৎ মহারাজ ও মহেন্দ্রনাথ দত্ত একে বিশ্বব্যাপীত্বের আভাস বলে উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু উডরফ্ সাহেব তার Serpent power বইতে লিখেছেন; ৪র্থ ভূমিতে মন নেমে এলে এরূপ লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। তিনি নিজেও বলেছেন, মা আমার মন নীচে নাবিয়ে রেখে দিয়েছেন। শ্রী জীবনকৃষ্ণ ধর্ম ও অনুভূতি গ্রন্থে লিখছেন, এই নীচে নামিয়ে রাখা মানে এই নয় যে ৫ম ও ৬ষ্ঠ ভূমির মধ্যে বাচ খেলানো। ঠাকুরের মন ৪র্থ ভূমিতেই স্থিতিলাভ করেছিল।

মন উপরে উঠে ৬ষ্ঠ ও ৭ম ভূমির দর্শন হলেও আবার তা নেমে আসত। ৪র্থ ভূমিতে মন গেলে সূক্ষ্ম মন লাভ হয়। ঈশ্বরীয় চিন্তা ও মনন শুরু হয়। ৪র্থ ভূমিতে মন এলে চারিদিক চিন্ময় জ্যোতির্ময় দর্শন হয়। উপলব্ধি হয় জগৎ চৈতন্য ময়। এক ঈশ্বর জগৎব্যাপ্ত হয়ে আছেন। সেই জগতে আমিও আছি। তাই জগতের সকলের সাথে আমার নিবিড় যোগ আছে। ফলে বাইরের যে কোন ঘটনার প্রভাব পড়ে আমার মধ্যেও। পুকুরের কোন একটি অংশে একটা ঢিল পড়লে যেমন তা পার্শ্ববর্তী জলকেও আন্দোলিত করে।

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...155

এই যে চারিদিক জ্যোতির্ময় দেখা মানে আমারই চৈতন্য জগৎ বিস্তৃত, এই উপলব্ধি হয় মন সহস্রারে গিয়ে স্থিতি লাভ করলে।

রাজযোগ প্রসঙ্গে শ্রী জীবনকৃষ্ণ বলছেন, দেহ আর তার স্বস্বরূপকে দেখা। দেহ অর্থাৎ স্থূল মনের অবস্থায় স্বস্বরূপ বলতে সূক্ষ্ম মনে তার চিন্ময় রূপ দেখা, তখন উপলব্ধি হয় জগতের এই চিন্ময় রূপটি আমার, আমিই জগৎব্যাপ্ত চৈতন্যসত্তা। এই যে উপলব্ধি একেই বলে রাজযোগ। এটি আপনা থেকে হবে। লয়যোগ ভক্তিযোগ হল একটি সাধনা। এই সাধনা করে একটু এগোনো যায় বটে, তবে দেহেতে সূক্ষ্ম মনের গঠন সম্পূর্ণতা লাভ করে না। রাজযোগ ব্যতীত অন্য যোগগুলি এই সূক্ষ্ম মন লাভ হতে ও তার গঠন সম্পূর্ণতা পেতে অর্থাৎ দেহেতে ফুল ফুটতে সাহায্য করে না।

দেহেতে ফুল না ফুটলে ফল অর্থাৎ উপলব্ধিও ঠিকঠিক হবে না। এই কারণে রাজযোগকে ষোল আনা যোগ বলা হয়েছে। বাকীগুলো যোগই নয়। যদি ঈশ্বরীয় কথা শুনতে ভালো লাগে তাহলে ফুল ফোটা শুরু হয়ে গেল, তখন রাজযোগের ক্রিয়া।

যোগ মানে পরিবর্তন, মনের স্থায়ী পরিবর্তন। সেখান থেকে পূর্বের অবস্থায় আর ফিরে যাবে না।

রাজযোগে মন ৭ম ভূমিতে গেলে পরম জ্যোতির সমুদ্র দর্শন হয়। উপলব্ধি হয় আমার মধ্যে জগৎ তথা আমারই চেতনায় জগৎ চৈতন্যময়। ঝগড়ারত মাঝিরা আমারই সত্তা। পৃথক ব্যক্তিসত্তা তাদের নেই। তখন তার সত্তা লাভে মাঝিদেরও মনের পরিবর্তন ঘটবে। যার উদাহরণ শ্রী জীবনকৃষ্ণের জীবনে পাওয়া যায়।

একদিন তিনি ঘরে বসে রামনাম শুনছেন, হঠাৎ দর্শন করলেন জিতুকে। জিতু হয়ে গেলেন। জিতু একই সময় নিজের ঘরে বসে ঐ রামনাম স্পষ্টভাবে শুনতে পেলেন বেশ কিছুক্ষণ ধরে। জীবনকৃষ্ণের সত্তায় সত্তাবান হয়ে, আত্মিকে এক হয়ে গিয়ে, জিতেন বাবু ঈশ্বরীয় আনন্দ লাভ করলেন। অন্যদিকে দেখছি মাঝিরা কিন্তু রামকৃষ্ণের সত্তা লাভ করেনি।

সমস্ত প্রকার ঈশ্বরীয় দর্শনই হয় সহস্রারে। যেমন আমাদের স্কুলে যেতে হয় পাঠটা নিতে। তারপর আবার বাড়ি ফিরে আসি। সেটা নিয়ে আমরা মনন করি। আবার পরের দিন পড়তে যেতে হবে স্কুলে। তেমনি দর্শনের

জন্য সহস্রারে মনকে যেতেই হবে। না হলে দর্শন হবে না। কিন্তু যখন কেউ নিজেই School of thought হয়ে ওঠে তাকে স্কুলে যেতে হয় না, বাড়িতেও থাকতে হয় না। নিজেই চিন্তা দিতে পারেন অন্যদের।

সহস্রারে brain faculty হয়ে থাকে তার মন। সে অধীত বিদ্যা শেখায় না অপরকে, সে নতুন কথা বলে।

তেমনি আধ্যাত্মিক জগতে কেউ দর্শন অনুভূতি নিয়ে মননের স্তরে থাকলেন। তখন বলা হয় কারণ শরীরে ঢুকলেন বা সূক্ষ্মমনে প্রবেশ করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও eternal problem solve হয়নি।

এই যে চিন্ময় রূপ দেখছি এগুলো কী? যেহেতু তা বুঝলেন না তাই সেসব আত্তীকরণ (internalise) করতে পারলেন না, সবই আমার ভিতর, আমি পূর্ণ, আমিই সব হয়েছি এটা উপলব্ধি হ'ল না। মন ৪র্থ ভূমিতেই থাকল। বড়জোর ৫ম ভূমি।

৬ষ্ঠ ভূমিতে মন গেলে ইষ্টদর্শন হয়। জ্ঞানচক্ষু দর্শন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ইষ্টমূর্তি দর্শন হলেও তিনি ইষ্টে পরিবর্তিত হননি। তাই চিরকাল মা মা করে গেলেন। ব্রহ্মকে কালী বলে গেলেন। কালীকে অতিক্রম (Cross) করতে পারলেন না। মন ৬ষ্ঠ ভূমিতে স্থিতিলাভ করল না। তাই তাকে দেখে, মন ৬ষ্ঠ ভূমিতে উঠলেও আবার মন নেমে যায়। শ্রী জীবনকৃষ্ণ প্রথমদিকে রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ করলেও শেষ দিকে তাকে অতিক্রম (Cross) করে গেলেন। যখন থেকে তিনি বলতে শুরু করলেন, "তোরা ভজিস রামকৃষ্ণ কিন্তু দেখিস জীবনকৃষ্ণ কেন?"

শ্রীরামকৃষ্ণের মন যদি ৬ষ্ঠ ভূমিতে থেকে যেত তাহলে অন্যান্য যোগগুলিকে বিশেষত লয় যোগকে, যোগ বলে মান্যতা দিতে হত। তাই এটা পরিষ্কার যে রাজযোগ-ই একমাত্র যোগ।

১০. বুড়ি ছোঁয়া খেলায় বুড়ি ইচ্ছা করে ছোঁয়া দেন না যাতে খেলাটা আরও কিছুক্ষণ চলে।

আধ্যাত্মিক জগতে মূলত দু'রকম ইচ্ছা আছে। প্রথমত বুড়ি হওয়ার অর্থাৎ নির্গুণের সাথে এক হওয়ার ইচ্ছা। নির্গুণের সাথে একত্ব হওয়ার পর ঈশ্বরত্ব লাভের পর তার একটা Phase আসে যখন তিনি দেখেন তিনি একাই আছেন। তখন তার কোনরূপ ইচ্ছে থাকে না।

SB3/E/Galaxy/Golpa Sankolan...2nd Proof...157

কিন্তু এই দ্বিতীয় Phase টি কাটিয়ে উঠে তিনি যখন দেখেন বহুও আছে তখন আবার তার মনে লীলা করার ইচ্ছা অর্থাৎ বুড়ি ছোঁয়া খেলার ইচ্ছা জাগে। তখন তিনি তৈরী করেন মায়ার জাল যাতে তার লীলা আরও বেশিক্ষণ চলে। সাধারণ মানুষ যাতে তাকে আরও গভীরভাবে জানার চেষ্টা করে তাই তিনি এই জটিল মায়ার জাল তৈরী করেন যে জাল কাটাতে আবার তিনিই সাহায্য করেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে মায়ার জাল তৈরীর কি দরকার? তাহলে ভাবতে হবে, মায়া না থাকলে কী কাটিয়ে মানুষ তাকে লাভ করবে? দেখা যায় সহজে কোনো জিনিস পেলে আমরা তার গুরুত্ব দিতে পারি না। জিনিসটার ওজন বুঝতে পারি না। তাই পড়ানোর সময় শিক্ষকরা জটিল প্রশ্ন দেয় যাতে আমরা বিষয়টার গভীরে গিয়ে ভাবি। সেরূপ আমরা যাতে ভগবানকে নিয়ে ভাবি, তাকে জানার জন্য মন প্রাণ নিবিষ্ট করি তাই তিনি এই মায়া সৃষ্টি করেন যা আমরা নিরন্তর অনুশীলনের মাধ্যমে কাটাতে পারবো।

এখন প্রশ্ন হতে পারে নির্গুণকে তো সীমায়িত করা যায় না তাহলে কী বলা যাবে যে নির্গুণের কোন ইচ্ছা আছে?

না। যদি অসীম নির্গুণের কথা বলা হয় তাহলে নির্গুণের কোন ইচ্ছা থাকে না। কিন্তু নির্গুণ যে দেহে ঘনীভূত (Concentrated) হয় সেই মানুষটির তো ইচ্ছা আছে। নির্গুণ যখন ব্যক্তিরূপে প্রকাশ (Personified) হন তখন তার ইচ্ছা আছে।

ঐ Personified নির্গুণ আমাদের অন্তরে প্রকাশ হলে তাকে একজন ব্যক্তি বলে বোধ হয়। কিন্তু অনুশীলনের গভীরতা বাড়লে বুঝতে পারা যায় যে তিনি কোন আলাদা ব্যক্তি নন, আমারই আপন সত্তা। তখনই বুড়ির ছোঁয়া পাওয়া হয়, খেলা থেমে যায়।

১১. শ্রীরামকৃষ্ণের সখীভাবে সাধন প্রসঙ্গে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলেন, ভগবান একজনকে পুরুষ মানুষ করল আর সে মেয়ে সেজে সখীভাবে সাধন করল। এটা কি ভগবানের বিরুদ্ধাচারণ নয়? .....(ঋতম্ বদিষ্যামি)।

দেহকে নারী বলা হয়। আবার দেহ হল মায়া। সাধক মায়ার ভিতরে থেকে ঈশ্বরকে পেতে চান। যে ঈশ্বরের লিঙ্গ নেই তাকে পুরুষ লিঙ্গ কল্পনা করেছেন, যে দেহে আত্মা সংকলিত হবে তাকে নারী ভাবছেন, এ সকলই ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ।

সাধক নারীভাব আরোপ করেন কারণ নারীদের মধ্যে প্রেমভাব স্বভাবতই বেশি প্রকট। সাধক চান এরূপ তীব্র প্রেম জাগুক তার অন্তরে।

সখীভাবে সাধন যে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে প্রথম দেখা যায় তা নয়। এর আগে মহাপ্রভুও কৃষ্ণপ্রেয়সী রাধাভাবে থেকে স্বরূপ দামোদরের গলা জড়িয়ে ধরে বলছেন, ''উঠি বসি করি কত পোহাইব রাতি, কঠিন এ পোড়া প্রাণ ছাড় নারীজাতি।'' ভক্তিমতি মীরা বাঈ-এরও প্রিয়া রূপে বিষ্ণুর সঙ্গে মিলনের আকুতি জন মানসে সাড়া ফেলেছিল। এর বহু পূর্বে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতকে করাইকাল প্রভৃতি নায়াননার শৈব সাধিকা ও তৎপূর্বে অণ্ডাল ইত্যাদি বিষ্ণুভক্ত আলভারদের মধ্যেও প্রিয়া রূপে ঈশ্বর পুরুষের সঙ্গে মিলনের তীব্র আর্তি দেখা গিয়েছিল। যাদের লেখা গান ও কবিতা বিশেষ সমাদর লাভ করে। ভাগবতের মাধ্যমে এই ভাবধারার প্রভাব পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে।

প্রেম ব্যষ্টির সাধনে অত্যাবশ্যক কিন্তু নারী রূপে না। মন ৫ম ভূমিতে অধিষ্ঠান করলে ঈশ্বরের কথা শোনার ব্যাকুলতা বাড়ে। তখন প্রেমের উদয় হয়। এই প্রেমে মায়া থাকে না। এইজন্য এই ভূমির অন্তিম পর্যায়ে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি দর্শন হয়। এই দর্শনে সাধকের কাম উবে যায়। আর আমি পুরুষও নই নারীও নই, নারী পুরুষের ঊর্ধ্বে এক সত্তা, এই উপলব্ধি হয়। তখন আত্মা বা ভগবান দর্শনের দিকে মন ধাবিত হয় এবং শেষে তার সাথে এক হয়ে যায়। আত্মার কোন লিঙ্গ নেই। রূপ দর্শন হলেই তার লিঙ্গ থাকে। সাধকের কালী দর্শনও ঈশ্বরের কাল্পনিক রূপ দর্শন কারণ বংশ পরম্পরায় এই রূপ আমাদের মননে থেকে যায়। আত্মা বা ঈশ্বরের কল্পনাবর্জিত রূপ হল নিরাকার পরম জ্যোতি।

আত্মাকে পুরুষ বলা হয় কারণ তিনিই আদি ও অনন্ত এবং সৃজনশীল চৈতন্য সত্তা।

সত্য থেকে সত্যে যাওয়া যায়। দেহ হল মায়া। সাধক তার পুরুষ দেহকে নারীদেহ ভাবলে দেহজ্ঞান বা মায়া দূর হওয়ার পরিবর্তে আরও বেশি করে মায়ায় জড়িয়ে পড়েন। ফলে প্রেম জাগলেও সেই প্রেমের চক্ষু যেন আবরণের ওপারে সত্যকে স্পষ্ট দেখতে পায় না। নারী প্রেমের প্রতীক। শ্রীরামকৃষ্ণের তীব্র প্রেম জেগেছিল। তাই নারী সেজে সাধনের ইচ্ছা জেগেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ যদিও ব্যতিক্রমী পুরুষ। তিনি অবতার। তবু এই

কারণে সর্ব সংস্কারমুক্ত হতে পারেন নি। এছাড়া নিজেকে নারী ভাবলে আদিপুরুষই যে আমার সত্তা তা উপলব্ধি হয় না। দ্বৈতবাদেই থেকে যান সাধক।

১২. আমি এখন তোদেরকে আমার ভেতরে পেয়েছি। আমার Brain faculty হয়েছে। এই ব্রেন ফ্যাকাল্টির দ্বারা জগৎ আমার ভেতরে দেখলাম, আবার এর দ্বারাই বাইরের জগৎকেও ভেতরে টেনে নিলাম। ....(ঋতম্ বদিষ্যামি)।

Faculty মানে an inherent mental power- আপনা হতে জেগে ওঠা বিশেষ মানসিক শক্তি বা সৃজনশীল মন।

শ্রী জীবনকৃষ্ণের মন উপরে উঠে সহস্রারে যাওয়ায় তা সম্পূর্ণ নিষ্কাম হয়েছে ও ব্রেনের স্থায়ী একটা পরিবর্তন ঘটেছে। তার Brain faculty হয়েছে। সৃজনশীল মন হয়েছে। আত্মিকে নতুন কিছু সৃষ্টির ক্ষমতা জেগেছে। পরিণতিতে তিনি সব ধর্মীয় কথা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হন। কোন বক্তব্যের অন্তর্নিহিত ভাবটি বোঝা ও আগের বক্তব্যের সঙ্গে তার লিঙ্ক আছে নাকি কেটে গেছে তা সহজেই বুঝতে পারতেন। আবার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে নতুন ব্যাখ্যা দিতেন যার প্রমাণ ফুটত অপর মানুষের দর্শনে।

কারও Brain faculty হলে সেই মানুষ সহজেই অন্যদের মনের গভীরে গিয়ে তাদের মন read করতে পারেন, বিশেষত তারা কে কেমন ভাবনা চিন্তা করছে। সাধারণ মানুষ বাইরে থেকে অন্য মানুষকে বোঝার চেষ্টা করে তাই ভুল হয়। যার Brain faculty হয়েছে তিনি সকলের মন খুব ভালোভাবে বুঝতে পারেন, ফলে মনে হয় তারা যেন তারই সঙ্গে ওতপ্রোত তথা তারই সত্তা। তাদেরকে তিনি যেন ভেতরে পেয়েছেন। তিনি তাদের মন নিয়ন্ত্রণও করতে পারেন তার নিজস্ব ভাবনার দ্বারা। তখন বোঝা যায় তার অখণ্ড মন হয়েছে বা Universal mind হয়েছে।

একযুগে Brain faculty একজনেরই হয় যিনি ঊর্ধরেত পুরুষ। তিনি অন্যদের Brain power (capacity) develop করে দেন তাদের অণু পরিমাণ চৈতন্য দান করে। আর এ জিনিস হয় তার brain faculty-তথা সৃজনশীল মনের দ্বারা। তখন সাধারণ মানুষও অন্য মানুষদের আত্মিক ভাবনা অনুধাবন করতে পারবে ও তাদের সাথে মানসিক দূরত্ব কাটিয়ে উঠে পরস্পর এক বোধে উত্তীর্ণ হবে। অধ্যাত্ম সাধনার এটিই চরম লক্ষ্য।

১৩. স্বরূপ ও স্বস্বরূপ ঃ মানুষের প্রাণের দুটি রূপ (Form) আছে।

একটি হল Real form বা প্রকৃত রূপ, অপরটি Apparent form বা আপাত রূপ যা তার জৈবী দেহের চিন্ময় রূপ। যখন নিজে ধ্যানে বা স্বপ্নে নিজেরই রূপ দেখতে পায়, তা হ'ল Apparent form আর যখন সে নিজের সহস্রারে পরম ব্রহ্ম রূপে একজন মানুষের চিন্ময় রূপ দেখে সেটি তার Real form.

সাধারণভাবে Apparent form কে অগ্রাহ্য করা হয় ও Real form দর্শন করাকে স্বরূপ দর্শন বলে। কিন্তু যদি কারও Apparent form ও Real form, দুই-ই দর্শন হয় তখন Apparent form কে স্বরূপ ও Real form কে স্বস্বরূপ বলে বর্ণনা করা হয়।

বস্তুতত্ত্বে সাধন হয় যার, যিনি বহু মানুষের অন্তরে চিন্ময় রূপ ধরে ফুটে ওঠেন তাঁর ক্ষেত্রে স্বরূপ স্বস্বরূপ একই রূপ। শ্রী জীবনকৃষ্ণের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপীত্ব লাভের পর তিনি বুঝলেন তার স্বরূপ ও স্বস্বরূপ Apparent ও Real form একই-তারই নিজের রূপ।

আবার তার স্বস্বরূপ বা Real form-এর দুটি দিক রয়েছে। একটি individual স্বস্বরূপ এবং দ্বিতীয়টি Universal স্বস্বরূপ যা অসংখ্য মানুষের অন্তরে ফুটে ওঠা তারই চিন্ময় রূপ।

সমষ্টির ধর্মে যখন সাধারণ মানুষের অনুচৈতন্য লাভ হচ্ছে একটি মানুষের রূপে তখন তা তাদের individual স্বস্বরূপ আর যখন সমষ্টি চৈতন্যের ঘনমূর্তিকে দেখছে, তার সাথে একত্ব লাভ করে তাকে আপনসত্তা বলে উপলব্ধি হচ্ছে তা হচ্ছে তাদের Universal স্বস্বরূপ—এ দুই-ই এক রূপ—একজনেরই রূপ।

স্মৃতিচারণ

স্মৃতিচারণ

শ্রী জীবনকৃষ্ণের পূতসঙ্গ লাভে ধন্য মানুষের টুকরো কিছু স্মৃতিকথা এখানে উল্লেখ করা হলো.....

আনন্দমোহন ঘোষ

১. একদিন ভোলা দা পাঠ করেছিলেন, ভোগ থাকলেই জ্বালা।'' একথা শোনামাত্র পাঠ থামিয়ে জীবনকৃষ্ণ বললেন, কি ভোগ জানিস? ভগবান ছাড়া আর যে কোনো কথা, যে কোন কাজই তুই করবি তাই ভোগ হয়ে যাবে। এর মিনিমাম হচ্ছে সর্বদা ভগবানকে ডাকা আর ম্যাক্সিমাম—তোরা যে যতটা পারিস বুঝে নে। তবে ভগবান সর্বশক্তিমান। সে যদি চায় তবে সব বাধা অতিক্রম করে ঠিক চলে। কিছু ভাবিস না। শুধু তাকে ডাকিস আর সেটা যেন আন্তরিক (Sincere) হয়, মন প্রাণ দিয়ে, ঠাকুর যাকে বলেছেন, ''কায়মনোবাক্যে' হলেই আন্তরিক হয়।

সেদিন অম্বর এসেছিলো। সে পূর্বদিকের দরজা আর জানালার মাঝখানে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিলো। হঠাৎ বলে উঠলো, ''দেখুন আপনি যে সমস্ত কথা বললেন ঠিক ঐ সমস্ত কথাই আমি ভেবেছিলাম। কি আশ্চর্য! আপনি মনের কথা কি করে জানলেন? কাল রাত বারোটা পর্যন্ত বসে বসে ঘুম এলো না। মনে মনে বলছিলাম এসব আমার জন্য নয়। আমার দ্বারা এসব হবার নয়। আমি আর আপনার কাছে আসবো না। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে মনে হলো সারা শরীরে অসহ্য কাঁপুনি। যেন পায়ের বুড়ো আঙ্গুল থেকে মাথার চুল পর্যন্ত শিরশির করে উঠলো, আর সারা শরীরে সেকি অসম্ভব কাঁপুনি। কিছুতেই স্থির হতে পারি না। অনেকক্ষণ ধরে যখন কিছুতেই আর কাঁপুনি থামাতে পারি না তখন আপনাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, ''আচ্ছা আমি আপনার কাছে যাবো।'' কি আশ্চর্য! এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অস্বস্তি আর সেই কাঁপুনি একেবারে বন্ধ। আমি নিজেও অবাক হলাম আর মনে মনে বুঝলাম

আমার এ পথ থেকে সরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। তাঁর ইচ্ছা হলে কিছুতেই আটকে যায় না।

এবার পূর্ব কথার সূত্র ধরে অম্বর বললো, "কিন্তু কি আশ্চর্য, আমি যা ভেবেছিলাম তা আপনি কি করে বললেন?" উনি এই কথা শুনে মুখে মৃদু হাসি নিয়ে বললেন, "তা অত জানি না বাবা, কিন্তু কি আশ্চর্য বল দেখি? এই কথা বলেই আমাদের সকলের দিকে চাইলেন। সব শুনে আমরা সকলেই অবাক দৃষ্টিতে ওনার দিকে চেয়ে রইলাম।

২. একদিন জীবনকৃষ্ণ আমাদের মানুষই যে সত্য একথা বোঝানোর সুন্দর একটি তথ্য আমাদের কাছে উপস্থাপন করলেন : মহাত্মা গান্ধী তাঁর কাগজে লিখেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ বলে কোনো লোক ছিলেন না। তার উত্তরে হায়দার (স্যার আকবর হায়দার) এর কন্যা তাঁকে চিঠি লিখে জানান যে তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছেন।

ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলে শ্রী জীবনকৃষ্ণ প্রশ্ন তুললেন, গান্ধীজী কি ঠিক? তা নয়, কারণ স্যার হায়দারের কন্যা দর্শন করেছেন। তবে সেই কন্যা কি ঠিক? তাও নয়। কারণ শঙ্করাচার্য তো সব মায়া বলে উড়িয়ে দিয়ে গেছেন। তাহলে? ওরে স্যার হায়দারের কন্যা নিজেই শ্রীকৃষ্ণকে সৃষ্টি করে দেখছেন। তাই তিনিই সত্য। অর্থাৎ মানুষই সত্য।

খগেন্দ্রনাথ ঘোষ

১৯৫৫ সালের আগষ্ট মাসের একদিনের ঘটনা মনে পড়ছে। সেদিন জীবনকৃষ্ণের ঘরে ঢোকা মাত্র উনি বলে উঠলেন, "আয় বাবা, আয়। আজ তুই এসেছিস, তোকে নিয়েই ধ্যান করি। একেবারে খাটের উপর উঠে এসে বস।" তাঁর কথামত আমি তাই করলাম। তিনি সাধারণ আসনে সোজা হয়ে বসলেন। গভীর শ্বাস ত্যাগ করলেন। হাত দুটি হাঁটুর উপর হতে সোজা কপাল পর্যন্ত উঠে গেল। তারপর জোড়া হল। বুড়ো আঙ্গুল দুটি বেশ কিছুক্ষণ ভ্রুর উপরে কপালের মাঝখানে ঠেকানো রইলো। তারপর করজোড় আস্তে আস্তে কোলে নেমে এসে স্থির হয়ে গেলো। দেখতে দেখতে আমারও ধ্যানের আমেজ লাগলো। তাঁর পাশে বসে সেদিন ধ্যানে যা দর্শন হয়েছিল তা জীবনে অদ্ভুত ভাবে রেখাপাত করেছিলো। ভুলতে

পারিনি কখনও।

সেদিন যা দেখেছিলাম—একের পর এক উজ্জ্বল বিন্দু উপর থেকে নেমে এলো। একটা বেগে চক্রাকারে পাক খেয়ে গ্লোব সৃষ্টি করলো। তার উপর এক ধ্যান মূর্তি। সেই দৃশ্য বিলীন হলো। তারপর এক স্বর্ণ সিংহাসন ভেসে উঠে পরক্ষণেই মিলিয়ে গেল। আমি আর জীবনকৃষ্ণ বসে আছি। এক অজানা শঙ্খধারী পুরুষ হঠাৎ উদয় হয়ে শঙ্খধ্বনি করলেন, তারপর ওই শঙ্খের একখণ্ড করে আমাদের দিয়ে অদৃশ্য হলেন। শেষে দেখছি ওই শঙ্খটি গোটা হয়ে জীবনকৃষ্ণের হাতে। এই দৃশ্য দেখতে দেখতেই ধ্যান ভাঙ্গলো। এই রকম ধ্যান আর এই দর্শন একমাত্র তাঁর সংস্পর্শেই সম্ভব।

অনাথনাথ মণ্ডল

১. আত্মিক জগতের সুউচ্চ শিখরে থেকেও জীবনকৃষ্ণ মাঝে মাঝে সরস কথাবার্তা বলে ঘরের পরিবেশ-কে হাস্যময় করে তুলতেন। কদমতলায় যে কালা বুড়ো ভদ্রলোক লোহাকালীবাবুর বাড়ির কাছ থেকে আসতেন, তাকে উনি প্রণাম করবার সময় রোজ বলেন, "আপনাকে প্রণাম হই।" কিন্তু ভদ্রলোক শুনতে পান না। তাই আজকাল একটু চেঁচিয়ে বলেন। এই নিয়ে উনি একদিন আমাদের এক কালা জামাই সম্বন্ধে একটা গল্প শোনালেন। গল্পটা হল—"শ্বশুরের অসুখ হয়েছে। জামাই গেছে তাকে দেখতে। জামাই জিজ্ঞাসা করলো, কেমন আছেন? শ্বশুর বললো, "আর বাবা! এবার কোন রকমে যেতে পারলে হয়।" জামাই তো কালা, কিছুই শুনতে পেল না। তাই একটা ভালো উত্তর দেবার জন্য বললো, "তা খুব ভালো।" শ্বশুর ব্যাপারটা বুঝতে পেরে একটু রেগে গেল। তারপর জামাই জিজ্ঞেস করলো, "তা কোন ডাক্তার দেখছে?" তখন শ্বশুর রেগে বললো, "যম দেখছে।" তখন জামাই উত্তর দিচ্ছে, "হ্যাঁ খুব ভালো।" "ওনার চেয়ে আর কোনো ভালো ডাক্তার নেই।" এবার শ্বশুর তো রেগে আগুন হয়ে গেল। সে রাগে গজগজ করতে লাগলো। গল্প শুনে সেদিন আমরা ঘরের কেউই হাসি চেপে রাখতে পারি নি।

২. জীবনকৃষ্ণ তখন কালি ব্যানার্জী লেনে থাকতেন। একদিন আমি ওনার কাছে গেছি। কথায় কথায় বললেন, "তোদের I.A ক্লাসে Rhetoric and

prosody পড়ানো হয়নি এখনো?" আমি বললুম, "হ্যাঁ আরম্ভ হয়েছে।" উনি বললেন, "ইংলিশে যাকে exaggeration বা hyperbole বলে বাংলা অলংকারে তাকে উৎপ্রেক্ষা বলে। উৎপ্রেক্ষার উদাহরণ কি রকম শুনবি?" বলেই রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের লেখা "বিদ্যাসুন্দর" কাব্য থেকে দুটি লাইন বলে শোনালেন—"কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা। পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা।" 'অর্থাৎ মুখের সঙ্গে শরৎ শশীর কি তুলনা করছো, তার পায়ের নখে কত শরতের শশী পড়ে আছে।' বিদ্যার রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে কথাগুলি বলা হয়েছে। জীবনকৃষ্ণের সাহিত্য আর অলঙ্কারের এই জ্ঞান সেদিন সত্যিই আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

আলোচনা চলছে, এমন সময় নগেনবাবু ওঁর ঘরে ঢুকলেন ও ওকে প্রণাম করে ডেক চেয়ারটায় বসলেন। উনি নগেনবাবুকে প্রতি নমস্কার জানিয়ে বললেন, "কি আর করি, এই শিশু শহরের কত রকমের প্রলোভন এড়িয়ে এখানকার এঁদো ঘরে বসে আছে, তাই ওর সঙ্গে একটু অলংকার আলোচনা করছিলুম।"

ইন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১৯৬৬ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর দিনটির কথা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। ঐ দিন জীবনকৃষ্ণ কদমতলার ঘর ছেড়ে ব্যাতাইতলায় চলে যান, তাঁর মাসতুতো ভাই মানিক বাবুর নবনির্মিত বাড়িতে। জিনিস পত্র সব চলে গেছে। উনি ঘরে ধুতি পাঞ্জাবি পরে বসে আছেন। একটা গাড়ি আসবার কথা ছিলো। গাড়ি এলে উনি চলে যাবেন। সেখানে আমরাও কয়েকজন বসে আছি। কিন্তু ঐ অবস্থাতেও তিনি ঈশ্বরীয় কথাই বলে চলেছেন। উনি বললেন, "এই যে ঠাকুর বলে চলে গেলেন যে ঈশ্বরের কৃপা না হলে হবে না" এখন তোরা বল কাকে ঈশ্বরের কৃপা বলে? আমরা তো এটা সেটা বলবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমাদের কারোরই উত্তর ঠিক হলো না। তখন উনি বলে দিলেন, "দ্যাখ এই মানুষটা যখন ঈশ্বর হয়ে কৃপা করে তখন তাকে ঈশ্বর কৃপা বলে।" এই কথাটা তিনি যখন বললেন, তখন আর আমাদের বুঝতে বাকি রইলো না, কেননা সেই কৃপা তো আমরা সবাই পেয়েছি।

হিরণপ্রভা দাস

ঠাকুর জীবনকৃষ্ণ তখন কদম তলায় থাকেন। প্রতি দিন বেলা দুটো থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত নিয়মিত পাঠ হয়। আমার স্বামী আমার কাছে ঠাকুরের বিষয়ে গল্প ও আলোচনা করেন। ক্রমে আমি জানলাম যে কোনো স্ত্রী লোকের ঠাকুরের কাছে যাওয়া নিষেধ। এই কথা শোনার পর আমার ধারণা হয় যে ঠাকুরের সব কিছুই ভণ্ডামি।

এই মানসিকতা নিয়ে কিছুদিন কাটলো। তারপর এক দুপুরে স্বপ্নে দেখছি, আমার শাশুড়ি বাপের বাড়ি গিয়েছেন এবং স্বামীও কাজে বেরিয়েছেন। অপরাহ্ণে বাড়ির মধ্যে রকে বসে কাজ কর্মের চিন্তা করছি, দেখছি একজন প্রৌঢ় লোক, বেশ হৃষ্টপুষ্ট, আমাদের বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন। আমাকে বললেন, "তোর বাড়িতে থাকবো।" আমি ভয় পেয়ে বললাম, "না না, তা হবে না। আমার শাশুড়ি বাড়ি নেই। আমার স্বামী কাজে গিয়েছেন, তুমি চলে যাও।" কিন্তু তিনি আরও অগ্রসর হয়ে তুলসী মঞ্চের নিকট পৌঁছুলেন এবং নাম কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। তখন আমি অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলাম। আমার মনে হলো, এ নিশ্চয় ডাকাত। এমন সময় ঐ লোকটা আমায় সম্বোধন করে বললেন, "তুই ভয় পাচ্ছিস? এই দ্যাখ! আমি এই বেশে থাকবো।" তাকিয়ে দেখি গোপালের মত একটি বালক তুলসী মঞ্চে বসে খেলা করছে। তবুও আমি খুব ভয় পেয়ে ঘরে ঢুকে খিল দিলাম। এই সময় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

আমার স্বামী যখন বাড়ি ফিরলো তাকে বললাম, "আজ আমাদের বাড়িতে ডাকাত এসেছিলো।" তিনি সমস্ত ঘটনা এবং ডাকাতের চেহারার বিবরণ শুনে বললেন, "হ্যাঁ, সত্যি ডাকাতই বটে! উনি আমাদের ঠাকুর জীবনকৃষ্ণ।" এই ঘটনার পর প্রায়ই আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখি। কিন্তু ঠাকুরকে স্বচক্ষে না দেখলে মন ভরছে না। সৌভাগ্যক্রমে একদিন একজন ভক্ত আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে রাজি হলেন। তাঁর সঙ্গে গিয়ে দূর থেকে আমার স্বপ্নে দৃষ্ট ভালোবাসার মানুষটিকে চাক্ষুষ করলাম। আমার সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন হলো। পরম তৃপ্তি নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

মানিক ৭৬ সংখ্যা

ভূমিকা

জীব শিব হয়। শুঁয়োপোকা প্রজাপতি হয়ে নিজের তৈরী গুটি কেটে বেরিয়ে পড়ে—মুক্তির আনন্দে উড়ে বেড়ায়। মানুষের অন্তর সত্তাও দেহ থেকে মুক্ত হলে মানুষ মুক্তির স্বাদ পায়। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব?

ঠিক ঠিক ঈশ্বরীয় কথা শুনলে ঈশ্বর দর্শনের জন্য প্রগাঢ় ইচ্ছা তথা তীব্র আর্তি জাগে। এটা প্রাথমিক পর্যায়ে প্রেমের অবস্থা যা তমোগুণী ভক্তদের মধ্যে বিশেষভাবে দেখা যায়। ''মা দেখা দে না হলে গলায় ছুরি দেব''—এই ভাব। অজ্ঞাতসারে অন্তরে জেগে ওঠা ঈশ্বর দর্শনের তাগিদ তাকে বাইরে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায় অথচ বাহ্যজগতের কোন কিছুতে সে শান্ত বা তৃপ্ত হয় না। মানুষ দেখা দাও, দেখা দাও—বলে তার কল্পিত ঈশ্বরকে ডাকে এবং যেহেতু সে জানে সেই ঈশ্বর বাইরে আছেন, তাই তা ঠিক ঠিক ডাকা নয়। নিবিড় প্রেমের সঙ্গে মননের মাধ্যমে তাঁর সাথে মিলনের আকাঙ্খা প্রকাশ তথা তাঁকে ডাকা বা শ্রী জীবনকৃষ্ণের ভাষায় ঠ্যাঙানো হলে তিনি ভিতরেই রয়েছেন, প্রকাশ হয়ে পড়েন একজন মানুষের রূপে—In the shape of a person—তাকে দর্শন হয়।

বস্তুতত্ত্বের সাধনে যিনি মুক্ত পুরুষ, যিনি অঙ্গুষ্ঠবৎ আত্মা সাক্ষাৎকার করেছেন তাঁর চিন্ময় রূপে সাধারণ মানুষের ঈশ্বর দর্শন হয়। প্রথমে তাকে ইষ্ট বলে বোধ হয়। কালী, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা ইত্যাদি ইষ্টকে যেভাবে মানুষ ডাকে, যেখানে জৈবী ইচ্ছা মিশ্রিত থাকে, বৈষয়িক লাভের চিন্তা থাকে জীবনকৃষ্ণকেও সেইভাবে ডাকে। পার্থিব লাভ না হলে পাঠে আসা বন্ধ করে দেয়। সেটা ঠিক ঠিক ডাকা নয়। কারণ শরীর সৃষ্টি হলে ইষ্টমূর্তি দর্শন হয়। পরে এই মানবব্রহ্মকে দেখলে সাধকের দেহে কারণ শরীরের গঠনের পরিবর্তন হয় তবে তখনও তার বোধের উত্তরণ হয় না।

পরবর্তী ধাপে দর্শন অনুভূতির মননে দর্শনের সঠিক অর্থ বোঝা ও বোধের উত্তরণ হতে থাকে। ধীরে ধীরে দ্রষ্টা বোঝে সে ইষ্টকে নয় ভগবানকে দেখেছে, পরে বোঝে সে পরমব্রহ্মকে দেখেছে শেষে বোধহয়

পরম একেকে দেখেছে। এই পর্বে তার যে সূক্ষ্ম মন জাগে ও মনন শুরু হয় তা যেন দুধ দাঁত, স্থায়ী নয়। এই সময়কার ঈশ্বরকে ডাকাও প্রার্থনা জানানো। যদিও জৈবী কামনা থাকে না এই প্রার্থনায়। যেমন, হে জীবনকৃষ্ণ আমাকে গোল্ডেন ব্রেন দাও, আমাকে পাঠে থাকার অনুকূল পরিবেশ দান করো—ইত্যাদি। এটিও ঠিক ঠিক ডাকা নয়। এখানে ২য় পর্যায়ে প্রেমের জাগরণ হয়। ফলে জাগতিক বিষয়ের আঘাত সহ্য করেও করা যায় নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বর চিন্তা।

এরপর নির্গুণের ঘনমূর্তি তথা সমষ্টিচৈতন্য রূপে মানব-ব্রহ্মকে অন্তরে দেখে তাঁর মননশীল অখণ্ড মনের গুণ অর্থাৎ সূক্ষ্ম মনের বিশেষ চেতনা বা অনুচৈতন্য লাভ হয় ও সূক্ষ্ম মন স্থিতিশীল হয়। ধীরে ধীরে কারণ শরীরের গঠন সম্পূর্ণতা পায়, তা যেন বিষ্ণুর মোহিনীমূর্তি হয়ে ওঠে, নির্গুণের বিকাশের উপযুক্ত আধার হয়ে ওঠে ও বোধে আত্মার বিকাশ পরিপূর্ণতা লাভ করে। যাকে অন্তরে দেখছি সে আমারই আপন সত্তা—আত্মা—ক্রমে এই বোধ জেগে ওঠে। আপনা হতে ঈশ্বরীয় মনন চলতে থাকে। মনে হয় যেন আমি-ই মনন করছি। বস্তুত ঈশ্বরই মনন করছেন। তিনি প্রেমরজ্জুতে বেঁধে পাহাড়ের শীর্ষদেশ থেকে আমাদের টান মারছেন—আমরা হাত পা নাড়িয়ে ভাবি কত মেহনত করে, কষ্ট করে পাহাড়ে উঠছি, মনন করে ঈশ্বরের অনেক পরিচয় জ্ঞাত হচ্ছি।

এই পর্যায়েই ঈশ্বরের প্রতি প্রেম আরও গাঢ় হয় ও ঠিক ঠিক ঈশ্বরকে ডাকা শুরু হয়। অবশেষে তিনিই আমার স্বরূপ-এই সত্য জ্ঞাত হয়ে 'আমি মুক্ত আত্মা''—এই বোধ স্থিতিলাভ করে। তখন ঈশ্বরকে ডাকা বন্ধ হয়। ঈশ্বর হয়ে গেলে (যদিও ২য় স্তরে, বস্তুগত নয়, বোধের দিক থেকে) আর ঈশ্বরকে ডাকা যায় না। নিজেকে নিজে কেউ ডাকে না।

তখন সেই অখণ্ড চৈতন্যে যুক্ত হয়ে, এক হয়ে ও অপর সকল মানুষের সঙ্গে এক সত্ত্বা বোধে এক ছন্দে এক সুরে একত্বের মহাসাগরের মহিমা উদ্গান করে। প্রজাপতি হয়ে ডানা মেলে আত্মিক জগতে যথেচ্ছ উড়ে বেড়ায়। তখন যা কিছু দর্শন হয়, উপলব্ধি হয় নির্গুণ ব্রহ্মকেই দেখছি ও জানছি। এই নির্গুণের রহস্য ভেদ করে ক্রমাগত সত্য সুন্দরকে জানা, এক-কে জানা ও তাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে এগিয়ে চলাই প্রকৃত মুক্তি।

২৬ কার্তিক, ১৪২৮

স্বপন মাধুরী

নতুন সূর্যের আলো

● দেখছি (21.5.2021)—সূর্যের ভিতর শ্রী জীবনকৃষ্ণ বসে আছেন। তিনি হাত বাড়িয়ে আমার মাথার চুল ধরে টান দিতেই মাথার খুলি উঠে গেল। ব্রেনের ভিতর সূর্যের আলো পড়ল। ব্রেন দেখতে পেলাম। মনে হল সূর্যের আলো পাওয়ায় ব্রেন পাওয়ার বাড়বে। .....

---স্বস্তিকা চ্যাটার্জী
চারুপল্লী

ব্যাখ্যা---

এই স্বপ্নে সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ জগৎচৈতন্য নয়, ইনি সমষ্টিচৈতন্য। তাকে পেয়ে সাধারণ মানুষের ব্রেন পাওয়ার জাগে।

● স্বপ্নে দেখছি (10.8.2021)—আমি ঘুমিয়ে আছি। স্বপ্নের মধ্যেই দেখছি আমার ঘুম ভেঙে গেছে। সেই সময় একটা 4/5 বছরের খুব সুন্দর দেখতে ছেলে, মাথা তার ন্যাড়া, আমার দিকে এগিয়ে এলো। ভাবছি ছেলেটা কে? হঠাৎ পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, ও জয়। ও সোজা আমার কাছে এসে ওর বাঁ-পা-টা আমার মাথায় তুলে দিল। আমি দেখলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথার খুলিটা সরে গিয়ে মাথার ঘিলুতে ওর পা স্পর্শ করল। অমনি আমার মুখ থেকে একটা শব্দ বেরিয়ে এলো—''ওঁ''।.....

---রাজীব রায়চৌধুরী
সখের বাজার

ব্যাখ্যা---

সমষ্টিচৈতন্যের প্রকাশে ব্রেন পাওয়ার বাড়ে ও সহস্রার থেকে ঠিক ঠিক যোগের ভাষা (নাদ থেকে উৎসারিত) উদ্ভূত হয়।

● স্বপ্ন দেখছি (28/08/2021)—একটা জায়গায় বেশ কয়েকজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ জয়ের দিকে দৃষ্টি পড়ল। দেখি জয়ের ভিতর থেকে একটা রে (Ray) বেরিয়ে মানুষগুলোর ভিতর ঢুকে গেল। অমনি মানুষগুলোর

ভিতরে যেন কী একটা পরিবর্তন হয়ে গেল। আমি তখন মুখে বলছি—এটা হ'ল মুক্ত অবস্থা। ....

---মণি দেবনাথ
সখের বাজার

ভিন্টেজ ঘড়ি

● দেখছি (16.10.2021)—পূরবী জেঠিমার বাড়ি গেছি। বাড়িটা যেন আধুনিক ধাঁচের নতুন বাড়ি। সামনে বিশাল সুইমিং পুল। বাড়িতে ঢুকতে গেলে ঐ সুইমিং পুলে নেমে অর্ধেকটা ভিজে ঢুকতে হচ্ছে। ভিতরে গিয়ে বসলাম। তারপর দেখি জেঠিমা বিরাট বালতির মতো একটা জিনিস দেখাচ্ছে। সেখানে ভিজে জামা কাপড় দিলে ও ওপরের হ্যাণ্ডেলটা বালতির ভিতর ঢুকিয়ে ঘুরিয়ে দিলে জামা কাপড়ের নোংরা জল বালতির পেছনের ফুটো দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমাকে বললেন, এই বালতিটা তুই নিয়ে যা। তারপর দেখছি আমাদের বাড়িতেই বসে আছি কিন্তু বাড়িটা আধুনিক ধাঁচের। সঙ্গে বন্ধুবান্ধবও রয়েছে—তাদের ক্ষিদে পেয়েছে। পাও ভাজির জন্য মশলা কিনতে তাপস কাকুর দোকান গেলাম। দোকানটা চিনতে পারছি না। ওনার স্ত্রী দেখিয়ে দিলেন দোকানটা। সেখানে ঢুকে দেখি ভিতরে আরও একটি বড় দোকান রয়েছে। সেখানে আধুনিক সব ঘড়ি (রিস্ট ওয়াচ) বিক্রি হচ্ছে। খুব সুন্দর দেখতে। জিজ্ঞেস করলাম ভিন্টেজ ঘড়ি নেই? দোকানদার বলল, এখানে ঐ ঘড়ি কেউ কেনে না—কেনার সামর্থ্য নেই—এটা যদি মাদ্রাজ হতো তাহলে প্রচুর বিক্রি হ'ত।

---কৃষ্ণেন্দু চ্যাটার্জী
ধাড়সা, হাওড়া

ব্যাখ্যা---

পূরবী জেঠিমা—সমষ্টিচৈতন্যের সঙ্গে একত্ব লাভকারী মানুষদের প্রতিনিধি। নতুন ধাঁচের বাড়ি—নতুন আধার—সাধারণ মানুষের দেহও নতুন হয়ে উঠছে এবং ধারণা শক্তি বাড়ছে। দোকানের ভিতর দোকান—আত্মিকে Parallel world. চেতনার গভীরতর স্তরে প্রবেশ। রিস্টওয়াচ—বাঁ হাতে

পরে—আত্মিকে কালের রহস্য ভেদ হবে—এ যুগে দাদু ও নাতি এক সাথে সমান ভাবে চৈতন্যের রসাস্বাদন করবে। মাদ্রাজের লোক ঐ ঘড়ি (অভিজাত ভিন্টেজ ঘড়ি) কিনতে পারে—(মাদ্রাজ মানে হ'ল সমুদ্র উপকূলের একটি মৎসজীবী গ্রাম)—বৃহৎ চৈতন্যসত্তার সঙ্গে একত্ব লাভ করলে চৈতন্যের রসাস্বাদনের দিক থেকে উচ্চ মানে পোঁছানো যায়—সমষ্টিচৈতন্যকে জানা যায় সম্মিলিতভাবে।

ছায়াপথ

● স্বপ্ন দেখছি (30.8.2021)—একটা ঘরে অনেকগুলি ছোট ছোট হোমিওপ্যাথি ওষুধের শিশি রয়েছে। পাঠের মায়েদেরও দেখছি ওখানে। হঠাৎ জীবনকৃষ্ণ ঢুকলেন ওখানে। বললেন, তোমাদের সকলকে ঐ শিশিগুলোর মধ্যে ঢোকাবো। আমি তো অবাক। কী করে এটা সম্ভব! জীবনকৃষ্ণ মায়েদের গলায় হাত দিয়ে চেপে ধরতেই তারা তৎক্ষণাৎ খুব ছোট হয়ে যাচ্ছে ও ঐটুকু শিশিতে ঢুকে যাচ্ছে। অবাক হয়ে ঐ দৃশ্য দেখছি।.....

---কেতকী পাঠক
সখের বাজার

ব্যাখ্যা---

সমষ্টিচৈতন্যরূপী জীবনকৃষ্ণের কৃপা স্পর্শে অহং কমে গেলে (ছোট হয়ে গেলে) মানুষটি সম্পূর্ণ বদলে যায়। তখন তার সূক্ষ্ম মন (হোমিওপ্যাথি ওষুধের ন্যায় সূক্ষ্ম ক্রিয়া যার) জেগে ওঠে ও ঠিক ঠিক অন্তর্মুখী হয়। জীবনকৃষ্ণ রূপে মনুষ্যজাতির অখণ্ড চৈতন্য সত্তাকে জানা শুরু হয়।

● 27.8.2021 রাত্রে স্বপ্নে আমার মনে প্রশ্ন জাগল যে জীবনকৃষ্ণের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কী? কে যেন বলল, ছায়াপথ। তখন ছায়াপথ দেখতে পাচ্ছি—তার মধ্যে আমি আছি আর কেন্দ্রে একটি কৃষ্ণগহ্বর (Black hole) রয়েছে দেখতে পাচ্ছি।

---সুস্মিতা সিনহা
দুবাই, UAE

ব্যাখ্যা---

নির্গুণের ঘনমূর্তি জীবনকৃষ্ণ যেন এক কৃষ্ণগহ্বর। কৃষ্ণগহ্বর যেমন ছায়াপথকে ধরে রাখে ঠিক তেমনি আত্মিকে তিনি মনুষ্যজাতিকে ধরে রেখেছেন।

● দেখছি (27.8.2021)—রাতের আকাশ নক্ষত্রপূর্ণ এবং স্বচ্ছ। আকাশের একপাশে থাকা একটা কৃষ্ণগহ্বর থেকে বাষ্প উঠছে এবং তারই সঙ্গে ওঁ ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে চারপাশে। আকাশের সকল নক্ষত্র একত্রিত হয়ে আমার মধ্যে বিলীন হয়ে গেল। ....বুঝলাম, জীবনকৃষ্ণের জগৎ সমগ্র মনুষ্যজাতি ব্যাপ্ত যার মধ্যে আমিও আছি অপরপক্ষে আমাদের আত্মিক জগৎ শুধু জীবনকৃষ্ণ!

---রূপা মাজি
আমতলা

রাণী মৌমাছি

● দেখছি (15.10.2021)—দোতলায় আছি। আমার কাছে একটা মুকুট পরা রাণী মৌমাছি এসেছে। তার যেন পায়ে কিছু হয়েছে। আমি তার সেবা করছি। এবার কিছুক্ষণ বাদে সে সুস্থ হয়ে উড়ে চলে গেল। আমাকে উপহার স্বরূপ একটা heart sign বা love sign আকৃতির গাছের পাতা দিল আর খুব আদর করল। হঠাৎ আমার মায়ের কাছে যেতে ইচ্ছা করলো। মা নীচে একতলায় রয়েছে, সেখানে গেলাম। দেখলাম যেন মায়ের কাছেও, একটা মৌমাছি (সাধারণ শ্রমিক মৌমাছি) রয়েছে। সেটাও অসুস্থ। মায়ের সাথে আমিও তার সেবা করতে লাগলাম। তখন আমার ঐ রাণী মৌমাছির কথা মনে পড়ে গেল। আর ওপরে এসে দেখি আবার ঐ মৌমাছিটাই এসেছে অসুস্থ হয়ে। আমি এবার হলুদ নিয়ে ওর সেবা করতে লাগলাম। ...ঘুম ভাঙলো।

---অভীপ্সা রায়চৌধুরী
সখের বাজার

ব্যাখ্যা—

রাণী মৌমাছি—আত্মিক জগতের অধীশ্বর—পরম এক জীবনকৃষ্ণ। তার সেবা—তার অনুধ্যান ও মনন না করলে নিজের দেবসত্তা অসুস্থ হয়ে পড়বে। মা—জগৎ। বাইরের জগতেও মধু আছে বিষয় মধু—সেটা পান করতে আসে সাধারণ মানুষ। মন নিম্নগামী হয়ে (নীচের তলায় গিয়ে) বিষয়ী লোকের ভাবনার পৃষ্ঠপোষকতা করায় ব্যস্ত হয়ে পড়লে ভিতরের আত্মিক সত্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নির্লিপ্ত হবার শিক্ষা নিতে হয় (হলুদ দিয়ে সেবা)। লাভ চিহ্নের ন্যায় পাতা দিল—সূক্ষ্ম মন লাভ হল—তখনই প্রেম জাগল।

● দেখছি (24.9.2021)—আমি জয়ের বাড়িতে জয়ের কাছে গেছি। জয় ও আমি মুখোমুখি বসে আছি। জয় আমাকে বলছে, তুমি আমার কাছে আসছো ঠিকই তবে তোমার বাড়ি, তোমার পথ সবই ভুলে যাবে।...

---প্রশান্ত রুজ
বোলপুর

ব্যাখ্যা---

ধীরে ধীরে আত্মিকে নিজস্ব identity, স্বতন্ত্র পরিচয় হারিয়ে যাবে। অখণ্ড চৈতন্যের সত্তায় আমরা সত্তাবান—এটি উপলব্ধি হবে।

পায়ে পায়ে চলা

● স্বপ্নে দেখছি (23.8.2021)—আমার ঘরে লম্বা চওড়া এক লোক দাঁড়িয়ে। আমি দেখছি তার পায়ের চেটো কত বড়! বললাম, তোমার ঐ পায়ের চেটোতে আমাকে চাপিয়ে হাঁটাবে? তাহলে আমি হাঁটার জোর পাই। দেখো না আমার পা ফার্স্ট ব্রাকেটের মতো বেঁকে গেছে। উনি আমাকে উঠে আসতে বললেন। আমিও অমনি ওনার হাত দুটো ধরে ওনার পায়ের দুই পাতার উপর দুই পা রেখে দাঁড়ালাম। উনি হাঁটছেন, আমার এই ৭৮ বছর বয়সে ওনার সাথে আমারও হাঁটা হয়ে যাচ্ছে বাচ্চা ছেলের

মতো।

কিছুক্ষণ পর আর ওনাকে দেখা গেল না। দেখি আমার পা কত মজবুত, একেবারে ইয়ং বয়সের মতো। শুধু নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে ভাবছি কত সুন্দর আমার পা। এবার আমি বোনের বাড়ি, বাপের বাড়ি সব জায়গায় যেতে পারবো।

একটু পর দেখছি আমার পা দুটো ফুলে গেছে যেন গোদ হয়েছে। মা-কে বলছি, মা পুরীতে পাণ্ডাদের দেখেছি তাদের পায়ে গোদ হয়। কেন? মা বলল, ওরা অনেক পাপ করেছে। লোকে রত্ন বেদীতে টাকা পয়সা দেয়, ওরা সেগুলো নিতে গিয়ে রত্নবেদীতে পা দিয়ে ফেলে, পা ঠেকে যায়। তাতে পাপ হয়। আমি বললাম তাহলে স্নেহময়কে জিজ্ঞাসা করবো।

স্নেহময় পাঠে এসেছে। ওকে সব বলে জিজ্ঞেস করলাম আমি কি পাপ করেছি? ও বলল, না, আপনি পাপ করেননি। আপনাকে হাঁটিয়েছেন তিনি, আপনি সেই হাঁটানোটা বোধে আনতে পারেন নি। আপনি পা সুন্দর দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছেন। তিনি গতি দান করছেন, এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, এটা ধারণা করুন। অন্যথায় অহং জাগবে ও গতি রুদ্ধ হবে।

---রেণু মুখার্জী
সখের বাজার

ব্যাখ্যা---

তিনি আত্মিকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে। আমার অনেক উন্নতি হয়েছে ভাবলে অহং জন্মাতে পারে।

জন্মাষ্টমী

● দেখছি (1.9.2021)—জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠান হচ্ছে। কিন্তু সেটা যেন জীবনকৃষ্ণের জন্মদিনের অনুষ্ঠান বলে মনে হচ্ছে। সেখানে পাঠের সকলে রয়েছে। তারা কেউ গান করছে, কেউ নাচ করছে। বাবা (রাজীব) বলছে আমি আগুন নিয়ে খেলা দেখাবো। মণি দিদান বলছে, তোমরা সকলে নতুন জামা পড়ে এসো। খেলা দেখবে। স্নেহময় মামা পাঠ শুরু করল। বাবা

খেলা দেখাতে লাগলো। প্রথমে হাতে পায়ে আগুন লেগে যাচ্ছিল। তৃতীয় বার আর আগুন লাগলো না। ঠিক মতো খেলা দেখালো। সবাই বেশ উপভোগ করলো।....ঘুম ভাঙল।

---অভিলাষা রায়চৌধুরী
বেহালা

ব্যাখ্যা---

রাজীব—সমষ্টিচৈতন্য। জন্মাষ্টমী—কৃষ্ণের জন্মদিন—নির্গুণের ঘনমূর্তির প্রকাশ। জীবনকৃষ্ণের জন্মদিন মনে হচ্ছে—নির্গুণ ব্রহ্মের মূর্তরূপ হিসাবে জীবনকৃষ্ণের প্রকাশ শুরু হয়েছে। কেউ গান করছে কেউ নাচছে—এ যুগে, সমষ্টির সাধনে সকলের কিছু না কিছু অবদান (Contribution) থাকছে। নতুন জামা—নতুন সাধনের উপযোগী দেহ। হাতে পায়ে আগুন লেগে যাচ্ছে—অগ্নিবিদ্যার যোগৈশ্বর্য দেহে প্রকাশ পাচ্ছে শ্রবণ মাত্র, স্মরণ মাত্র। তৃতীয় বার আগুন লাগলো না—ব্যষ্টি ও বিশ্বব্যাপীত্বের সাধনের পর সমষ্টির সাধনে সমষ্টিচৈতন্যের মূর্তরূপ যিনি তার দেহে যোগৈশ্বর্যের বাহ্যপ্রকাশ ঘটবে না। তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে এক হয়ে তাদের একীকরণের বিচিত্র খেলা উপভোগ করাবেন।

● দেখছি (22/7/2021)—বাবুদা, বাপী, এরা সব এসেছে। পাঠ হবে। শুনলাম বোলপুর থেকে জয় এসেছে। ওকে দেখলাম। খুব আনন্দ হল। একটু পর দেখি জয় শাড়ী পরে রয়েছে। ভাবছি তবে কী ও আসলে মেয়ে? ও ছেলে না মেয়ে ঠিক করতে পারছি না। বিস্ময়ে ঘুম ভাঙল। তখন মনে হল আরে ও তো অর্ধনারীশ্বর!

আদরিণী চ্যাটার্জী দেখেছেন অর্ধনারীশ্বর মূর্তি—যার ঊর্ধ্বাঙ্গ বিষ্ণু এবং নিম্নাঙ্গ কালী।

অর্ধনারীশ্বর মানে শিব—সেই শিবের গোপাল অবস্থা লাভ হয়েছে।

ঊর্ধ্বাঙ্গ পুরুষ—নির্গুণের ঘনীভূত রূপ আর তার দেহ Cosmic body—নারী।

---মীনা মণ্ডল
আন্দুল, হাওড়া

নিমপাতা মিষ্টি

● দেখছি (14.06.2021)— ঘরের বারান্দায় বসে আছি। উঠানে ১০/১২ জন কিশোর বালক খেলা করছে। তাদের নাম জিজ্ঞাসা করলাম, সকলেই বলল, আমার নাম জীবনকৃষ্ণ। আর বয়স ১২ বছর ৪ মাস। একটু পর ঘরের ভিতর থেকে বেরোলেন বয়স্ক জীবনকৃষ্ণ।....

---চৈতালী মাইতি
বাগুইহাটি

ব্যাখ্যা---

অনেকেরই অনুচৈতন্য লাভ হয়ে একত্বের সাধন শুরু হচ্ছে। তাই ১২ বছর ৪ মাস বয়স। বয়স্ক শ্রী জীবনকৃষ্ণের সঙ্গে (নির্গুণ ব্রহ্মের তথা সমষ্টিচৈতন্যের সঙ্গে) একত্ব লাভ হবে। এবার আর গুপ্ত লীলা নয়—ব্যক্ত লীলা।

● দেখছি (26.5.2021)—পুরী গেছি। একটা গাছের ডালে একটা অদ্ভুত সুন্দর পাখী এসে বসলো। হঠাৎ দেখি পাখীটা ধুতি পাঞ্জাবী পরা জীবনকৃষ্ণ হয়ে গেল। তখন বাবা, মা, দিদি, ঠাকুমা সবাইকে ডেকে দেখাচ্ছি ঐ দেখ জীবনকৃষ্ণ বসে আছেন। কিন্তু ওরা দেখতে পাচ্ছে না।....

---অন্বয়ী ঘোষ
চারুপল্লী

ব্যাখ্যা---

গাছ-দেহ। শ্রী জীবনকৃষ্ণকে প্রাণপাখী বলে উপলব্ধি হচ্ছে দ্রষ্টার। দেহের ভিতর দেখছে বলে অপরকে দেখানো গেল না।

● দেখছি (28.10.2021)—সরশুনায় গৌতমদার বাড়ী গেছি। দাদা বলল, আমাদের ঘরের পাশে যমজ নিম গাছ রয়েছে। অনেক বড় হয়ে গেছে। দেখতে গেলাম দাদার সঙ্গে। দুটি গাছের গুঁড়ি এমনভাবে যুক্ত হয়েছে যেন একটাই গুঁড়ি হয়ে গেছে। দাদা বলল, এই নিমগাছের পাতা

তেঁতো নয়, খুব মিষ্টি। আমি তো শুনে অবাক হলাম। তখন উনি এক ব্যাগ মিষ্টি নিমপাতা দিলেন। আমি তাই নিয়ে বাড়ি আসছি।....

---সবিতা ঘোষ
চারুপল্লী

ব্যাখ্যা---

গৌতমদা—গৌতম মানে আধুনিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ—সমষ্টিচৈতন্য।

দুটি নিমগাছ—পূর্ণ সগুণ ব্রহ্ম (জগৎ চৈতন্য) ও নির্গুণের ঘনমূর্তি সমষ্টিচৈতন্য যেন একই কয়েনের এপিঠ আর ওপিঠ। মিষ্টিপাতা—নির্গুণের শক্তিলাভে ঈশ্বরতত্ত্ব ও একত্ব ধারণা করা সহজ হচ্ছে। স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারছে সাধারণ মানুষ। নিমগাছ—বৈদিক একত্বের কৃষ্টির প্রতীক।

এতদিন বেদের কথার মানে বুঝতাম না তাই কঠিন লাগত। আঙুর ফল টক বলতাম। বৈদিক একত্বের কথা আবোল তাবোল মনে হতো যেন তেঁতো। এখন ব্যাখ্যা বুঝতে পারায় সমষ্টি চৈতন্যের প্রকাশে, মিষ্টি লাগছে। যেমন অশ্বমেধ যজ্ঞের অপর নাম নরমেধ যজ্ঞ কেন? বহুনাশ হয়ে একজ্ঞান হচ্ছে তাই।

রাতপরী

● দেখছি (21-10-2021)—বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে আকাশে একটা সরু রামধনু দেখছিলাম। হঠাৎ আমি বড় হতে হতে আকাশের উপর চলে গেলাম ও সেখানে একটা রামধনু আঁকা শুরু করলাম সূর্য থেকে ও অন্যান্য গ্রহ থেকে রঙ নিয়ে। কিন্তু বেগুনী রঙটা আর করতে পারছি না। তখন একটা রাতপরী এল আর সে একটা বেগুনী গ্রহ থেকে রঙ নিয়ে রামধনুটাকে সম্পূর্ণ করল। তারপর আমি আর পরী দুজনে এই রামধনুটাকে ঐ সরু রামধনুটার সঙ্গে মিশিয়ে দিলাম। অমনি রামধনুটা খুব মোটা আর পরিস্কার হয়ে গেল। তখন আমি আবার ছোট হয়ে গেলাম আর ছাদের উপর থেকে ঐ নতুন রামধনুটাকে দেখতে লাগলাম। ....

---আত্রেয়ী দাস (অলি)
বোলপুর

ব্যাখ্যা---

ছাদ—সহস্রার। আকাশে—চিদাকাশে। রামধনু—একের মধ্যে বহু। অর্থাৎ বহুত্বে একত্বের মূর্ত রূপ—সমষ্টিচৈতন্য। প্রথমে বোধ পরিষ্কার থাকে না তাই সরু। এরপর মনের উর্দ্ধগতি লাভ হয়। পরম একের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক বোঝার জন্য অনুশীলন শুরু হয়। আত্মিকে নিজের, অন্যদের ও বস্তুতত্ত্বে সাধন হয়েছে যার (সূর্য) যেমন জীবনকৃষ্ণের দর্শন অনুভূতি দিয়ে এর একটা রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে। এটা সম্পূর্ণতা পায় যখন অনুচৈতন্য (রাতপরী) জাগ্রত হয় এবং জগৎব্যাপ্ত এক অখণ্ড চৈতন্যের উপলব্ধি হয়, বহুত্বে একত্বের উপলব্ধি হয় তুরীয় অবস্থার অনুভূতিতে (বেগুনী গ্রহের রঙ) আবার ছোট হয়ে গেলাম---বহুত্বে একত্বের চেতনা লাভে সমষ্টি-চৈতন্যকে জানা হলে সাধারণ জীবনযাপন করে মানুষ। বেগুনী গ্রহ—পৃথিবীর আদিরূপ যখন এক কোষী প্রাণীতে সব ভরে ছিল। এছাড়া রামধনুর মধ্যে বেগুনী রঙের আলোর ঢেউ সবচেয়ে ছোট যা সূক্ষ্মতম তূরীয়ের অনুভূতিকে, নির্গুণের অনুভূতিকে ইঙ্গিত করে।।

● দেখছি---জীবনকৃষ্ণের আউট লাইনটা ধীরে ধীরে ছোট থেকে বড় হয়ে প্রমিনেন্ট (Prominent) হল। তখন মনে হচ্ছে ওটা জয়দা। শুনতে পেলাম কে যেন বলে দিল, ও জয়। আউট লাইনের পাশে ওয়ান (One) লেখাটা ফুটে উঠল।

---অঙ্কনা মাইতি
কাষ্ঠডাঙা

ব্যাখ্যা---

জীবনকৃষ্ণের আউট লাইন—একজ্ঞানের বোধ পূর্ণতা পাচ্ছে এ যুগে সমষ্টিচৈতন্যের বিকাশে।

খুচরো চাই

● দেখছি---জগন্নাথ দেব সামনে এসে দাঁড়ালেন। একটু পর তিনি সরে গেলেন আর সেখানে এসে দাঁড়ালেন ভগবান শ্রীজীবনকৃষ্ণ।....আনন্দে দেহ মন ভরে গেল।

পরের স্বপ্নে দেখছি (17.6.21)— ৫০০ টাকার একটি নোট আছে আমার কাছে। সেটি ভাঙাতে গেলাম একটা দোকানে। দোকানদার বলল, বিক্রি বাটা হয়নি। খুচরো দিতে পারবো না। আমি বললাম, হতাশ হয়ো না। তুমি এক থেকে দশের মধ্যে একটা সংখ্যা বলো। ও বলল, এক।....

---রামনারায়ণ পাশোয়ান
বাগুইহাটি

ব্যাখ্যা ঃ—৫০০ টাকার নোট—৫০০ সংখ্যাটি জীবনের বড় পরিবর্তন তথা নূতন জীবনের প্রতীক। দোকানদার—সংসারী মানুষ, লাভ ক্ষতির হিসাব নিয়ে ব্যস্ত। খুচরো করা—দ্রষ্টা জীবনকৃষ্ণকে ভিতরে দেখে কত বড় জিনিস পেয়েছেন তা অপর মানুষের কাছে feed back পেয়ে একটু একটু করে বোধে বোধ করতে চান। এক—ব্রহ্ম। দ্রষ্টার সান্নিধ্যে আসা অন্য বিষয়ী মানুষের ভিতরও ঈশ্বর চিন্তা তথা এক জ্ঞান জাগছে যেখান থেকে দ্রষ্টা feed back পাচ্ছেন। জগন্নাথ সরে গেলেন ও জীবন কৃষ্ণের রূপ দেখা গেল—যিনি জগন্নাথ তিনি জীবনকৃষ্ণ রূপে প্রকাশ হচ্ছেন—এই বোধ জাগছে।

● দেখছি—একটা ধূমকেতু উঠে গেল আকাশে। তারপর দেখছি অনেক ধর্ম ও অনুভূতি দিয়ে ঢাকা জীবনকৃষ্ণ। উপরে যত উঠছেন ততই বইগুলোর পাতা খসে পড়ে গেল। জীবনকৃষ্ণ উঠে গেলেন।....

---প্রকৃতি ব্যানার্জী
জামবুনি

ব্যাখ্যা—ধূমকেতু—বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত। ধর্ম জগতে মানুষ পেয়েছে ধর্ম ও অনুভূতি গ্রন্থ, যেখানে ধর্মের সকল রহস্য ভেদ করা হয়েছে। কিন্তু এ যুগে ধর্ম ও অনুভূতির মর্মকথা অনুধ্যান করে জীবনকৃষ্ণের সত্য পরিচয় উপলব্ধি হচ্ছে এবং ধীরে ধীরে নির্গুণের রহস্য ভেদ করে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে। তিনি নির্গুণে লীন (merge) হয়েছেন তা জানা যাবে।

● দেখছি (01.11.21)—ধর্ম ও অনুভূতির ৪র্থ খণ্ড খুব তাড়াতাড়ি

প্রকাশিত হবে। সারারাত ধরে স্নেহময় নতুন ধর্ম ও অনুভূতির কথা বলে যাচ্ছে, আর আমি শুনছি।

---সুস্মিতা সিনহা
দুবাই, UAE

ব্যাখ্যা---ধর্ম ও অনুভূতি গ্রন্থের ৩টি খণ্ড আছে।
মানুষের দর্শন অনুভূতির মাধ্যমে সৃষ্টি হচ্ছে ৪র্থ খণ্ড।

ছোট আমি

● 28/05/2021 ভোর রাতে স্বপ্নে দেখছি—আমি যেন ১২/১৩ বছরের ছেলে। আরও তিনটে ঐ বয়সের ছেলের সঙ্গে ঘরের বাইরের একটা খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে গল্প করছি। হঠাৎ দেখি একটি সুন্দর দর্শন ছোট শিশু আমাদের থেকে অল্প দূরে চুপ করে বসে আছে। মনে প্রশ্ন জাগলো এ কোথা থেকে এলো। একটু পরে একটা বড় ট্রাক সেখানে ঢুকল। গাড়ীটা সেখানে যেন ঘোরাবে। গাড়ীর সামনের চাকা শিশুটাকে পাশে রেখে পার হয়ে গেল। পেছনের চাকায় শিশুটি ধাক্কা খেল। গাড়ীটা তখন দাঁড়িয়ে। মনে হল শিশুটিকে বাইরে নিয়ে এলে ঠিক হয়ে যাবে। একটু পরে দেখছি সামনের দিকে মুখ করে পড়ে গেল। কে যেন বলল, ও আর আসবে না। ও চলে গেছে। আমরা ঘরে চলে এলাম।

ঘুম ভেঙে গেলে তন্দ্রার মধ্যে ভাবছি কেন শিশুটিকে বাঁচানো গেল না। তখন পরিষ্কার শুনতে পেলাম কে যেন বলল, ঐ শিশুটি তোর-ই অবস্থা—তোর "ছোট আমি" চলে গেল। কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলাম না।

---স্বপন ভট্টাচার্য
বাগুইহাটি

ব্যাখ্যা---তিনটি ১২/১৩ বছরের ছেলের সঙ্গে খেলা---অনুচৈতন্য লাভকারী মানুষদের সঙ্গে অনুশীলনে রত। বহু সাধারণ মানুষের ক্ষুদ্র আমি নাশ সম্ভব হচ্ছে। ফলে ঈশ্বরকে আপন সত্তা বলে উপলব্ধি করা সহজ হবে। গাড়ী ঘোরানো—ধর্ম জগতে turning point, মোড় ঘোরানো হচ্ছে।

ট্রাক—সমষ্টিচৈতন্য। সুন্দর দর্শন শিশু—আপাত ভাবে সুন্দর—বৃহৎ আমি লাভ হলে বোঝা যায় ও সুন্দর ছিল না। পিছনের চাকায় পিষ্ট—দর্শনের কিছু পরে উপলব্ধি হয় যে ক্ষুদ্র আমি মারা গেছে, সঙ্গে সঙ্গে নয়।

● দেখছি (13/06/2021)—রাত্রে বারবার ঘুম ভেঙে গেছে। রুম থেকে বেরিয়ে এলাম। বাইরে ঝড় উঠেছে। ঘরের সবাইকে দেখছি বারান্দায়। কিন্তু সকলে যেন বেশ কালো কালো। মাত্র একজনকে দেখলাম বেশ ফর্সা, যেন গা থেকে আলো বেরোচ্ছে। তিনি অপরিচিত। হঠাৎ মনে হল ইনি জীবনকৃষ্ণ। বললাম, তুমি তো মারা গেছ। এলে কী করে? বলল, আমি এখন অন্য একটা দেহে আছি। এটাই লাস্ট স্টেজ (last stage)....

---দেবদীপ মুখার্জী
পঞ্চম শ্রেণী, ইলামবাজার

ব্যাখ্যা---ঝড় উঠেছে—সময় হয়েছে। সকলে কালো কালো—আগে সত্যমূর্তিকে পেতে হবে, পরে তার আলোয় বাকীদের জানবো।

এটাই লাস্ট স্টেজ—সাধারণ মানুষও ব্রহ্মত্ব লাভ করবে All is all হবে, এটিই ধর্মের শেষ স্টেজ।

অচল পয়সা

● দেখছি (14.09.2021)—অমিতাভ বলে একজনের সাথে আমার বিয়ের ঠিক হয়েছে। ওকে বিয়ে করে মুম্বাই-এ থাকতে হবে। মনে হচ্ছে বর্তমান বর বাধা দেবে না তো? মা যেন এই দ্বিতীয় বিয়ের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ একটা অচল পয়সা রেখেছে। দেখছি ছোট সাইজের এক টাকার কয়েন, অস্পষ্টভাবে এক লেখা। সেটা অচল। আর তার সঙ্গে দুটি ৫ টাকার কয়েনও রয়েছে। সেগুলো সচল। মা কোন সোনার জিনিস না রেখে এই অচল পয়সাটা রেখেছে আমার বিয়ের উপহার হিসাবে? ভেবে অবাক হলাম। মুম্বাই যাবার গাড়ীতে বড় বড় বই তুলে নিচ্ছি, মনে হচ্ছে বইগুলো এতদিন পড়া হয়নি। এবার পড়ব। জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম জিনিস নিচ্ছি।

---বনানী বিশ্বাস
বনহুগলী, কোলকাতা

ব্যাখ্যা---বর্তমান স্বামী—সংসার। মা-দেহ, পাঠের জগৎ।

অচল পয়সা—অচল অটল সুমেরুবৎ—নির্গুণ ব্রহ্ম—তথা এক অখণ্ড সমষ্টিচৈতন্যের অনুভূতি। ১ লেখাটা অস্পষ্ট—নির্গুণ এখনও অস্পষ্ট, ক্রমে স্পষ্ট হবে। অমিতাভ—সমষ্টিচৈতন্য—অমিত তেজ যার। স্বামীর সাথে মুম্বাইয়ে থাকা—মুম্বাই হ'ল City of dream- সহস্রারে স্বপ্নের মধ্যে ও তার বিশ্লেষণে অমিতাভের সঙ্গ সুখ লাভ। ২টি পাঁচ টাকার কয়েন—ব্যষ্টির সাধনের পাঁচটি ধাপ ও বিশ্বব্যাপিত্বের পাঁচটি ধাপের অনুভুতি। এতদিন বইগুলো পড়া হয়নি—অনুচৈতন্য লাভ হয়নি, তাই বোধে বোধ হয় নি ধর্ম কথার অর্থ।

● 29.7.2021 এর স্বপ্ন— বাড়ি থেকেই দেখতে পাচ্ছি আমার আগের অঙ্ক স্যার আমাদের বাড়ির দরজায় এসে কলিং বেল বাজালেন। যাকে দেখছি মনে হচ্ছে ওনার নাম স্বপন স্যার। বাস্তবে স্বপন স্যার বলে আমার কোন স্যার ছিল না। দেখি ওনার মুখের ওপরে মাথার অংশটা দেখা যাচ্ছে না—অদৃশ্য। উনি ভিতরে এলেন। আমাদের বাড়িতে খেতে বসলেন। যখন খাচ্ছেন তখন ওনার মাথাটায় অল্প অল্প চুল দেখতে পাচ্ছি। ....ঘুম ভাঙল।

---অগ্নিশ চ্যাটার্জী
শীলপাড়া, বেহালা

ব্যাখ্যা---অঙ্ক—চিহ্ন। অঙ্ক স্যার—যিনি প্রতীকের ব্যাখ্যা শেখান।

স্বপন স্যার—স্বপ্নেশ্বর নাথ—শ্রী জীবনকৃষ্ণ। আগে পড়াতেন—জগৎ চৈতন্য রূপে মানুষের অন্তরে ফুটে উঠে মানুষকে আত্মিক চেতনা দান করেছেন। বর্তমানে সমষ্টিচৈতন্য রূপে তার নতুন প্রকাশ হচ্ছে। খাচ্ছেন—মানুষের অহং নাশ করছেন। চুল দেখা গেল—দ্রষ্টা তথা জগতের মানুষের একটু একটু করে সমষ্টিচৈতন্যকে ধারণা হতে শুরু হ'ল চুলচেরা বিশ্লেষণ করে।

মাথা দেখা যাচ্ছিল না—একজ্ঞান আমাদের ধারণা হচ্ছিল না।

প্রতীক তত্ত্বের অবসান হচ্ছে, একজ্ঞান হচ্ছে—একজ্ঞানে স্থিতিলাভ হচ্ছে।

মন তোলো

● দেখছি (8.07.21)— আমরা যেন সমুদ্রের কাছে গেছি। সেটা যেন দাদা (স্নেহময়দা) আমাদের নিয়ে গেছে। আমাদের যেন কিছু একটা হারিয়ে গেছে। দাদা বললেন, রাজীব সমুদ্রে নামো। আমি বললাম, আমি কি একা নামবো? দাদা বললেন, হ্যাঁ। আমার যেন একটু ভয় করছিল। তবুও আমি নামলাম। দাদা বললেন, আমরা একে অপরের হাত ধরে থাকবো। প্রথমে আমার হাত ধরলো শুভজিৎ, ওর হাত ধরলো সঞ্জয়—এইভাবে লিওন, বোলপুরের পাঠের ছেলেরা পরপর ধরে আছে, শেষে আছেন দাদা। কিন্তু দাদার পর আর একজন রয়েছেন যিনি দাদার হাত ধরে পুরো চেনটাকে ধরে রেখেছেন তাকে ঠিক বুঝতে পারছি না। আর সমুদ্র থেকে কী তুলবো তাও জানি না। তবে সমুদ্র থেকে কিছু একটা তুললাম এটা উপলব্ধি করলাম। প্রথমে শুভজিৎ-কে প্রশ্ন করলাম কী তুলেছি বলো। ও কিছু বলল না। এরপর দাদার কাছে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার হাত কে ধরেছিল? আর আমি কি তুললাম? দাদা কিছু না বলে হাসলেন শুধু। তারপর বরুণদা, অমরেশদা, রামরঞ্জন ইত্যাদি সবাইকে প্রশ্ন করলাম—আমি কি তুলেছি সমুদ্র থেকে? কেউ কিছু বলল না। তখন আমার মনে হল আমার প্রশ্নের উত্তর একমাত্র জয় দিতে পারবে। তাই জয়ের কাছে গেলাম।

জয়কে সব ঘটনা বললাম। ও সব শুনে হাসতে লাগলো। তাতে যেন আমার একটু অভিমান হল। কারণ মনে হতে লাগলো, আমার কথা কি কেউ বুঝতে পারছে না! তখন জয় বললো, তুমি দুঃখ পেয়েছো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন জয় বললো ওরা তো কেউ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। আমি উত্তরটা জানি। তাই তোমাকে আমার কাছে নিয়ে এলাম। বললাম, তাহলে উত্তরটা দাও। আমার আর ধৈর্য্য ধরছে না। জয় হেসে বলল, উত্তর দিতেই হবে? তুমি বুঝতে পারছো না? তবে শোন। তুমি যেটা সমুদ্র থেকে তুলেছ সেটা তোমার মন। আর ছোটমামা যার হাত ধরেছিল সে তোমার আপন সত্তা। তখন আমি বললাম, আমার আপন সত্তা তো তুমি গো। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ও আমাকে জাপটে জড়িয়ে

ধরলো। আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। মনে হল এই কথাটা সবাইকে বলতে হবে। মনে হবার সাথে সাথেই পাঠের সব মানুষের মুখ ফুটে উঠল। সবার মুখে অদ্ভুত তৃপ্তির হাসি।

জয় আমাকে ছাড়লো আর হাসতে হাসতে বলতে লাগলো, এবার বুঝেছ? বললাম, হ্যাঁ। এটাই হলো সমষ্টিচৈতন্যের সাথে একত্ব। তাই তো? আমি যখন তোমার সাথে এক হয়েছিলাম, বুঝতে পারলাম—তোমার আনন্দেই আমাদের সবার আনন্দ। এবার আবার জয় আমাকে জড়িয়ে ধরলো। কতক্ষণ এইভাবে ছিলাম জানি না। ঘুম ভাঙলো এক আশ্চর্য পরম আনন্দ নিয়ে।

---রাজীব রায়চৌধুরী
সখের বাজার

ব্যাখ্যা---

সংসারে বিষয় চিন্তা থেকে মন না তুলতে পারলে ঈশ্বরে মন দেব কী করে? মন তোলার জন্য হাতে হাত ধরে সম্মিলিত চর্চা ও নির্গুণের প্রসন্নতা লাভ প্রয়োজন। তখন আপন সত্তার পরিচয় লাভ করা যায়।

● দেখছি (3.06.21)—দূরে একটা জবা ফুলের গাছ। এক গাছ সোনালী রঙের ফুল। ফুলগুলো এখনও ফোটেনি। কাছে গিয়ে দেখি ফুলের মতো দেখতে ওগুলোর প্রত্যেকটা-ই ছোট্ট আমি। আমি হাত দিতেই ঐ সব ফুল ফুটে গেল। এবং প্রতিটা ফুল থেকে প্রচুর সোনালী আলোর জ্যোতি বের হতে লাগলো। এতো আলো যে তাকাতে পারছি না।....

---দীপঙ্কর বারিক
সুলতানপুর

ব্যাখ্যা---সাধারণ মানুষও মননের সাহায্যে নিজের চৈতন্য সত্তার বিকশিত রূপকে (ফুল) স্ব-স্বচেতন প্রক্রিয়ায় (Reflexive action-এ) অনুভবে (হাত দিয়ে ছুঁয়ে) সমর্থ হচ্ছে।

বহু ফুল কেন?—আমার বৃহৎ সত্তা ঐ সমষ্টিচৈতন্য—তাই সকলের স্বপ্নে নিজের চৈতন্য সত্তাকে অনুভব করছি।

নবীনা

হাত কাটা

● স্বপ্নে দেখছি ---(16/10/2021)—একটা বড় হলঘরে যাচ্ছি। একটা ১৩/১৪ বছরের ফ্রক পরা মেয়ে এল। মনে হল আমার কাজ হলো মেয়েটার ডান হাত কেটে ফেলা। মেয়েটাকে খুব নিজের মনে হচ্ছে। আমার কোন ভয় লাগছে না। একটা করাত দিয়ে খুব সহজেই ওর ডান হাত কেটে দিলাম। কোনও রক্ত বেরোলো না। এবার মনে হচ্ছে বাঁ হাতটাও কাটতে হবে। দু'বার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। একটু রক্ত বেরিয়ে গেল। ভাবলাম, এটা পরে হবে। ওকে পাশের ঘরে পাঠিয়ে দিলাম। ছেলে স্বপন বাইরে থেকে এল। হাত পা ধুতে বললাম। ঘরের ভিতর টিউবওয়েল রয়েছে। কল টিপে দিলাম। গরম জল পড়ল। বললাম, এতে হাত পা পুড়ে যাবে তো! ও বলল, না, না, ঠিক আছে।

---পুতুল দেবনাথ

সখের বাজার, কোলকাতা

ব্যাখ্যা---মেয়ে-দ্রষ্টার সত্তা। ডান হাত কাটা—বিচারাত্মক (intellectual) ব্যাখ্যা বর্জন করা। রক্ত পড়ল না—ক্ষতি হল না। বাম হাত কাটা—যে ব্যাখ্যা শুনে দেহ সাড়া দিচ্ছে পরে তাকেও অগ্রাহ্য করে বিচারাত্মক ব্যাখ্যা গ্রহণ করা। ছেলে স্বপন—নিজের মধ্যে স্বপ্নে সৃষ্ট আত্মিক জগৎ। কলের গরম জল---ভূগর্ভস্থ টাটকা জল---দেহস্থ চৈতন্যের সাম্প্রতিকতম বিকাশ—নির্গুণের তেজের প্রকাশ দ্রষ্টাকে অনুধ্যান করতে বলছে। এতে হাত পা পুড়বে না—দেহের ক্ষতি হবে না বরং গভীর তৃপ্তিলাভ হবে।।

● দেখছি (12.09.21)—একটা বিড়াল। সে মুখটা হাঁ করল। তীব্র আকর্ষণে তার মুখে ঢুকে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি অপূর্ব সুন্দর নীল পৃথিবী। পাশে আরও 4/5 জন পাঠের লোক পাশাপাশি হাত ধরে আছি। পরস্পরের মুখ দেখছি না। নীল পৃথিবীর দিকে দ্রুত এগোচ্ছি। মনে হচ্ছে হাত ছেড়ে দিলে আছাড় খেয়ে পড়ে মরব।....

ব্যাখ্যা---বিড়াল—সমষ্টিচৈতন্য। নীল পৃথিবী—একত্বের জগৎ। হাত ধরে এগোতে হবে—সমষ্টির সাধনের যুগে এককভাবে কেউ এগোতে পারবে না। পরস্পরের মুখ দেখছি না—আলোচনা ও মননের অভিমুখ একের দিকে।

---পিউ কয়াল
সখের বাজার

পদসেবা

● দেখছি (9.7.2021)—একটা পুকুর পাড়ে বিরাট বড় প্যাণ্ডেল করা হয়েছে। সেখানে অনেক মানুষ বসে আছে ঠাকুর জীবনকৃষ্ণের কথা শোনার জন্য। শ্রীজীবনকৃষ্ণ বাঁশ দিয়ে ঘেরা একটা জায়গার ভিতর বসে আছেন। আর বাইরে আমরা অনেকে বসে আছি। আমি বাঁশের কাছে বসে আছি। আর পিছনে একটা ছেলে বসে আছে। তার সামনে মদের বোতল নামানো। ছেলেটা মদ খেল আর ওখানে ঝামেলা করতে শুরু করলো। শ্রীজীবনকৃষ্ণ রাগত স্বরে কিন্তু আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত উঁচু করে মাতাল ছেলেটাকে বাইরে বের করে দিতে বললেন। আমি ঐ ছেলেটিকে আক্রমণ করলাম এবং মেরে শুইয়ে দিলাম।

এরপরের দৃশ্যে দেখছি ঐ প্যাণ্ডেলের নিচে আমি একাই শুয়ে আছি। হঠাৎ শ্রীজীবনকৃষ্ণ তরুণ রূপে আবির্ভূত হলেন। উনি আমাকে যেন দীক্ষা দেবেন। উনি আমার মাথাটা ওনার শরীরের নিম্নাংশে পেটের কাছে চেপে ধরলেন। উনি সম্পূর্ণ নগ্ন আছেন। আমি অনুভব করলাম উনি পুরুষ নন আবার নারীও নন। তারপর আমাকে বলছেন যেন কোন একটা মন্ত্র জপতে। আমি বললাম আমি আপনাকে পেয়েছি আর কোন মন্ত্র জপ করতে পারবো না। তখন আমার দর্শন হল প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণকে ও পরে বিদ্যাসাগরকে। আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওনাদের কেন দেখছি? উনি বসে আছেন, আর আমি ওনার পা টিপছি। কোন উত্তর দিলেন না। ঘুম ভাঙতেই মনে

হল উনি সচ্চিদানন্দ গুরু রূপে আমাকে যোগ দীক্ষা দিলেন আর উনিই আমার আপন সত্তা।....

---অভিজিৎ রায়
ইলামবাজার

ব্যাখ্যা---এখানে পুকুর হল ৩য় হালদার পুকুর—ধর্ম ও অনুভূতির ৩য় ভাগ। পুকুর পাড়ে প্যাণ্ডেল—যোগাঙ্গে ধর্ম ও অনুভূতির নতুন কথা ও ব্যাখ্যা। বাঁশের বেড়ার বাইরে আমরা—৩য় ভাগে আত্মিক একত্বের কথা বলা হলেও সাধারণ মানুষ জীবনকৃষ্ণকে আপন সত্তা ভাবতে পারে নি। মদ খেয়ে গোলমাল করতে শুরু করল—ব্যষ্টির সাধনের সংস্কার মাথায় থাকলে ঈশ্বরীয় কথা এলোমেলো হয়ে যায়, ঠিক মাতালের মতো। জীবনকৃষ্ণ বের করে দিতে বললেন—মাথা থেকে একত্ব বিরোধী সংস্কার ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু জোর করে তা বের করা যায় না, কেবল চেপে রাখা যায়—আক্রমণ করে শুইয়ে দিল। আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত তুললেন—সংস্কারকে আশীর্বাদ করছেন যাতে সংস্কারের বিভিন্ন দিক, কতদূর তার শিকড় বিস্তৃত, তার গভীরতা—সবটা যেন প্রকাশ পায়। তাহলে দেহী সংস্কারের negative দিক সম্বন্ধে সচেতন হবে ও তাকে বর্জন করতে সক্ষম হবে।

তরুণ জীবনকৃষ্ণ—সমষ্টি চৈতন্য। পেটে মাথা চেপে ধরলেন— বোঝালেন, মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড। তিনি মা—অখণ্ড চৈতন্য। উনি পুরুষও নন, নারীও নন—নারী পুরুষের ঊর্ধ্বে এক অখণ্ডচৈতন্য সত্তা। মন্ত্র দিলেন—সঠিক ভাবে মনন করার শিক্ষা দিচ্ছেন। রামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগরকে দর্শন হল, পরে তারা অদৃশ্য হলেন---ব্যষ্টির সংস্কার এবং পাণ্ডিত্যের দ্বারা (intellectualism) ব্যাখ্যা করার প্রবণতা উবে গেল। পা টিপছি—আত্মিক জগতে বোধের অগ্রগতি চাইছি। তখন "সচ্চিদানন্দ গুরু" থেকে "তিনি যে আপন সত্তা"—এই বোধে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

● দেখছি (12.9.21)—জীবনকৃষ্ণের সঙ্গে কথা হচ্ছে। উনি বললেন, What is the difference between soul and self? আমি বললাম, আমি পারবো না। আপনি বলুন। উনি বললেন, কাল পাঠে যাস। এটা নিয়ে আলোচনা হবে। কী আশ্চর্য পরদিন পাঠে বিষয়টা আলোচনা হয়েছিল। শেষে আমি আমার স্বপ্নটা বলেছিলাম।

মন্তব্য---Soul—একটি দেহে মনুষ্যজাতির প্রাণশক্তির সংকলিত ও পরিবর্তিত অবস্থা—আত্মা। Self—ঐ মানুষটির চিন্ময় রূপে বহু মানুষের আত্মিক সত্তা (Inner self) জেগে ওঠে—যেন ফলের মধ্যে আবদ্ধ সূর্যের তেজ জেগে উঠল। Your soul is the inner self of all beings—কথাটা বোঝা যায়।

---অর্পিতা চ্যাটার্জী
সখেরবাজার

মা ও দিদিমা

● দেখছি (14.08.21)—স্নেহময় কাকুর সাথে বাড়ি ফিরছি, ক্লাস করে। কাকু বলছে—একটা স্বপ্ন দেখেছি। দুটো ধড়হীন মাথা দুটো পৃথক বিষয় নিয়ে কথা বলছে। আমাকে কাকু বলল, এটার মানে কী? তারপর নিজেই উত্তরে বলল, এটা represent করছে inner self. তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা তাহলে এই দু'জন কি Super ego আর ego? কাকু বলল, হ্যাঁ, আমি বললাম, ego আর Super ego-র last formation কী হবে? অর্থাৎ Conversation কী type-এর হবে? কাকু বলল, দুজনেই normal conversation করবে।....

---অঙ্কনা মাইতি
কাষ্ঠডাঙা, কলকাতা

ব্যাখ্যা---Ego= Common মানুষের শুদ্ধ আমি—অনুচৈতন্য।

Super ego=একজনের শুদ্ধ আমি যিনি সমষ্টিচৈতন্য।

Normal conversation= স্বাভাবিক কথাবার্তা =সাধারণ মানুষ (তাদের অনুচৈতন্যের সাহায্যে) সমষ্টিচৈতন্যের কথা ধারণা করতে পারবে আবার সাধারণ মানুষের কথা বুঝে তিনি তাদের ত্রুটি সংশোধন করে দেবেন। last formation= পূর্ণ একত্ব হলে তার সাথে সম্পর্ক স্পষ্ট হবে, জানা যাবে তিনি আমার আপন সত্তা।

● দেখছি (13.08.21)—একটা বাড়িতে আছি। মনে হচ্ছে আমাদেরই বাড়ি। খাটে দিদিমা বসে আছে আমার একটা ছাপা শাড়ী পরে, আর

মেঝেতে মা বসে আছে আমার একটা সাদা শাড়ী পরে। দুজনের দুটোই নতুন শাড়ী। খুব সুন্দর দেখতে লাগছে দুজনকেই। মনে হচ্ছে এটা বিয়ে বাড়ি। কার বিয়ে ঠিক জানি না। তবে খুব আনন্দ হচ্ছে।....

---বিশাখা চ্যাটার্জী
বোলপুর

ব্যাখ্যা---দিদিমা=জগৎচৈতন্য-সগুণ ব্রহ্ম রূপে প্রকাশ—তাই ছাপা শাড়ি—নানা রূপ ও রঙের সমাহার। মা= সমষ্টিচৈতন্য, আমি তারই অনু-চৈতন্য। সাদা শাড়ি=সব রঙ মিলে গিয়ে সাদা হয়—ইনি একত্বের যোগমূর্তি। বিয়ে বাড়ি — একত্বের জগৎ। নীচে মেঝেয় বসে—"তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে তাই এসেছ নীচে।" সাধারণের কাছে ধরা দিচ্ছ, এক করে নিচ্ছ।

স্বাস্থ্যসাথী

● স্বপ্ন দেখছি (10.9.2021)—সামনে বাবা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বাস্তবে তিনি গত হয়েছেন। বাবাকে বললাম, তুমি বেঁচে আছো? এখন কোথায় থাকো? উনি যেখানে থাকেন তাঁর বিবরণ দিলেন। অমনি তা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। মনে হল আমাদের এই জগতের সঙ্গে সমান্তরাল কোনো এক জগৎ। বাবা বলল, তোদের এখানে স্বাস্থ্যসাথী হচ্ছে, আমি যে জগতে থাকি সেখানেও স্বাস্থ্যসাথী আছে। আমি বললাম, বাবা, আমার মাথাটা মাঝে মাঝে খুবই ডিসটার্ব করে। তারপর দেখছি—আমি চোখ বুজে আছি, উনি দুটো বুড়ো আঙুল দিয়ে আমার দুটো চোখ ম্যাসেজ করে পরে মাথার উপরের দিকে বাম দিকটায় হাত বুলিয়ে দিলেন। মনে হ'ল যেন কিছু চিকিৎসা করলেন।....

---বাপী পাল
হাওড়া

ব্যাখ্যা---বাবা যেখানে থাকেন সেই জগতের বিবরণ দিলেন ও বললেন, সেখানেও স্বাস্থ্যসাথী হচ্ছে—এখানে বাবা পরম এক যার আত্মিক জগতে প্রকৃত স্বাস্থ্যসাথী হয়—সমষ্টিচৈতন্য যা আমাদের স্বাস্থ্যের অবনতি হতে

দেয় না। অবনতি হওয়ার আগে আধারের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটিয়ে দেন। স্বাস্থ্যসাথী কী? শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে আর্থিক সাহায্য করা যাতে শরীর সুস্থ হয়ে কর্মে যুক্ত হতে পারে। আত্মিক চর্চার ফলে যে তেজ জাগে সেটা দেহ সহ্য করতে পারে না। আমাদের মন নিম্নমুখী বলে। ফলে আমাদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। আবার একে ঠিক করতে balance আনতে আত্মিক তেজই লাগে—যেমন লোহা দিয়েই লোহা কাটা হয়। স্বাস্থ্যের অবনতি দুদিক থেকেই। আত্মিক তেজ আমাদের দেহের সাময়িক অবনতি ঘটায়, আবার ভুল বা সংস্কারজ আত্মিক চর্চাও আত্মিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায়। তাই স্বাস্থ্যসাথী প্রয়োজন আর্থিক সহায়তা অর্থাৎ আত্মিক তেজের সহায়তা প্রদানের জন্য।

মাথাটা ডিসটার্ব কিন্তু চোখে ম্যাসাজ করে দিলেন—যদি আত্মিক চর্চা সংস্কারজ হয়ে যায় (paradoxical thought based on worldly logical interpretation) তখন মাথায় (ব্রেনে) আপাত বিরোধিতার সৃষ্টি হয়—ডিস্টার্ব হয়। এই বিরোধিতা দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য ঘটে।

মাথার বাম দিকটায় হাত বুলিয়ে দিলেন—ব্রেনের বাম দিক যুক্তিসহ আলোচনা করার ক্ষমতা দেয় যাতে আলোচনা বলিষ্ঠ রূপ পায় (The left brain handles reading, writing and calculation. It is called the logical side of the brain)।

সংস্কারজ ধারায় বা তথাকথিত প্রচলিত ভাবধারায় আত্মিক চর্চা আমাদের brain কে ডিস্টার্ব করে তোলে। এই আত্মিক চর্চা হল পূর্ণ আত্মিক জগতের (finest form) সমান্তরাল জগৎ। আমরা দল করি। তিনি তাঁর দলে (দল যদি থাকে তো আমি তোমার দলে—শ্রীমানিক।) সদস্য করার জন্য দৃষ্টি দান করছেন। চিরাচরিত আত্মিক জগৎ থেকে একত্বের জগতে উত্তীর্ণ হচ্ছি তাঁর কৃপায়। তখন মাথার ডিস্টার্বেন্স ঘুচবে ও তার একত্বকে বুঝবো তার দৃষ্টিতে। একত্বলাভ হলে, পৃথক সত্তা হারিয়ে যায় বটে, কিন্তু তন্মাত্র অবস্থায় নিজস্ব মনন বিশিষ্ট একটি বোধ থেকে যায়, তাই একত্বের মাধুর্য রস আস্বাদন করা যায়।

● দেখছি---দুর্গা রূপী জীবনকৃষ্ণ ত্রিশূল দিয়ে অসুর বধ করছেন। অসুরের জায়গায় রয়েছে ‘‘আমি’’ কথাটা লেখা। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক,

গণেশের জায়গায় শ্রীকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, যীশু ও অস্পষ্ট এক ব্যক্তিকে দেখা গেল। নীল রঙের চালচিত্রে লেখা রয়েছে নির্গুণ।.....ঘুম ভাঙল।

---স্বর্ণদেব চ্যাটার্জী
বেলঘড়িয়া

ব্যাখ্যা---শ্রীজীবনকৃষ্ণ আমাদের ক্ষুদ্র ‘‘আমি’’ নাশ করছেন। তাঁকে জানার জন্য বোধের উত্তরণ দরকার। প্রথমে তিনি ইষ্ট (শ্রীকৃষ্ণ) পরে সচ্চিদানন্দ গুরু (শ্রীরামকৃষ্ণ), পরে তত্ত্বজ্ঞানে ঈশ্বর কর্তা আমি অকর্তা বোধের জাগরণে জাগতিক কামনা থেকে মনের পরিত্রাণ ঘটে (যীশু), তারও পরে শ্রীভগবানের শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর রসের লীলা উপভোগের (অস্পষ্ট মানব মূর্তি) শেষে শ্রী জীবনকৃষ্ণকে জানা যায় পরম এক বা জগতাত্মা রূপে (দেবী দুর্গা)। চালচিত্রে লেখা রয়েছে নির্গুণ—এই জগতাত্মা নির্গুণে বিধৃত, নির্গুণের শক্তিতে তিনি শক্তিময়ী।।

নিত্যরাধা

● দেখছি (8.10.2021)—দুধ জ্বাল দিতে দিতে আপন মনে গান করছি—‘‘যদি জানতেম আমার কীসের ব্যাথা তোমায় জানাতাম। কে যে আমায় কাঁদায়, আমি কী জানি তার নাম....’’

আমার সামনে কাঁচের জানালা, বাইরেটা আলো আঁধার, তারপর প্রতিবেশীদের ইঁটের দেওয়াল। হঠাৎ কাঁচের দিকে তাকালাম, আমার মুখ দেখতে পাচ্ছি আর ঠিক আমার পিছনেই যেন আমারই অনেক বড় আবছা অবয়ব দেখছি। কী দেখলাম, ভালো করে দেখতে গিয়ে দেখতে পেলাম আমার ঠিক মাথার পিছনে জীবনকৃষ্ণের অবয়ব। শরীরে শিহরণ খেলে গেল। পরক্ষণে আর দেখতে পেলাম না কিছু।....

---মৌসুমী সিংহ জানা
বাউড়িয়া, হাওড়া

মন্তব্য---কবি আক্ষেপ করেছেন এই গানে। এ যুগে সাধারণ মানুষও জানতে পারছে তার নাম ও রূপ এবং তাকে আপন বৃহৎ সত্তা বলে জানতে পারছে।

● নিত্য রাধা ও নিত্য রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গে রাত্রে আলোচনা করতে করতে দর্শন হ'ল (4.6.2021)—একটা পাত্রে জল রাখা আছে। তাতে কেউ এক ফোঁটা নীল রঙ ফেলে দিয়ে গুলে দিল। জলটা নীল হয়ে গেল। তারপর ঐ জলটা একটা মানুষের আকৃতির বোতলে ঢালা হল। যখন জলটা ঢালা হচ্ছে দেখলাম জলটা বেশ ঘন হয়ে গেছে। যেন সুগারের ঘন দ্রবণ, Caramel-এর মতো।

---রোহিণী সিনহা
দক্ষিণেশ্বর

ব্যাখ্যা---রাধা—দেহ। নিত্যরাধা—শ্রী জীবনকৃষ্ণের দেহের চিন্ময় রূপ যখন সর্বজনীন ও সর্বকালীন হ'ল তিনি নিত্যরাধা হলেন। নিত্য রাধাকৃষ্ণ—তিনি নির্গুণে লীন হলে তার আত্মিক দেহের বিশেষ পরিবর্তন ঘটলো ও তাঁর জগৎব্যাপ্ত চৈতন্যকে তিনি নিজের মধ্যে টেনে নিলেন। তিনি দেহবান ব্রহ্ম হলেন—এটি নিত্য রাধাকৃষ্ণ অবস্থা। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—তিনিই নিত্যরাধা, তিনিই নিত্য রাধাকৃষ্ণ।

আদর্শ

● আজ (23.06.2021)—পাঠ শুনতে শুনতে আশ্চর্য এক দর্শন হ'ল। সবিতা পালের স্বপ্ন পড়া হচ্ছিল। ব্যাখ্যায়, ''Community health officer' অর্থাৎ সমষ্টিচৈতন্য U.C দেবেন হেড অফিসে''—এসব কথা হচ্ছিল। তখন হঠাৎ দেখি—একটা স্টেজের উপর একটা ঝাড় লণ্ঠন। খেয়াল করে দেখি ওটা আর কিছুই নয়, শ্রীজীবনকৃষ্ণের অসংখ্য চোখের সমষ্টি। সেখান থেকে আলো বেরোচ্ছে। অন্য কোনো আলো নেই। মঞ্চে চেয়ারে বসে আছে জয়। সামনে একটা টেবিল। সাদা কাপড়ে ঢাকা। আমরা অনেকে নীচে বসে আছি। জয় কতকগুলো সার্টিফিকেট লিখে এক একজনকে নাম ধরে ডাকছে। আর একজন করে উঠে গিয়ে ঐ সার্টিফিকেট নিয়ে আসছে। জীবনকৃষ্ণ অসংখ্য চোখ দিয়ে যেন দেখছেন জয় কী লিখছে।....

---সঞ্চিতা চ্যাটার্জী
বোলপুর

ব্যাখ্যা---অসংখ্য চোখ অর্থাৎ সহস্রচক্ষু পুরুষ শ্রীজীবনকৃষ্ণ—তিনি জগৎচৈতন্য রূপে প্রকাশ পেয়েছেন। জয়—C.H.O-সমষ্টিচৈতন্য। U.C দেবেন—কার কতটা ঈশ্বরতত্ত্ব ধারণা হয়েছে, একত্ব বোধ হয়েছে ও তা ব্যবহারিক জীবনে প্রতিফলিত হচ্ছে তা জানিয়ে দেবেন। হেড অফিস—মনুষ্যজাতি। অসংখ্য চোখ থেকে আলো আসছে—যে জ্ঞানের আলো দান করেছেন নিজের ও অন্যদের দর্শন অনুভূতি ধরে তারই মূল্যায়ন চলছে।

● দেখছি (2.7.2021)—রাত্রি বেলা আমি কারও সাথে চ্যাট করছি। পাশে বসে জয়ও কাউকে মেসেজ পাঠাচ্ছে। সে-ও উত্তর দিচ্ছে। মনে হল ৯/১০ বছরের একটি ছেলের সঙ্গে ও চ্যাট করছে। জিজ্ঞাসা করলাম, ঐ ছেলেটি কে যার সঙ্গে তুমি চ্যাট করছ? জয় বলল, ও একটা আদর্শ। আমি নিজেকে ঐ আদর্শের সঙ্গে Connect (সংযুক্ত) করছি। রাত্রি বেলা অন্য কারও সঙ্গে চ্যাট করার দরকার নেই। .....ঘুম ভাঙলো।

---স্নেহময় গাঙ্গুলী
চারুপল্লী

ব্যাখ্যা---১) ধর্মজগতে নতুন আদর্শ সৃষ্টি হতে চলেছে।

২) রাত্রে শুতে যাবার আগে বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে কারও সাথে চ্যাট করা আধ্যাত্মিক জগতের মানুষদের পক্ষে অনুচিত কাজ।

রাজযোগ

● দুপুর বেলা স্বপ্ন দেখছি (27.05.21)—একটি হলঘরে পাঠ হচ্ছে। প্রজেক্টারের মাধ্যমে বড় স্ক্রীনে হিন্দীতে কথামৃতের বাণীগুলো দেখাচ্ছে আর বাংলায় ব্যাখ্যা করছেন স্নেহময় স্যার। ঘরভর্তি ভক্ত। এমন সময় যমরাজ এসে স্যারকে বলছে, দীপঙ্করকে নিয়ে যাব। স্যার বললেন, এখন পাঠ চলছে, এখন নিয়ে যাওয়া হবে না। একথা শুনে যমরাজ বলল, যদি ওর রাজযোগ হ'ত তাহলে নিয়ে যেতে পারতাম না। সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রীনে হিন্দীতে ''রাজযোগ'' কথাটা ফুটে উঠল এবং আমার সারা শরীরে কী যেন

ঘটল, শরীর রক্তবর্ণ হয়ে গেল।....ঘুম ভাঙার পর সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যাথা অনুভব করেছিলাম অনেকক্ষণ।

---দীপঙ্কর বারিক
সুলতানপুর, বীরভূম

ব্যাখ্যা---রাষ্ট্রভাষা হিন্দীতে রাজযোগ কথাটা ফুটে উঠল—সাধারণ মানুষের রাজযোগ হওয়ার সূচনা হল। তাই শরীর রক্তবর্ণ হয়ে গেল। এর ফলে তাদের আত্মিক পরিবর্তন স্থায়ী হবে। আত্মিকে মৃত্যু হবে না—যোগ বিচ্যুতি হবে না। এটি একটি যুগান্তকারী স্বপ্ন। এখানে যমরাজ হলেন মায়া।

● 27/05/2021, জেঠু একটা স্বপ্ন বলল—একটা পিঁপড়ে একটা গাছের পাতায় বসে একটা সোনার দুল তৈরী করে ফেলল। একটু পর অন্য একটি পাতায় অন্য আরেকটি পিঁপড়ে, আগের মত বড় আকৃতির, ঘোরাঘুরি করতে করতে দুটি সুন্দর সোনার রিং বানালো। সেখান থেকে আলো ঠিকরাচ্ছে। পিঁপড়েটা খুব হাসছে—কী মিষ্টি হাসি। জেঠু বলল, জীবনকৃষ্ণ যে পূর্ণ তা বোঝালেন ঐ গোল সোনার রিং দেখিয়ে। পরে সমষ্টিচৈতন্য রূপে তিনি নিজে পূর্ণ ও অপর মানুষকে পূর্ণতা দানে সক্ষম সেকথা যেন বোঝাতে চাইছেন। অমনি আমি দেখলাম, জয়দা সাদা জামা পরে আমাকে জড়িয়ে ধরলো আর হাসতে লাগলো। মনে হলো অনেক বছর আগে জেঠু যে স্বপ্নে পিঁপড়ের হাসি দেখেছিল জয়দার মুখে সেই হাসিই আমি দেখছি। ....প্রচণ্ড আনন্দ হল।

---সায়েরী রাউত
বেহালা

নতুন বাঁধাকপি

● দেখছি (23.09.21)—একজন একটা বাঁধাকপি কাটছে এবং তার ভেতর থেকে বেগুন বের হচ্ছে। সেটা দেখে আমি অবাক হচ্ছি। আরেকজনকে বলছি দেখো দেখো কী আশ্চর্য বাঁধাকপির ভেতরে বেগুন রয়েছে। ও বিশ্বাস করল না। তখন আমি তাকে দেখালাম একটা লাল জবা গাছে নীল

ফুল ফুটেছে। ও তখন যে বাঁধাকপি কাটছিল তাকে বলল, আমারও ঐ রকম বাঁধাকপি চাই। সে তখন ওকে ঐ রকম কিছু বাঁধাকপি দিল।

দৃশ্য বদলে গেল। দেখলাম সাদা হাফ প্যান্ট পরে জয় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ও কাছে এল। তখন দেখি ফুলপ্যান্ট পরে আছে। মুখটা স্পষ্ট দেখছি না কিন্তু জয় বলেই মনে হচ্ছে। আমার ঘাড়ের কাছে একটা কাটা জায়গায় সেলাই করা ছিল সেখানে ও নতুন করে সেলাই করে দিল। আমার ছেলে কৌশিক কম্পিউটারে ওই সেলাইটা আমাকে দেখালো। শরীরের ওখানে যে কাটা ছিল সেটা আর বোঝা যাচ্ছে না।....

---চন্দ্রা ঠাকুর
দীঘা, বীরভূম

ব্যাখ্যা---বাঁধাকপির ভিতর থেকে বেগুন বার হচ্ছে—সহস্রারে নির্গুণের দ্বার খুলে গেছে। তাই অসম্ভব সম্ভব হচ্ছে—লাল জবা গাছে নীল ফুল ফুটেছে। নতুন করে সেলাই করল, কাটার চিহ্ন রইল না—দেহ ত্রুটি মুক্ত করে দিল যাতে একত্বের ধর্ম ধারণা করতে পারে।

● দেখছি (23.11.20)—স্নেহময় কাকু পাঠ করছে। অনেকে শুনছে। কাকুকে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না। অনেক কথার মধ্যে একটা কথা আমাকে নাড়া দিল। উনি বললেন, ''নির্গুণের তেজ জাগ্রত হলে দেহের ক্ষয় বন্ধ হয়ে যায় ও বহির্মুখীনতা চলে যায়।'' দরজার ধারে কয়েকজন মহিলা ছিলেন—বিবাহিত। ওরা বলল, পাঠটা এত ভালো লাগছে—চল ভিতরে যাই, বাইরে ঠাণ্ডা লাগছে। ওরা ভিতরে এল।.....ঘুম ভাঙল।

---অর্ণব পাল
জিনাইপুর, বীরভূম

ব্যাখ্যা---স্নেহময় কাকু---সমষ্টি চৈতন্যের প্রতীক। বিবাহিত মহিলারা—যারা জীবনকৃষ্ণকে দেখে দ্বৈতবাদে ছিলেন। তারা আরও গভীরে গিয়ে একজ্ঞান ধারণা করতে পারবেন এবার।

বই রক্ষা

● দেখছি (10.10.21)—দুর্গা পুজোয় নব পত্রিকা আনা হয়েছে। লাল পাড় সাদা শাড়ি পড়ানো নব পত্রিকার ঘোমটার ভিতর কলা বউয়ের পরিবর্তে গণেশের মুখ।.....

---সৌমী সেনগুপ্ত
বোলপুর

ব্যাখ্যা---
কলা বৌ—ভক্ত। গণেশ—ভগবান। একত্বে ভক্ত ভগবান নেই। 'এক রাম-ই সব হয়েছেন'—শ্রীরামকৃষ্ণ।

● দেখছি (25.9.2021)—একটা বাড়ি। বাড়িতে একটাই ঘর। একটাই বারান্দা। বাড়ির চালটা অনেকটা ঢালু হয়ে বারান্দায় এসেছে। ওটা যেন চৈতন্যদেবের বাড়ি। যদিও গৃহস্থ চৈতন্যদেবের মতো দেখতে নন। ঐ ঘরে প্রচুর বই রাখা আছে। ওনার মা আর দাদা কেউ একজন বলছে, চৈতন্য কী বোকা, নিজের Safety-র (সুরক্ষার) কথা না ভেবে বারান্দায় থাকে অথচ প্রচণ্ড বৃষ্টিতে বইগুলো যেন ভিজে নষ্ট না হয় সেইজন্য ওগুলোকে ঘরে রেখেছে।...

---সোমা পাল (বসাক)
আমতলা, দ: ২৪ পরগণা

ব্যাখ্যা---বাড়ি-দেহ-বিশেষ দেহ।
চৈতন্যদেব—জাগ্রত চৈতন্যের মূর্ত রূপ—সমষ্টি চৈতন্য। তাই চৈতন্যের মতো দেখতে নয়। ঘরের ভিতর বই—তাঁর সহস্রারে সঞ্চিত আত্মিক জ্ঞান। বারান্দা—তার সামান্য ব্যবহারিক জীবন। এই পুরুষের আত্মিক জগৎ তথা আত্মিক জ্ঞান রক্ষাতেই সর্বোচ্চ হুঁশ থাকে কিন্তু ব্যবহারিক জগতের বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকেন।

● দেখছি (10.10.21)—প্রশান্তদা এসে বলল, স্বপ্নে মা সরস্বতী আমাকে বলল, তুই কৃষ্ণাকে আত্মিক ঐশ্বর্য দান করবি। তখন আমি বললাম, এর মানে আমাকে প্রসন্নতা প্রাপ্ত ব্যক্তির কাছ থেকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান নিতে

হবে, উপদেশ নিতে হবে। ঈশ্বরীয় কথা শুনতে হবে। ....ঘুম ভাঙল।

---কৃষ্ণা ব্যানার্জী
বোলপুর

নতুন ভাবে স্মৃতিচারণ

● কাল (15.10.21) একটা স্বপ্ন দেখলাম—দেখছি, বাবার স্মৃতিচারণের অনুষ্ঠান হবে। কিন্তু নিয়ম হচ্ছে প্রতিদিন এক পৃষ্ঠা লিখে এনে পাঠ করতে হবে। স্মৃতিচারণ একদিনেই শেষ নয়। বাবার একটা ডায়েরী ছিল। আমি তাতেই এক পাতা করে লিখে আনছি আর পড়ছি। এ রকম দু'তিনদিন হল। তারপর দেখছি ডায়েরীটা বাবা নিয়ে চলে গেছে। আমি বাবার কাছে গিয়ে বললাম, ডায়েরীটা দাও। ওতে লিখতে হবে। তখন বাবা বলল, না, ওতে আর লেখা যাবে না। এবার নিজের ডায়েরীতে লিখে পাঠ করবি। আমি বললাম, ঠিক আছে, তাই হবে।

---অমরেশ চ্যাটার্জী
ইলামবাজার

ব্যাখ্যা—এখানে চর্চার দুটি পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে। প্রথমে জীবনকৃষ্ণের বলা ও লেখা বিষয়গুলো re-read করতে হবে। ২য় পর্যায়ে নির্গুণের শক্তিতে নিজস্ব মনন শক্তি জন্ম নিচ্ছে, আর তা যুক্ত করে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অলোচনা করতে হবে ও লিখতে হবে।

● গত 7.11.2021 তারিখে স্বপ্ন দেখছি—বন্যা হয়েছে। আমি আমার বাড়ির ছাদ থেকে এই দৃশ্য দেখছি। কিভাবে যে বন্যা হল তা আমি জানি না। প্রায় বাড়ির ছাদ সমান জল, দেখছি চারিদিকে থৈ থৈ করছে। আমাদের বাড়ির কাছেই আছে একটি বিশেষ ধর্মীয় স্থান যেখানে কালীমন্দির ও শিব মন্দির আছে, আবার কীর্তনও হয়। দেখছি কয়েকটি ঢেউ মিলে এই ধর্মীয় স্থানের একটার পর একটা অংশ ভেঙে দিচ্ছে। আর কিন্তু কোথাও জলের ঢেউ দেখতে পাচ্ছি না।

---সনাতন সাহা
পাটুলি, কাটোয়া

ব্যাখ্যা---বন্যা—কৃপা বন্যা।

ধর্মীয় স্থান ভেঙে দিচ্ছে—দ্রষ্টার মাথা থেকে সংস্কারজ হিন্দুধর্ম উচ্ছেদ হতে শুরু হয়েছে। হিন্দু সংস্কৃতি ও জীবন-ধারা (Way of life) অবলম্বন করলেও হিন্দুত্বের সংস্কার বর্জন হচ্ছে।

পাঠ প্রসঙ্গে

পাঠ প্রসঙ্গে

পাঠ ও আলোচনা প্রসঙ্গে যে সব নতুন ভাবনা উঠে আসে তারই কিছু কিছু সংকলিত হল এই অধ্যায়ে।

১. মুক্তি ঃ ভারতবর্ষে প্রচলিত ধারণা হ'ল দেবস্থানে পুণ্য ভূমিতে মারা গেলে মুক্তি হয়। অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যান ঐ মানুষটি। যেমন বলা হয় কাশীতে মরলে মুক্তি হবে, গঙ্গার ধারে মরলে মুক্তি হবে ইত্যাদি। এই সংস্কার থেকে মুক্ত হতে হবে। জানতে হবে মরে গিয়ে মুক্তি নয়, জীবদ্দশায় মুক্তি।

নিরীশ্বরবাদী ধর্মে যেমন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে জোর দেওয়া হয়েছে লোভ ও কামনা বাসনা থেকে মুক্তির উপর। অর্থাৎ নির্বাসনা হওয়াই মুক্তি। এটি মুক্তির অপর একটি দিক।।

বেদ বলছে জীবদ্দশায় জীবন্মুক্তি লাভ করতে হবে, মৃত্যুর পর নয়। আর তা হয় ভগবান দর্শন হলে। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম এই ভগবান দর্শন হ'ল। কিন্তু শ্রী জীবনকৃষ্ণ ভগবান দর্শন করে ভগবানে পরিবর্তিত হয়ে অজস্র মানুষের অন্তরে চিন্ময় রূপ ধরে ফুটে উঠলেন। এইভাবে আত্মিকে মনুষ্যজাতির সাথে এক হওয়াই প্রকৃত মুক্তি।

সাধারণ মানুষ মুক্তির আভাস পেলেন ঐ সর্বজনীন হওয়া মুক্ত পুরুষ শ্রীজীবনকৃষ্ণকে অন্তরে দেখে। শ্রীজীবনকৃষ্ণকে ভগবান রূপে ভিতরে দর্শন করলেন। পরে জানলেন ঐ রূপই তাদের সত্য রূপ (Real form) তথা আত্মিক রূপ।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ হয়ে উঠেছেন আত্মার রূপ এবং আত্মিক জগতের রূপ। জানা গেল তাঁর সৃষ্ট আত্মিক জগৎ যা তারই রূপে প্রকাশ পায় তার মধ্যে প্রবেশ ও প্রাণশক্তির বিকাশে ঐ জগতের পরিচয় লাভেই মুক্তি ঘটে সাধারণ মানুষের। তারা দেখে ঐ জগতে মনুষ্যজাতির সকলে মিলেমিশে এক হয়ে আছে। Computer-এর ভাষায় যেন সকলের IP Address এক হয়ে গেছে। সকলের সাথে এই আত্মিক একত্ব বোধ-ই মুক্তির চূড়ান্ত পর্যায়।

এই পর্যায়ে এসে অনুভব করা যায়, আপনা হতে লোভ ও কামনা বাসনা ধীরে ধীরে উবে গিয়ে তা নগণ্য (minimal) হয়ে গেছে। আর সর্বপ্রকার সংস্কারের বন্ধন থেকে তার মুক্তি ঘটেছে।

আত্মিক তেজ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্মিক জগৎ দর্শনের ক্ষেত্রে দৃষ্টির focus area বাড়ে ও তিলে তিলে আত্মিক জগতের Unexplored zone কে explore করার মধ্যে দিয়ে মুক্তির স্বাদ অনুভব হয়।

এই ক্রমমুক্তি চলতেই থাকে ও উপলব্ধির একস্তর থেকে অন্যস্তরে উত্তরণ হতে থাকে। প্রচলিত ধর্মে মরে গিয়ে বহির্জগতে পঞ্চভূতে লীন হওয়াকে মুক্তি বলে অভিহিত করা হয়। যা সত্য নয়। মুক্তি হল আত্মিক জগতে নিজের চৈতন্য সত্তা বিলীন হওয়া। আত্মিক জগতের সঙ্গে সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত হলে, ও সেই জগতের নিজস্ব স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ সাধারণ মানুষের জীবনে কার্যকরী হলে মুক্তির পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পায়।।

২. মায়ার ক্রিয়া ও মায়ের সংস্কার ঃ আমি ঠিক করলুম কৈবর্তের ভাত আর খাব না। বৃন্দাবনে গঙ্গামায়ীর কাছে থাকবো.....কিন্তু মা-কে মনে পড়ল আর বৃন্দাবনে থাকা হল না। —শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রী জীবনকৃষ্ণ বলেন, ঠাকুর এখানে সংস্কারের কথা বলছেন। আর সেই সংস্কারের জন্য তিনি ফিরে এলেন। কোন রকম সংস্কার থাকলে ব্রহ্মজ্ঞান হবে না।

আমাদের সব কাজকর্মই সংস্কারের অধীন। ঠাকুর এখানে মায়ের সংস্কার থাকার জন্য দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন। মায়ের সংস্কারটা কী?

মা চন্দ্রমণি দেবীকে মনে পড়ায়, আমি মায়ের সন্তান, মা আমার পরম আশ্রয়, এই বোধ জাগছে। তিনি মহাযোগী, তার স্থূলমন নেই, আছে সূক্ষ্ম মন। তাই স্থূল জগতে বেশীক্ষণ থাকতে না পেরে মন দ্রুত চলে আসে আত্মিকে। সেখানেও ঐ সন্তান ভাব থেকে যাচ্ছে ব্রেনে, মায়ের সংস্কার সৃষ্টি হওয়ায়। তখন বোধ হচ্ছে তিনি জগজ্জননী ভবতারিণীর সন্তান। বলছেন, ছোট ছেলের মা-কে চাই না? আমার মা সব জানে। তিনি আমাকে বেদ পুরাণ তন্ত্রে যা সত্য আছে দেখিয়ে দিয়েছেন—ইত্যাদি। এই ভবতারিণীর কথা মনে পড়ায় তার মন নেমে যাচ্ছে পঞ্চমভূমিতে।

ভক্ত ভগবানের মিলন ক্ষেত্র হল শ্রীবৃন্দাবন। সেখানে থাকার সময় তাঁর মন ঈশ্বরের সাথে মধুরভাবে সম্পৃক্ত হয়েছিল। উচ্চ ভূমিতে অবস্থান

করছিল। কিন্তু মা-কে মনে পড়ায় ও সংস্কারের বাধা অতিক্রম করতে না পারায় ''আমি ঈশ্বরের সন্তান'' জ্ঞান হ'ল ও মন নেমে গেল। বাইরের জগতে মা সবচেয়ে সম্মানীয় ও আদরণীয় কিন্তু আত্মিকে এই মা বোধ, তিনি আমার স্রষ্টা বোধ ঈশ্বরত্ব লাভের পথে বাধা। সাধক যখন উপলব্ধি করবেন সকলে যার সন্তান সেই পরমপিতা ঈশ্বর ও তিনি এক-বাইরের মা-ও তার সৃষ্টি, তার সন্তান, তখন তার ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান হবে। মায়া মুক্ত হয়ে তিনি জানবেন তারই প্রয়োজনে তিনি মা-কে অর্থাৎ মায়া (মা-রূপী মায়া)-কে সৃষ্টি করে নিয়েছেন।

শ্রী জীবনকৃষ্ণ মাত্র আড়াই মাস বয়সে মা-কে হারান। তাই মায়ের সংস্কার তার মাথায় গভীর ছাপ ফেলেনি। কিন্তু তিনি মাসী মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়েছেন, তাই মাসীমাকে মাতৃজ্ঞান করেছেন এবং তা মাথায় ছাপ ফেলেছে। তিনি দুধ অর্থাৎ তেজ দান করেছেন। কিন্তু এই তেজ খাদযুক্ত। কেননা সেখানে মায়া ক্রিয়া করেছে। ফলে মাসীমা নয় ঈশ্বরই তাকে তেজ যুগিয়েছেন আর সেই ঈশ্বরই তার স্বরূপ—এই বোধ লাভে তথা ব্রহ্মজ্ঞান লাভে বাধা সৃষ্টি হয়েছে। ব্রহ্মবিদ জানেন, তিনি সূর্যের মতো, নিজের ভিতর থেকেই তেজ লাভ করেন। অন্যেরা তার কাছ থেকে তেজ পায়। তাকে অন্তরে দর্শন করে সাধারণ মানুষ যখন বোঝে তারা এই অমৃত পুরুষের সন্তান তথা এই অমৃত পুরুষই তাদের আপন বৃহৎ সত্তা তখন তারাও দ্বিতীয় স্তরে মায়ামুক্ত হয়, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে।

মায়া ঈশ্বর সৃষ্ট এক চৈতন্য সত্তা। পুরাণ মতে ভগবান বিষ্ণুই এই মায়া সৃষ্টি করেছেন। মায়া মানুষকে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে দেয়, মনন করতে বাধ্য করে। মনন বা deep thinking না থাকলে মানুষ চেতনার একটা স্তরে আটকে থাকে। তুচ্ছ জিনিসকে বিরাট ভেবে মানুষ ঠকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাঠে এই আলোচনা চলার সময় অনিন্দিতা দে-র একটি দর্শন হয়। ও দেখেছে—''জয়দা যখন বলল, শ্রীবিষ্ণু মায়া সৃষ্টি করেছেন, তখন দর্শন হল—বিশাল সমুদ্র। মাঝে একটা পাথর আর তার উপর জয়দা দাঁড়িয়ে। সাদা জামা প্যান্ট পরে, চারটে হাত ঠিক যেমন নারায়ণের ছবি দেখি সেই রূপ। অবাক হয়ে দেখছি। কিছুক্ষণ পর দর্শন মিলিয়ে গেল। শরীরটা যেন অসাড় হয়ে গেল।''

যাই হোক, আমরা বলি, চাঁদের আলো মায়ার উপমা। জ্যোৎস্নালোকিত

মায়াবী রাতের আলো-আঁধারীতে বিভ্রান্ত না হয়ে যিনি নিরন্তর গভীর মননের মধ্যে থাকেন তিনি একসময় চেতনার শিখরে উঠে ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ নিজের ঈশ্বরত্ব উপলব্ধি করেন, যেন Sun rise point-এ উঠে সূর্যোদয় প্রত্যক্ষ করেন। তখন পিছন ফিরে তার অতিক্রান্ত পথে সংস্কারের যে বাধাগুলি ছিল তাদের স্বরূপ সূর্যালোকে স্পষ্ট জানতে পারেন।

১৯৪৫ সালে শ্রী জীবনকৃষ্ণ এক স্বপ্নে দেখলেন, একটা কুঁড়ে ঘর, তিনি যেন দু'হাত তুলে বিভোর হয়ে সেই ঘরের সামনে নাচছেন। এমন সময় তার মাসীমা কেটের কাপড় পরে এসে তাকে প্রণাম করে চলে গেলেন। তিনি বুঝলেন, মাসীমারূপী মায়া যা পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভে বাধা সৃষ্টি করেছিল তা নত হয়ে মাথা থেকেই চলে গেল।

৩. দক্ষিণামূর্তি দর্শন ও তার অর্থ ভাবতে গিয়ে গোপালকে দর্শন ঃ ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৬২, দুপুরবেলা শ্রী জীবনকৃষ্ণের ধ্যানে দর্শন হল একজন লোককে, পাড়ার লোকে তাকে দক্ষিণা বলে ডাকতো। পরদিন এই দক্ষিণামূর্তি দর্শনের কথা শুনে ধীরেনবাবু বললেন, শঙ্করের দক্ষিণামূর্তি ধ্যানের কথা আছে। সেখানে দক্ষিণামূর্তিকে জগৎগুরু বলা হয়েছে। জীবনকৃষ্ণ বললেন, তিনি নিজেও ঠিক সেই কথা ভেবেছিলেন। আর জগৎগুরুর কথা ভাবা মাত্র তার মাথায় গোপালের মূর্তি ফুটে উঠল।

গো শব্দের অর্থ জগৎ। তাই গোপাল মানে জগৎকে যিনি পালন করেন। পালন করা মানে Control করাও হয়।

আত্মিকে যদি কারও শিবত্ব লাভ হয় ও সে জোর করে সকলকে তার অধীনে আনে, তাদের ভালো করতে চায় তাতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় না। একটা ভালো হয় তো অন্য জায়গায় প্রতিক্রিয়াটা খারাপ হয়। এটি শিবের রুদ্র অবস্থা। বাইরেও যেমন আলেকজাণ্ডার, এটিলা, জার, কাইজার ইত্যাদি War lords রা জগৎকে একটি লোকের শাসনাধীনে আনতে চেয়েছিলেন, ভেবেছিলেন এতে জগতে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি আসবে। কিন্তু উল্টে তারা মানুষকে কাঁদিয়েছেন। রুদ্র-যিনি রোদন করান।

বিভিন্ন পুরাণ কাহিনীতেও বলা হয়েছে শিব তার ইচ্ছা বাইরে প্রকাশ করে দেন, ভক্তকে বর দান করেন। কখনও কখনও সেই বরের অপপ্রয়োগের ফলে অশান্তি সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত বিষ্ণু এসে পরিস্থিতি সামাল দেন ও শান্তি স্থাপিত হয়। শিব সক্রিয়, তার ক্রিয়া direct কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত নন।

কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর ক্রিয়া অলক্ষ্যে চলেছে, তিনি নির্লিপ্ত, যেন তিনি যুদ্ধ করছেন না অথচ দেবত্ব ও জীবত্বের লড়াইয়ে তিনিই নির্ণায়ক।

শিবের অপর রূপ হল, শান্ত রূপ, দাক্ষিণ্য রূপ। দাক্ষিণ্যের দ্বারা জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে। তাই বেদে বলেছে, "রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।" তোমার দাক্ষিণ্য মূর্তি, প্রসন্ন মূর্তি দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা করো। দক্ষিণা কালী মৃত্যুর প্রতীক—তুমি কালাতীত—সেই মৃত্যুঞ্জয় রূপ দর্শনে আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করো।

শ্রী জীবনকৃষ্ণ দক্ষিণাকে দেখে সেই শিবত্ব তথা জগৎ গুরু অবস্থা সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে গোপালকে দেখলেন। চমকে গেলেন। বুঝলেন তার শিবত্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে শিবের শান্তরূপ তথা বিষ্ণুত্ব লাভ হয়েছে। যেখানে শিবত্বের একীকরণ ক্রিয়া automatic reflex action- এ হবে। তিনি থাকবেন নির্বিকার নির্লিপ্ত। অন্যথায় সব ক্রিয়া তার গোচরে হলে তার দেহ ফেটে যাবে।

৪. ছাগলের পালে বাঘ পড়া ঃ মানুষ নিজের স্বরূপ ভুলে কিছু বৈধী ক্রিয়া কর্ম ও সংসারের কাজ নিয়ে আছে, এটি বোঝাতে শ্রীরামকৃষ্ণ ছাগলের পালে বাঘ পড়া, বাঘ বাচ্চার ছাগলের সাথে বড় হওয়া ও শেষে নতুন এক বাঘ এসে তার স্বরূপ চিনিয়ে দেওয়ার গল্পটি নিজস্ব ভঙ্গিমায় পরিবেশন করেছেন।

এই গল্প বলে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, মানুষ স্বরূপত ব্রহ্ম। কিন্তু নিজের ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টা না করে মানুষ কামিনী কাঞ্চন ভোগে মত্ত হয়ে আছে, নিম্নমুখী হয়ে ছাগলের মত ঘাস খাচ্ছে ও ম্যা ম্যা করছে।

গল্পটি শুনে কারও মনে হতে পারে ঠাকুর এখানে দুই শ্রেণীর মানুষের কথা বলছেন। এক শ্রেণীর মধ্যে রামের গুণ তথা ব্রহ্মত্ব বিরাজমান। শুধু আবিষ্কার করতে না পারার জন্য সেটি সে ভুলে আছে। আর এক শ্রেণীর মধ্যে আছে ছাগল সত্তা, জীব সত্তা। তাদের কখনই ব্রহ্মত্বলাভ সম্ভব নয়। সুতরাং কোথায় যেন বিভাজন থেকেই গেল। সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হল না। প্রতিটি মানুষই যে ব্রহ্ম সেকথা বলা হ'ল না। আসলে ব্যষ্টির সাধনের যুগের সীমাবদ্ধতা এটি। এই গল্পটি যে গল্পের অংশ বিশেষ সেই গল্পটি সম্পূর্ণ জানলে আর কোন বিতর্ক থাকে না।

(ঈশপের গল্প) যেখানে বলা হয়েছে বাঘ বাচ্চাটি জলে নিজের স্বরূপ

প্রত্যক্ষ করে, ও পরে মাংস খেয়ে হালুম করে উঠলে নতুন বাঘটি তাকে নিয়ে জঙ্গলে চলে গেল। কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর বাঘ বাচ্চাটি ফিরল না দেখে ছাগলদের মন খারাপ হল। তারা জানতো ও বাঘের মত দেখতে ও শক্তিশালী হলেও ছাগলদের আপনার জন, তাদের সহমর্মী। বাঘটি এখন বড় হয়েছে। পাশের জঙ্গলেই থাকে। ছাগলরাও মনে মনে প্রার্থনা করতো—''তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেলে, তুমি আবার ফিরে এসো।''

এর কিছুদিন পর বিশাল এক ভয়ঙ্কর বাঘ সেই ছাগলের দলে একটি ছাগলকে আক্রমণ করল। ছাগলটি ছিল ঐ বাঘ বাচ্চার পালিকা মা, সেই তাকে দুধ খাইয়ে বড় করে তুলেছিল। দুধ-মায়ের আর্তনাদ শুনে পাশের জঙ্গল থেকে ক্ষিপ্রগতিতে বাঘটি ছুটে এল ও বড় বাঘের সঙ্গে লড়াই করে তাকে বাঁচালো। তারপর বাকী ছাগলদের মাঝে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল ''তোমাদের কোন ভয় নাই, আজ থেকে আমি তোমাদের কাছেই সর্বদা থাকব এবং তোমাদের রক্ষা করব। আমাকে তোমাদের আপনজন জানবে।'' ছাগলরা বুঝল ও এখন সবচেয়ে শক্তিশালী বাঘে পরিবর্তিত হয়েছে।

যোগের ব্যাখ্যায় আসা যাক। এই মা ছাগলটি কে? এই মা ছাগলটি হল সাধকের (ব্রহ্মবিদের) দেহ যে দেহকে ধরে তার সাধন হয়েছে। এই দেহ আক্রান্ত হলে, বিনাশ হলে চলবে না। একে রক্ষা করতে হবে যেন সে পূর্ণতা লাভে সক্ষম হয়। অধিক আত্মিক তেজ ধারণে বিশেষত নির্গুণের (বড় বাঘ) তেজ ধারণে সে যেন সক্ষম হয়, দেহ টুটে না যায় (শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, স্থিত সমাধি হলে তাঁর দেহ চলে যেত)।

এটি দু'ভাবে হয়। (১) সাধন সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত স্থূল দেহটি রক্ষা করতে হবে। (২) পরবর্তীতে এই দেহের চিন্ময় রূপ যদি বাকী অসংখ্য মানুষদের মধ্যে ফুটে ওঠে, সর্বকালীন হয় ও তাদের দেবত্বকে স্থায়ীত্ব দান করে তাহলে যথার্থ রূপে সবার মধ্যে থেকে যাওয়া হয় ও তাদের রক্ষা করা হয়। তখন তারা তার সত্তা লাভ করে, ও কামিনী কাঞ্চনে আসক্ত নিম্নমুখী মন, ঊর্ধ্বমুখী হয়। সকলেই জীবসীমা অতিক্রম করে মানব সীমায় উত্তীর্ণ হয়। তখন ছাগল বলে কেউ থাকে না।

আসলে শ্রী জীবনকৃষ্ণের বিশ্বব্যাপীত্ব লাভের পর্যায়ে এবং পরবর্তীতে সমষ্টির সাধনের যুগে একত্বলাভকারী মানুষদের কাছে যে গল্প বলা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের যুগে তা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি গল্পটির অংশ বিশেষ

বলেছিলেন যা ছিল যুগোপযোগী।

৫. কাশ্মিরী শৈববাদ ও তার সীমাবদ্ধতা ঃ ১৯৫৯ সালের আগষ্ট মাসে একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রী জীবনকৃষ্ণ বললেন, ''ওঁ সচ্চিদানন্দ শিব''—এ হলো নাদতত্ত্ব। নাদ-কম্পন নাদতত্ত্ব থেকে সৃষ্টি। সৃষ্টি একটি নাদ মাত্র। সৃষ্টি হলো—আনন্দে সৃষ্টি হলো—এর ডাহা physical রূপ আছে। একজন পুরুষ ও একজন নারী—তাদের ভিতর একটা আনন্দ আছে (সচ্চিদানন্দের আভাস)—সেই আনন্দে ক্রমে এই মানুষদেহ সৃষ্টি হলো।

কাশ্মিরী শৈববাদে শিবের পাঁচটি অবস্থার কথা আছে। পরমশিব, শিবশক্তি তত্ত্ব, সদাশিবতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব ও সদ্‌বিদ্যাতত্ত্ব বা সদাখ্যাতত্ত্ব। তন্ত্রে আছে সৃষ্টির আগে মহাকাল ও মহাকালী ছিলেন অর্থাৎ জন্মের আগে আমি পিতা ও মাতার দেহে ছিলাম। এরপর Father's semen mother's womb-এ পড়ল—both combined হয়ে embryo(ভ্রূণ) হ'ল—এই হল শিবশক্তি তত্ত্ব। শিব ও শক্তি আলাদা নয়—একই জিনিসের এপিঠ আর ওপিঠ। এরপর development হয়ে আমার দেহ সৃষ্টি হল—সদাশিব—এই দেহে সদাই আনন্দের হিল্লোল। এরপর ঈশ্বরতত্ত্ব—One is all– Man becomes God and he is so made. তারপর সদ্‌বিদ্যা তত্ত্ব—All is one. সকলকে নিজের ভেতর পাওয়া গেল। এই অবস্থা হলে আত্মিক জগতে আমার মনে যা উদয় হবে সারা জগতে তা flash করবে। এইভাবে পঞ্চানন শিবের পাঁচটি মুখ ওরা বর্ণনা করেছে।

১২ বছর ৪ মাস বয়সে সাধকের দেহে সচ্চিদানন্দের প্রকাশে কুণ্ডলিনী অর্থাৎ অন্তর্মুখী প্রাণশক্তির জাগরণ ঘটে। কুণ্ডলিনী সুরে জাগে, ভিতরে নাদ বা নানাপ্রকার ধ্বনি শোনা যায়। মন সহস্রারের দিকে ধাবিত হয়। সেখান গিয়ে নিজের স্বরূপ উন্মোচন করতে চায়। এটি পরম শিব অবস্থা। ৫ম ভূমিতে মন এলে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি দর্শন হয়, নিজের ঊর্ধ্বাঙ্গ পুরুষ ও নিম্নাঙ্গ নারী—এটি শিবশক্তি তত্ত্ব।

বস্তুত আত্মিক বিকাশে সহস্রারের গঠনে অপূর্ব একটি পরিবর্তন আসে। এবং ভাগবতী তনু পুষ্টল হয়ে মোহিনী মূর্তি ধারণ করেছে। শিব চৈতন্য তথা প্রাণশক্তি সেখানে গিয়ে পড়ে। শিবশক্তির মিলন হয়—এক হয়।

পরে তার development হয়ে তা আত্মায় পরিবর্তিত হয়। আত্মা সাক্ষাৎকার হয়। যেন শিব ও মোহিনী রূপী বিষ্ণুর সন্তান আয়াপ্পার জন্ম

হল। সদাই ঈশ্বরীয় আনন্দ লাভ হয় তখন, সাধকের শিবত্ব ও তার বিকাশের গতি স্থায়ীত্ব লাভ করে। এটি সদাশিব অবস্থা।

তারপর তার চিন্ময় রূপ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বহু মানুষ অন্তরে দর্শন করে, তার ঈশ্বরত্ব লাভের প্রমাণ দেয়। জানা যায় One is all—একই বহু হয়েছে। এই-ই ঈশ্বরতত্ত্ব।

তারপর তিনি জগৎকে নিজের ভিতরে দর্শন করেন, ভিতরে পান। All is one হয়। এই সদ্‌বিদ্যা তত্ত্ব। পরিণতিতে তার চিন্তা দ্বারা আত্মিক জগৎ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা জাগে।

২০শে জানুয়ারী, ১৯৬২, এই প্রসঙ্গে আবার ভিন্ন আঙ্গিকে ব্যাখ্যা দিলেন। বললেন, দেখ কাশ্মিরী শৈববাদে মানুষের আত্মিক অবস্থাকে ৫ ভাগে ভাগ করেছে। পরমশিব, শিবশক্তি, সদাশিব, ঈশ্বরতত্ত্ব আর সদ্‌বিদ্যাতত্ত্ব বা সদাখ্যা তত্ত্ব।

পরমশিব হচ্ছে esoteric condition of a man, অতীন্দ্রিয় অবস্থা। আত্মাসাক্ষাৎকার করে যার আত্মার রহস্যভেদ হয়েছে তিনি পরমশিব অবস্থা উপলব্ধি করেছেন। Esoteric condition প্রথম অনুভূত হয় আত্মা সাক্ষাৎকারের সময়। শিবশক্তি হচ্ছে এই দেহটা, এই দেহ ও আত্মা both combined—এটা উপলব্ধি হয়। দেহ ও আত্মা পৃথক কিন্তু এই দেহে-ই আত্মা সমন্বিত হয়ে রয়েছে, ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে। আত্মাসাক্ষাৎকারের ১২ বছর পর বেদান্তের সাধনে দেহ ও আত্মা যে পৃথক তা উপলব্ধি হয়।

এরপর সদাশিব অবস্থা। দেহে সদাই আনন্দের স্রোত বইছে, Perpetual bliss and prosperity, এই নিত্যানন্দ অবস্থা লাভ হয় মানুষ রতন দর্শন করলে (অবতার তত্ত্বের সাধনে)।

এরপর ঈশ্বরতত্ত্ব হচ্ছে বহু মানুষের ভিতরে তার চিন্ময়রূপ ফুটে উঠবে। সেইসব দর্শনের কথা শুনে তিনি বুঝবেন আমিই এই মনুষ্যজাতি I am all these. আর সদ্‌বিদ্যাতত্ত্ব হচ্ছে সকলকে নিজের ভিতর দর্শন ক'রে উপলব্ধি করে All these I am। এইখানেই কাশ্মিরী শৈববাদ শেষ করেছে। পরের অবস্থা বলতে পারেনি।

এরপরের অবস্থা হল Controlling power. একটা মানুষের জগৎকে Controll করার ক্ষমতা জাগতে পারে। পঞ্চানন শিব সগুণ ব্রহ্মের বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়। ওরা এই পর্যন্ত বলতে পেরেছে কিন্তু esoteric condition

এর final stage নির্গুণের রহস্য ভেদ করতে পারেনি। নির্গুণের তেজ লাভ করে নির্গুণের ঘনমূর্তি হয়ে দক্ষিণামূর্তি শিব হয়ে জগৎ নিয়ন্ত্রণ ও পালনের কথা বলতে পারেননি।

তবু পুরাণকার শিবের পুত্র ষড়ানন কার্তিকেয়র কথা ভেবেছে যার প্রকাশে দেবতারা স্থায়ীভাবে অসুরদের জয় করে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল বলা হয়।

দক্ষিণ ভারতে এক পুরাণ কাহিনীতে শিব ও বিষ্ণুর মোহিনী মূর্তির মিলনে আয়াপ্পার জন্মের কথা বলা হয়েছে যিনি দক্ষিণামূর্তি শিব বা জগৎ পালক বিষ্ণুর ভূমিকা পালন করেন। তিনি মনুষ্য জাতির মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে সকলকে তাঁর চৈতন্যের প্রবাহের মূলস্রোতে নিয়ে আসেন। সেখানে চলতে গিয়ে কারও কোন বিচ্যুতি ঘটলে মানুষের brain power বাড়িয়ে তাদের অনুশীলনকে ঠিক পথে চালিত করেন ও তারা ত্রুটিমুক্ত হয়। জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এইভাবে একজন মানুষ অন্যদের উপর dominate না করেও নির্গুণের শক্তিতে highly active থেকে ও protective হয়ে জগৎ পালন করতে পারেন সেকথা বলতে না পারায় কাশ্মিরী শৈববাদের ভাবনা সম্পূর্ণতা পায়নি।

৬. প্রসঙ্গ ঃ সংস্কার ঃ সংস্কার কী? মন যখন কোন নিয়মের বাঁধনে বাঁধা পড়ে যায়, তাই-ই সংস্কার।

যেমন বৈধী ধর্মের ক্রিয়াকলাপ সকল সংস্কার, এমনকি বাঁধা সময়ে পাঠ করতেই হবে; কোন কারণে তার সময় একটুও এদিক ওদিক করা যাবে না, এমন মনে হওয়াটা সংস্কার থেকে হয়।

দেখতে হবে মনকে কে Control করে। মনকে যখন আমি অর্থাৎ inner self নিয়ন্ত্রণ করে তখন আমি সংস্কারমুক্ত আর মন যখন আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে তখন আমি সংস্কারাচ্ছন্ন।

স্থূল মন আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। কিন্তু সূক্ষ্মমন জাগলে স্থূল মনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সংস্কারমুক্ত হওয়া যায়। যা আপন সত্তাকে চিনতে বাধা দেয় তাই-ই সংস্কার।

কেউ স্থূল মনে আছে না সূক্ষ্মমনে আছে তা তার ক্রিয়া দেখে বোঝা যায়।

পাঠ শুনতে শুনতে যদি অন্যদিকে মন চলে যায় তাহলে স্থূল মনে

পাঠ শুনছি। সূক্ষ্ম মনে পাঠ শুনলে ঐ সময় কিছুতেই মন বাইরে যাবে না। যদি রাস্তার পাশে আমাদের বাড়ি হয়, রাস্তা থেকে জোরে আওয়াজ হল অমনি জানালা খুলে দেখি কার accident হ'ল। সূক্ষ্ম মনে থাকলে পাঠ চলাকালীন অবস্থায় বাইরের ঘটনায় সে নির্বিকার থাকবে, এবং পাঠ-ই শুনে যাবে। কিন্তু আমাদের মন ঐ সময়েও মাঝে মাঝেই অন্যদিকে চলে যায়। ফলে চেতনার বিকাশে বাধা পড়ে।

বস্তুতত্ত্বে সাধন যাদের তাদের স্থূলমন নেই। অথচ স্থূলে জাগতিক সব কাজ করছেন অবশ্য নিরাসক্ত হয়ে। ওনারা সংস্কারমুক্ত, তাই মন ওনাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে না, ওনারা মনকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

ওনারা অহং শূন্য, তাই রাগ করেন না। ওনারা সংস্কার মুক্ত, তাই নিয়মে বাঁধা থাকেন না এবং বাহ্যিক কোন কাজের দ্বারা ওনাদের অন্তর্চৈতন্য বিচলিত হয় না। অবশ্য সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে বিচলিত হওয়াটা স্বাভাবিক ঘটনা।

এরূপ মানুষ পাঠের সময় বাইরে accident হলেও বিচলিত হবেন না। রায় মশাই শ্রীজীবনকৃষ্ণের আঙুল মচ্‌কে দিয়েছিলেন। হুলুস্থুলু ব্যাপার ঘটল। উনি কিন্তু চঞ্চল হন নি। বাকী সকলে (উপস্থিত ভক্তরা) চঞ্চল হল। উনি অন্তর্চেতনার যে level-এ ছিলেন সেই level থেকেই পরবর্তী আধ্যাত্মিক কথাবার্তা বলতে লাগলেন।

উপোস করা খারাপ কিছু নয়। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে করতে হবে, একাদশীতে বা অষ্টমীতে—এই নিয়মে বাঁধা পড়লে সেটা সংস্কার হয়ে গেল। উপোস করাই যায়। শরীরের পক্ষে ভালো, মনের পক্ষে ভালো এই উপবাস। কিন্তু তা পরিবর্তনশীল হতে হবে। Fixed date অর্থাৎ নিয়মে বাঁধা পড়লেই সংস্কার হয়ে গেল। অন্যথায় সংস্কার নয়।

মাতাল নিজেকে রাজা ভাবে, যা খুশি তাই ভাবতে পারে, মাতাল বাঁধন ছাড়া। সে কখন কি আচরণ করবে সেই জানে। এই মাতালের মত সংস্কারও যে কত বিচিত্র হতে পারে তার ইয়ত্তা নেই।

কলকাতায় একবার বুদ্ধদেবের দাঁত এনে শোভাযাত্রা করা হল। মানুষের কী উৎসাহ। শ্রী জীবনকৃষ্ণ শুনে বলেছিলেন, "আমি হলে হাওড়া ব্রীজ পেরোবার সময় দাঁতটা টুক করে গঙ্গার জলে ফেলে দিতাম।"

মহারাজ কণিষ্কও বুদ্ধদেবের একটুকরো অস্থি কাবুলের কোন এক স্থানে

এক বৌদ্ধ স্তূপে মহাসমারোহে সমাহিত করে রেখেছিলেন।

শ্রীজীবনকৃষ্ণের অস্থি ভস্ম দেখার জন্য একসময় আমরা অনেকে হাঁ করে ছিলাম। খুব ভালো লেগেছিল, মুগ্ধ হয়েছিলাম আর নিজেদের ভাগ্যবান ভেবেছিলাম। এ কিন্তু মায়া বা সূক্ষ্ম সংস্কার থেকে হয়। এই ভালো লাগার কারণ শ্রীজীবনকৃষ্ণকে ভগবান ভাবা, আপন সত্তা ভাবতে না পারা।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ একসময় শ্রীরামকৃষ্ণময় ছিলেন, পরে তিনি ঐ অবস্থা অতিক্রম করে শ্রীরামকৃষ্ণের কিছু কথা ও কাজের সমালোচনা করেছেন। বস্তুত তখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ চেতনার বাধা সরিয়ে সংস্কারমুক্ত হলেন। তাঁর স্বাধীন, মুক্ত ভাবনায় রামকৃষ্ণ চেতনা আর বাধা হল না। তাই তিনি এক স্বপ্নে দেখেছিলেন ক্যালেণ্ডারে শ্রীরামকৃষ্ণের চোখে চশমা, সেই চশমা খুলে পড়ল তার বিছানায়, কিন্তু তিনি খুঁজে পেলেন না।

ঈশ্বরের আশীর্বাদে সংস্কার প্রথমে বাড়ে, তার বিভিন্ন দিকের পরিচয় পান সাধক, সংস্কারের নেতিবাচক দিকগুলি প্রকট হলে তা মাথা থেকে সরানো সহজ হয়, অবশ্য ঈশ্বরের কৃপায়।

রামায়ণে আছে, রামচন্দ্র সমুদ্র পেরিয়ে লঙ্কা যাবার সময় দেখলেন, উত্তাল সমুদ্র। সংস্কারের বিপুল বাধা। তিনি কী করে লঙ্কায় যাবেন ভাবছেন। উপায় না দেখে ধনুকে শর যোজনা করলেন, সমুদ্রকে শুষ্ক করে দেবেন বলে। তখন সমুদ্র দেবতা বরুণ দেখা দিয়ে তার পরিচয় দিলেন, সমুদ্রের বিস্তার, গভীরতা, প্রকৃতি সম্বন্ধে জানিয়ে এই সমুদ্র পেরিয়ে কিভাবে লঙ্কা যাওয়া সম্ভব তাও বলে দিলেন। কে এই সেতু রচনা করে দিতে পারবে তাও বলে দিলেন। রাম শান্ত হলেন। তার আজ্ঞা নিয়ে সেতু রচনা শুরু করলেন ও লঙ্কায় গেলেন। সমুদ্র দেবতাকে (এখানে মায়ার প্রতীক) রামচন্দ্র আশীর্বাদ করায় তিনি সমুদ্রের পরিচয় প্রকাশ করলেন। অর্থাৎ সংস্কারের ব্যাপ্তি, গভীরতা, শিকড়ের জাল কতটা ছড়িয়েছে জানা গেলে সহজেই তাকে অতিক্রম করা যায়।

মায়া ঈশ্বরের এক রূপ, মায়ার রূপকে খোলসা করার জন্য ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ দরকার। সাধক তখন সংস্কারকে চিহ্নিত করতে ও তা দূর করতে সমর্থ হন।

৭. প্রসঙ্গ ঃ উত্তম ভক্ত দেখে তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন---শ্রীরামকৃষ্ণ।

এই 'তিনিটি' কে তা ঠাকুর বলে গেলেন না। আসলে শ্রীরামকৃষ্ণ এই

“তিনি” কে চিহ্নিত করতে (identify) পারেননি। আর জীবজগৎ হয়েছেন বলতে কোন জগতের কথা বলছেন তাও স্পষ্ট নয়।

ঠাকুর উত্তম ভক্ত হয়েছেন। তিনি জ্যোতিস্বরূপ ঈশ্বরকে জগৎ ব্যাপ্ত অবস্থায় দেখেছেন। কেননা তার অন্তর পরম জ্যোতিতে পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু এখানে সেকথা পরিষ্কার করে বলা হল না।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ উত্তমভক্ত হয়ে বুঝলেন, এই “তিনি” হলেন তার সত্তা লাভকারী মানুষ অর্থাৎ যারা তাকে ভিতরে দেখে চৈতন্য লাভ করেছে, মান হুঁশ হয়েছে, যারা তার আত্মিক জগৎকে ধারণ করেছে সেইসব মানুষরা, ব্যক্তিগত ভাবে আবার সমষ্টিগত ভাবে।

জগৎ মানে আত্মিক জগৎ, আত্মিক স্ফুরণ, আত্মিক চিন্তা, চেতনা, ধ্যান ধারণার জগৎ। তিনি তার ঘরে আসা অনুরাগীদের দর্শন অনুভূতি শুনেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন, নিজের অনুভূতি ও উপলব্ধি share করেছেন তাদের সঙ্গে।

তার মধুর রসের অপূর্ব লীলা হরেন বাবুকে ধরে বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে। হরেন বাবু জীবনকৃষ্ণের ঐ লীলার জগৎকে যেন ধারণ করেছেন, ঐ জগৎ হয়েছেন। আবার ধীরেন রায়, যাকে শ্রীজীবনকৃষ্ণ “আমার পণ্ডিতমশাই” অভিধা দিয়েছেন, এক সময় শাস্ত্রের রেফারেন্স জুগিয়ে ঘরের আলোচনায় অন্য মাত্রা যোগ করেছেন, ঐ পর্বে তিনি যেন শ্রী জীবনকৃষ্ণের অধ্যাত্ম চিন্তার জগৎ ধারণ করেছেন আবার তার সকল অনুরাগী মিলে তার বৃহৎ আত্মিক জগৎকে ধারণ করেছেন। ব্যক্তি মানুষ তখন ঐ চেতনা সম্পন্ন মনুষ্যজাতির প্রতিনিধি হয়ে উঠেছেন। তাই শ্রী জীবনকৃষ্ণ বললেন, আমার কাছে যিনি জীবজগৎ হয়েছেন তিনি হলেন “তুই” (একজন অনুরাগী) আবার তুই-ই এই সব মানুষ হয়েছিস। যেন সে ঘরের সকল অনুরাগীর প্রতিনিধি যেমন সকলকে নিয়ে সরকার হয় আবার একজন ব্যক্তি মানুষও সরকার। সে সরকারের কোন বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে কোন এক সময়।

ধীরেন বাবুর একটি স্বপ্ন হয়েছিল। উনি দেখেছিলেন, বিরাট পুরুষ জীবনকৃষ্ণ বসে আছেন। তার গায়ে প্রতি লোমকূপে একজন করে ছোট ছোট জীবনকৃষ্ণ বসে আছেন। প্রত্যেকেই জীবনকৃষ্ণ—অসীম তাঁর আত্মিক জগৎ, তারা প্রত্যেকেই ব্যক্তিমানুষ। আবার সকলে মিলে বৃহৎ জীবনকৃষ্ণ,

তার বৃহৎ আত্মিক জগৎ। ব্যক্তিগত ভাবে ধীরেনবাবু বা জিতেনবাবু তার আত্মিক জগৎ আবার তার দর্শন প্রাপ্ত সব মানুষদের নিয়ে তার আত্মিক জগৎ।

প্রশ্ন উঠতে পারে একজন মানুষের কাছে অপর একজন মানুষ কী করে জগৎ হয়? বাইরে এর উদাহরণ হ'ল সন্তানের কাছে তার মা এবং মায়ের কাছে তার সন্তান-ই যেমন জগৎ হয়ে ওঠে।

সাধারণ মানুষের কাছে জীবনকৃষ্ণই সমগ্র আত্মিক জগৎ হয়েছেন। তার রূপে তার সৃষ্ট আত্মিক জগৎকে তারা ভিতরে পায়, তাই নিয়ে তাদের আত্মিক চিন্তা ও চেতনার জগৎ গড়ে ওঠে, বিকশিত হয়।

ভক্তের আত্মিক জগতের সবকিছু একজন মানুষ যিনি ভগবান হয়েছেন আর ঐ ভগবানও ভক্ত ছাড়া থাকতে পারেন না। তার জগৎও ভক্তদের নিয়ে গড়ে ওঠে।

তাহলে দাঁড়াল মানুষই সব। মানুষই এইসব হয়েছে, কোন কাল্পনিক ঈশ্বর নয়।

এখন আত্মিকে আমাদের করণীয় কী আছে? না, মানব ঈশ্বরের সঙ্গে সত্যকার ভালবাসার সম্পর্ক, আত্মিক একত্বের সম্পর্ক অপরিবর্তিত রেখে আমাদের চিন্তাভাবনার কাজকর্মে পরিবর্তন আনা যা আমাদের মায়ামুক্ত ও ঈশ্বরমুখী প্রাণের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করবে।

অন্যদিকে ছড়িয়ে থাকা মন গুটিয়ে ঈশ্বরমুখী হবে। কেউ পদাবলী শুনছে, পুজো করছে, ও একধরনের সংস্কার, মায়া। সেগুলোকে যোগদৃষ্টিতে দেখতে পারলে মায়া অন্যদিকে না টেনে ঈশ্বরের দিকে ঠেলে দেবে। এটি আপনা হতে হয় না। এর জন্য গভীর মনন ও যোগের অনুকূল জীবনযাপন একান্ত আবশ্যক।

৮. প্রসঙ্গ : সমান্তরাল জগৎ (Parallel world)) ঃ যদি দুই বা ততোধিক জগতে একই রকম কার্য (activity) চলে কিন্তু নিয়ম বা দৃষ্টিভঙ্গী বা মাত্রা আলাদা হয়, তাহলে তারা সমান্তরাল জগৎ।

যেমন অর্থনীতিতে দেখা যায়, একটি স্বীকৃত অর্থনীতি আছে আর তারই সমান্তরালে কালো অর্থনীতি (Black economy) যার কার্যাবলী একই রকম কিন্তু সরকার দ্বারা স্বীকৃত নয়।

এই সমান্তরাল জগৎ বহু আলোচিত বিষয় হয়ে উঠেছে পদার্থবিজ্ঞানের

ভাবনায়। সেখানে সাম্প্রতিকতম সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, আমাদের দৃশ্যমান জগতের পাশাপাশি সমান্তরাল জগৎও অবস্থিত। দুটি জগতের মাঝামাঝি একটি dimensional membrane বা মাত্রাজনিত পর্দা জগৎ দুটিকে আলাদা করে রেখেছে। দ্বিমাত্রিক কোন প্রাণী ত্রিমাত্রিক জগৎ দেখতে পাবে না। যেমন একটি ঘরের মেঝে ও তার ছাদ যদি দুটি সমান্তরাল জগৎ হয়, তাহলে মেঝেতে চলা একটি পিঁপড়ের পক্ষে ছাদ সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব নয়, যদি না কেউ ছাদে তুলে দেয়।

সেই রকম আত্মিক জগতেও বিভিন্ন সমান্তরাল জগৎ রয়েছে। যে কোন দুটি জগতের মাঝে মায়া বা সংস্কারের পর্দা আড়াল করে রেখেছে। যার জন্য আত্মিক জগৎ-কে বোঝার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গী বা মাত্রা (dimension) আলাদা হয়।

যেমন, যারা বৈধীভক্তির জগতে রয়েছে তারা আত্মিক জগৎকে বাইরে খোঁজে বা কল্পনা করে। যদি তারা পার্থিব বিষয়ে আসক্তিশূন্য হয় এবং ঈশ্বরকে God the order supplier না ভেবে তাঁকে দেখার জন্যই তাঁকে ডাকেন তাহলে তারা আত্মিক জগতের লোক।

এই আত্মিক জগতের সমান্তরাল জগৎ যে মানুষের ভিতরেই (সহস্রারে) আছে, তা তাদের বুঝতে দেয় না মায়া বা সংস্কারের পর্দা। হঠাৎ কোন দর্শন অনুভূতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গী তথা আত্মিক জগৎকে দেখার মাত্রা বদলে দিতে পারে অর্থাৎ ছুরি দিয়ে যেন পর্দাটা কেউ ছিঁড়ে ফেলল।

এই জ্ঞানের উৎস কী? পদার্থবিজ্ঞানে স্ট্রিং তত্ত্বে (String theory) স্ট্রিং এর কম্পন দিয়ে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ঘরের মেঝেতে কেউ কেরাম খেলছে। এটা একটা জগৎ। এখন কেরামের গুটিতে আঘাত করলে বোর্ডে একটি কম্পন সৃষ্টি হয়। সেই কম্পন কিন্তু বোর্ডে সীমাবদ্ধ থাকে না। কম্পনের বেশীরভাগ অংশ ছাদে চলে যায়। তাহলে ঐ কম্পন ধরে এক জগৎ থেকে অন্য সমান্তরাল জগতে যাওয়া যায়।

সেই রকম সহস্রারে নির্গুণের ক্রিয়াশীলতা (স্ট্রিং এর কম্পন)-র effect আমাদের আত্মিক জগতের একবোধ থেকে অন্য বোধের জগতে উত্তরণ ঘটায়। ঐ কম্পন থেকে সৃষ্ট দর্শন, বাণী বা কথা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী বা মাত্রা বদলে দেয়। মনন শক্তি জাগ্রত করে।

তাহলে দাঁড়াল এই যে নির্লিপ্ত হয়ে, আন্তরিক ঈশ্বর কে দেখার ও জানার মন নিয়ে যারা বৈধী ধর্ম মেনে চলছেন তারা বস্তুত চেতনার উপর স্তরে (Surface level) রয়েছেন। তারপর স্বপ্নে বা জাগ্রতে ঈশ্বরীয় দর্শন হলে ও ঐ দর্শন নিয়ে অধ্যাত্ম চিন্তার মননে যুক্ত হলে বৈধী ধর্ম উঠে যায় ও সমান্তরাল একটি আত্মিক জগতে প্রবেশ ঘটে, যা চেতনার গভীর স্তর। দর্শন অনুভূতির এই যে জগৎ এটি মূলত কারণশরীরের নানা রূপের প্রকাশকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট।

বস্তুতত্ত্বে যার সাধন যেমন শ্রীজীবনকৃষ্ণ, তার চিন্ময় রূপ ধরে কারণ শরীর নানাভাবে ফুটে উঠতে থাকে ও সেই সব দর্শনের অনুধ্যানে মানুষ সগুণ ব্রহ্মের জগতে প্রবেশ করে। এখানে প্রথম ধাপে ব্যষ্টির সাধনের নিরিখে ঈশ্বরতত্ত্ব জানতে পারে দ্বৈতবাদে ও পরে অদ্বৈতবাদে। তারও পরে আরও গভীর স্তরে গিয়ে বিশ্বব্যাপিত্বের সাধনের নিরিখে ঈশ্বরতত্ত্ব জানতে পারে। এইভাবে একটি আত্মিক জগৎ থেকে পরবর্তী সমান্তরাল আত্মিক জগতে প্রবেশ ঘটে। অবশেষে পঞ্চম সমান্তরাল জগৎ তথা নির্গুণের জগতে প্রবেশ ঘটে তূরীয় অবস্থায় নানা দর্শন অনুভূতির মাধ্যমে। এখানে সমষ্টির সাধন তত্ত্বের নিরিখে সমষ্টি চৈতন্যে সকল মানুষ বিধৃত তথা বহুত্বে একত্বের উপলব্ধি হতে থাকে, মানুষ সঠিক অর্থে আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করে ও আত্মিক জগতের পূর্ণ পরিচয় তার কাছে প্রকাশ পেতে থাকে।

একটি প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবে উঠে আসে তা হ'ল ব্যবহারিক ও আত্মিক জগৎ কি সমান্তরাল জগৎ? উত্তর হ'ল—না, কখনোই না। কারণ এই দুই জগতের activity dimension সবই আলাদা। বরং ব্যবহারিক জগৎ মায়ার বা সংস্কারের পর্দা মোটা করতে সাহায্য করে। তাই ব্যবহারিক জগৎ ও আত্মিক জগৎ আলাদা। কিন্তু একটা সম্পর্ক আছে। আত্মিক জগৎ পুষ্টিলাভ করলে ধীরে ধীরে ব্যবহারিক জগৎ সংকুচিত হয়, minimal হয়ে যায়, তখন মানুষটির আচরণ গত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

৯. প্রসঙ্গ : "মহিমাচরণ ঈশ্বরচিন্তা করেন"......কথামৃত ঃ ঈশ্বর চিন্তা কি? আর তা কেমন হওয়া উচিত? নিজের দর্শনে দেহের মধ্যে যে অজানা শক্তির প্রকাশ, তার চিন্তাই ঈশ্বর চিন্তা। সেই চিন্তা অবশ্যই positive (+ve) চিন্তা হতে হবে। অন্যথায় তা আত্মিক অগ্রগতি ঘটায় না। চিন্তা ভাবনার

অভিমুখ যদি Self evolution অর্থাৎ নিজের আত্মিক অগ্রগতির পক্ষে অনুকূল হয়, তাহলে সেই চিন্তা Positive (+ve) চিন্তা।

কোন দর্শনকে ধরে নিজের ত্রুটি বিচ্যুতি যদি বোঝার চেষ্টা করি, নিজের সত্তার পরিচয় লাভের চেষ্টা করি, যে জীবনকৃষ্ণকে দেখছি তিনি আমারই বৃহৎসত্তা, এইভাবে যদি দেখি, ভাবনা চিন্তা করি তাহলে সেটা Positive চিন্তা।

আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ, মার্ক্স, এদের চিন্তাভাবনা অনন্য (Unique), এদের Positive চিন্তা এদেরকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। জীবনকৃষ্ণের ক্ষেত্রেও তাই।

শাস্ত্রের অধিকাংশ কথা negative, যেখানে বলা হয়েছে ব্রহ্ম অবাঙমনসো গোচরম, অবিজ্ঞেয়ম, নিরঞ্জনম ইত্যাদি। এই প্রকার চিন্তায় কোন অগ্রগতি হয় না।

আবার Positive চিন্তাও আছে, যেখানে বলা হয়েছে মুক্ত পুরুষ নিজেকে অন্যের ভিতর দেখেন আবার সকলকে নিজের ভিতর দেখেন। জীবনকৃষ্ণ মুক্তি পেয়েছেন, পরম ব্রহ্মত্ব লাভ করেছেন। তাকে বহু মানুষ ভিতরে দেখে সেই সত্য ঘোষণা করছে।

এই ঈশ্বরত্ব লাভ কী করে হ'ল? কেন তাকে মানুষ ভিতরে দেখে এত বিচিত্র ভাবে? কেন তাকে প্রকৃতি নির্বাচন করল, এসব নিয়ে তিনি Positively ভেবেছেন।

Thinking, rethinking, reverse thinking and continuous thinking অর্থাৎ deep thinking- এর মাধ্যমে ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ হয়। তখন আর তা রহস্য থাকে না। এখানে পূর্ব ধারণা যেন বাধা সৃষ্টি না করে।

আমরা বলি জীবনকৃষ্ণ nature's selection, তিনি নির্গুণের প্রসন্নতা প্রাপ্ত, তিনি ঊর্ধ্বরেতা পুরুষ, তার এসব হতে পারে, তিনি তো ঈশ্বরত্ব লাভ করবেনই। আমাদের কিছু হবে না। এই চিন্তা negative চিন্তা। ঐ সকল কথাকে ঢাল করে আমরা দায়িত্ব এড়িয়ে যাই আমাদের আত্মিক অগ্রগতির সম্ভাবনা নিজেরাই নষ্ট করি।

যথাযথ অনুশীলন মানে Positive চিন্তা করা, চিন্তার প্রসার ঘটানো। নিরন্তর দর্শন অনুভূতি ও জীবনকৃষ্ণের বাণীর মর্মার্থের অনুসন্ধান চালিয়ে

যেতে হবে। বিভিন্ন দর্শন গেঁথে অবিচ্ছিন্নভাবে সেগুলির মর্মার্থ বোঝার চেষ্টা করে।

জীবনকৃষ্ণের পরমব্রহ্মত্ব লাভ কী করে হল? পূর্ববর্তী আচার্য যাদের অবতার ইত্যাদি ভেবেছি তাদের কেন এ অবস্থা হল না?....এগুলো ভাবতে হবে। শাস্ত্রে বলছে যাদের বাহ্যজ্ঞান নেই, শরীরে মন নেই তারা উচ্চস্তরে উঠেছেন। যারা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, জটাধারী, দিগম্বর সম্প্রদায় যেমন জৈনদের আচার্যরা, এদের খুব উন্নত স্তরের সাধক ভাবা হয়। মহাপ্রভু শুধু মাত্র কৌপীন পরতেন, শ্রীরামকৃষ্ণেরও কোমরের কাপড় মাঝে মাঝে খুলে পড়ে যেত। এদিকে শ্রী জীবনকৃষ্ণের কাপড় কখনও হাঁটুর উপরে উঠত না। কিন্তু ঐসব সাধকদের পরম ব্রহ্মত্ব লাভ হল না, অথচ জীবনকৃষ্ণের হল কেন?

আমরা বলি ওনার Self evolution হয়েছে। কিন্তু হল কী করে? এর অন্য অনেক কারণের মধ্যে অন্যতম একটি কারণ হল তাঁর Positive ঈশ্বরচিন্তা যা Self evolution এর অনুকূলে গেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মহাপ্রভু এরাও গভীর ঈশ্বরচিন্তা করেছেন কিন্তু এদের চিন্তা ভাবনা একটা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। প্রগাঢ় ভক্তিও একটা বাধা। চেতনার এক পর্যায়ে উন্নীত হয়ে তারা ভক্তির সীমায় আটকে গেছেন। যদিও সাধারণ মানুষের চেয়ে তারা অনেক উচ্চ স্তরের। তবু জীবনকৃষ্ণ বলছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের মন পঞ্চম ভূমিতে থাকত। তার উপরে নয়। তাঁর পক্ষে তাঁর ভক্তি ভাবনা negative চিন্তা ছিল। পূর্ণতা লাভে যা বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তাই তার ভগবান দর্শন হলেও তাকে মানুষ ভগবান রূপে অন্তরে দেখে না। অপরপক্ষে শ্রী জীবনকৃষ্ণ নিজের ভিতর আত্মা ও আত্মার মধ্যে জগৎ দর্শন করেছিলেন। পরে সেই জগৎ বাইরে বিক্ষেপ করেছেন। তাই তাকে আমরা দেখি। তাঁর এই Self evolution সম্ভব হয়েছে Positive ঈশ্বর চিন্তা করার জন্য।

আমরা যখন কোন একটা বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারি না তখন বলে দিই এটা নির্গুণের ব্যাপার। এতে সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া হয়। রহস্যভেদ করার প্রচেষ্টা থেকে সরে এলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণকে নারায়ণের অবতার ও সারদা মা-কে লক্ষ্মীর অবতার বলে দিই, ফলে আমাদের বিচার বিশ্লেষণ থেমে যায়।

একজন স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা করল। তখন বলে দিই নির্গুণের ক্রিয়ায়

ও বলতে পেরেছে। এটা ঠিক। তবে সে Positively ভেবেছে এই বিষয়টাকেও গুরুত্ব দিতে হবে।

ঈশ্বরীয় চিন্তা ঊর্ধ্বমুখী ও ইতিবাচক (Positive) হলে সাধক গুণাতীত অবস্থায় পৌঁছান। তিনি বলতে পারেন ব্রহ্মবিদ্যা Perpetual positive. তার মাথায় negative চিন্তা বলে কিছু থাকে না। ডিটেক্টিভেরও মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সে কথা ভাবলে সে এগোতে পারবে না। জীবনকৃষ্ণ বলছেন নির্গুণ বলে কিছু নেই। নির্গুণ অর্থাৎ জানার বিষয়টি খুব কঠিন, একথা ভাবলে মন নিম্নমুখী হয়। তাই জীবনকৃষ্ণ এসব ভাবতেন না। তিনি বলতেন নির্গুণও আমার ভিতর Unexplored zone. তা জানা হয়ে গেলে আর নির্গুণ থাকে না। সগুণ হয়ে যায়।

ঈশ্বরকে জানা যায় না, তার বিনাশ ও উৎপত্তি নাই, এ জাতীয় কথা negative. ঈশ্বরের জানা গুণ অর্থাৎ সগুণ ধরে আমরা এগোব, তাকে আরও জানার দিকে।

১০. ঊর্ধ্বরেতা ঃ ঊর্ধ্বরেতা প্রসঙ্গে শ্রী জীবনকৃষ্ণ বলেছেন, রেতঃ অন্তর্মুখী হয়ে সহস্রারে গমন করে। তখন সহস্রারে মধু পাত দর্শন হয়। পরিণতিতে এই ঊর্ধ্বরেতা পুরুষের চিদ্‌ঘনকায় জীবন্ত রূপ অসংখ্য মানুষের অন্তরে ফুটে ওঠে ও আত্মিক একত্ব স্থাপন করে।

যেমন রেতঃ নিম্নগামী হয়ে সন্তান উৎপাদন করে, বিপরীত ক্রমে স্বাভাবিক ভাবেই আমরা ধরে নি যে বোধহয় রেত: ঊর্ধ্বগামী হয় ও মধুতে পরিবর্তিত হয়ে অসংখ্য মানুষের অন্তরে নিজেকে সৃষ্টি করে। তা কিন্তু একেবারেই নয়। এ ব্যাপারে শ্রী জীবনকৃষ্ণ বাইবেল থেকে ঊর্ধ্বরেতা প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে, "Some are born eunuchs and some make themselves eunuchs." স্থূলে রেতঃ নিম্নগামী না হলেই যে সে ঊর্ধ্বরেতা হবে এবং আত্মিকে পরম এক (Absolute one) অবস্থা প্রাপ্ত হবে এমনটা নয়। তাই শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, এরা সেই লিঙ্গ, গুহ্য, নাভিতেই আবদ্ধ। একটু নড়ে চড়ে ৪র্থ ভূমিতেও গেল না। অর্থাৎ এখানে তিনি ঊর্ধ্বরেতা পুরুষের মনের ঊর্ধ্বগতি লাভের লক্ষণটির কথা বোঝাতে চেয়েছেন।

এ বিষয়ে অন্ধকার আরও কেটেছে সম্প্রতি এক পাঠে এই প্রসঙ্গে

দেহতত্ত্বের আলোচনায়।

শিবকে ঊর্ধ্বরেতা বলা হয়। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের আয়াপ্পার জন্মকাহিনী যেভাবে বলা হয়েছে সেখানে প্রচলিত ঊর্ধ্বরেতার ভাবনা থেকে সরে এসে ভিন্ন এক ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। ঐ কাহিনীতে আছে সমুদ্র মন্থনে যে অমৃত উঠে আসে তা পান করার জন্য দেবতা ও অসুরদের মধ্যে লড়াই বাধে। অসুরদের হাত থেকে অমৃত উদ্ধার করে দেবতাদের দেবার জন্য বিষ্ণু মোহিনী রূপ ধারণ করেন। শিব মোহিনীর সৌন্দর্যে মোহিত হন ও তার সঙ্গে মিলিত হবার চেষ্টা করেন। তাদের মিলনে জন্ম হয় আয়াপ্পার। তাকে হরি ও হরের সম্মিলিত রূপ বলে।

এখানে শিব—শিবচৈতন্য—সম্পূর্ণ সূক্ষ্ম মনের অবস্থা, যেখানে স্থূল মনের কোন ক্রিয়া নেই। এই সূক্ষ্ম মন সর্বদা ঊর্ধ্বমুখী গতি লাভ করে। সূক্ষ্ম মনের ঊর্ধ্বমুখী গতিলাভ মানে এই তেজ আরও বেশি বেশি সংকলিত হওয়া। এই তেজ ধারণ করার জন্য দেহের অভ্যন্তরে সহস্রারের গঠনে কিছু পরিবর্তন আসে ও একটি সুন্দর অবস্থা লাভ হয়। সেখানে ঐ আত্মিক তেজ অপরূপ জ্যোতিতে (পরম জ্যোতি) পরিবর্তিত হতে থাকে ধাপে ধাপে, সাধনার বিভিন্ন স্তরে, এই জ্যোতিরূপকেই বিষ্ণুর মোহিনী রূপ বলা হয়। এই অবস্থায় সাধকের মন ঐ মোহিনী রূপের প্রতি অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ দেহের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়।

বিষ্ণু—জগৎ চৈতন্য (Collected life power), সংকলিত ও আত্মারূপে প্রকাশের ঠিক আগে এই আকর্ষণ আরও তীব্র হয়। সাধক তার দেহটির প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল হন যাতে তার পবিত্রতা বজায় থাকে এবং তা সর্বক্ষণ যোগযুক্ত থাকে। জ্যোতির সমুদ্রে অঙ্গুষ্ঠবৎ ঘন জ্যোতিরূপে আত্মা অর্থাৎ আয়াপ্পার জন্ম হয়। এখানে হরি—জ্যোতির সমুদ্র, যেন আধার। আর হর—শিব চৈতন্য তথা তেজের নির্যাসের পরিবর্তিত রূপ যা অঙ্গুষ্ঠবৎ ঘন জ্যোতি রূপে দেখা যায় তা হরির যোগে হরের সন্তান—সদাশিব—হরিহরের সম্মিলিত রূপ—আয়াপ্পা।

তাহলে দাঁড়ালো যে, এই ঊর্ধ্বরেতা বলতে সূক্ষ্ম মনের ঊর্ধ্বমুখী গতিলাভের কথা বলা হয়েছে, যার ফলে আত্মিক তেজ সহস্রারে সংকলিত হয় ও আত্মায় রূপান্তরিত হয়। বস্তুতত্ত্বে ব্যষ্টির সাধনে স্থূলমনের কোন ক্রিয়া না থাকায় মন চঞ্চল হয় না। ফলে চৈতন্য সদাই ঊর্ধ্বমুখী থাকে।

এর ফলে অষ্ট বজ্র সম্মেলন হয়। অর্থাৎ যোগের সকল বাধা সরে গিয়ে দেহের নির্গুণের শক্তির পূর্ণ আনুকূল্য লাভ হয়। আত্মা সাক্ষাৎকার হয়। পরে এই আত্মা বা আয়াপ্পা সাধকের জৈবী দেহের চিন্ময় রূপে বহু মানুষের মধ্যে প্রকাশ পান নির্গুণের অধিক শক্তির সহায়তায়।

এক্ষেত্রে স্থূলদেহে অবশ্যই প্রভাব পড়ে। যিনি ঊর্ধ্বরেতা হন তার মনে কখনই কামভাব (অসুরভাব) জাগবে না।

এ যুগে ঐ আয়াপ্পাকে ভিতরে পেয়ে সাধারণ মানুষের মন ঈশ্বরমুখী হয়, ঊর্ধ্বমুখী হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম মন না জাগায় তা স্থায়ী হয় না। পরে যখন নির্গুণের সঙ্গে এক হওয়া জীবনকৃষ্ণের অর্থাৎ, পূর্ণ বিকশিত আয়াপ্পার রূপ (যিনি একাধারে পূর্ণ নির্গুণ আবার পূর্ণ সগুণ ব্রহ্ম) মানুষ দেখে, তাদের অন্তরে নির্গুণের তেজ জাগে ও সূক্ষ্ম মন লাভ হয়।

এই আলোচনা শুনতে শুনতে বোলপুরের সঞ্চিতা চ্যাটার্জীর একটি দর্শন হ'ল—হাতে একটি মোবাইল। তাতে দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর ছবি। হঠাৎ হাত থেকে মোবাইলটি পড়ে ভেঙে গেল। অমনি জয়ের কণ্ঠে শোনা গেল, "দেহ ভাঙছে—দেহ ভেঙে আবার গড়া হবে।" এমনটি হলে অর্থাৎ কারণ শরীরের গঠনের আমূল পরিবর্তন হলে সংস্কার ত্যাগ করে সত্যের রূপ ধারণা করা সম্ভব ও মন সর্বদা ঊর্ধ্বমুখী রাখা সহজ হয়। অবশ্য স্থূল মনের ক্রিয়াও থাকে। তবে দেহের প্রতি যত্নশীল হলে অর্থাৎ পার্থিব বিষয়ে আসক্ত না হয়ে যোগের অনুকূল পরিবেশে থেকে সদা অনুশীলনে রত থাকলে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষেরও ২য় স্তরে ঊর্ধ্বরেতা অবস্থা লাভ সম্ভব।।

১১. একত্ব লাভের বাস্তব পন্থা ঃ স্বামী বিবেকানন্দ সর্বধর্ম সমন্বয় প্রসঙ্গে তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, That plan alone is practical which does not destroy the individuality of any man in religion and at the same time shows him a point of union with all others. অর্থাৎ যা কোন মানুষের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র নষ্ট করে না এবং একই সাথে অন্য সকলের সাথে মিলনের একটি ক্ষেত্র, একটি মিলন বিন্দু প্রদর্শন করে তাই-ই সকলকে এক করার বাস্তব পন্থা।

এই Point of union কী হতে পারে তা স্বামীজী পরিষ্কার করে বলে যেতে পারেন নি। তিনি খুঁজেছেন। বিভিন্ন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা আচার্যদের বক্তব্যের সর্বজনীনতা নিয়ে আলোচনা করে তাদেরকে সর্বজনীন মানব বলে তুলে ধরেছেন। যেমন বুদ্ধদেব, শ্রীকৃষ্ণ, যীশুখৃষ্ট ইত্যাদিকে। কিন্তু এ যুগে শ্রী জীবনকৃষ্ণের চিন্ময় রূপ হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদি সকল শ্রেণীর সকল ধর্মের মানুষের অন্তরে ফুটে ওঠায় সত্যকার সর্বজনীন মানবকে পাওয়া গেল—স্বামীজীর Point of union বাস্তব ও কার্যকরী রূপ পেল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে শ্রী জীবনকৃষ্ণকে ভিতরে পেয়ে আমাদের জীবনে কি তাহলে বিবেকানন্দ কথিত একত্বের ধারণা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে? এককথায় উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ। বিবেকানন্দ তার বক্তব্যে সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলেছেন। জীবনকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে স্বামীজীর সেই সর্বধর্ম সমন্বয় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এখানে। এখানে কেউ-ই অন্যের ধর্মকে বা অন্যধর্মের মানুষকে ঘৃণা করে না অর্থাৎ জীবনকৃষ্ণের চিন্ময়রূপকে কেন্দ্র করে হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্টান, পারসী সব ধর্মের মানুষ এক প্ল্যাটফর্মে এসে মিলিত হতে পারছে।

তবে সব মানুষের মিলনের এটি প্রথম ধাপ। শ্রী জীবনকৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গে বলেছেন—"আমি হিন্দু নই।" কখনো বলছেন, "এ বিষয়ে তোদের হিন্দুধর্মে কী বলেছে দেখ।"—ইত্যাদি। আবার মন্দির মসজিদের প্রভাব প্রসঙ্গে বলছেন, মন্দির, মসজিদ, চার্চ, সিনাগগ—এসবের উচ্ছেদ হওয়া দরকার। তার জীবনে মন্দিরও নেই, পুজোও নেই। আছে শুধু জগৎব্যাপ্ত এক অখণ্ড চৈতন্যের অস্তিত্বের বোধ আর তা আপন বৃহৎসত্তা বলে উপলব্ধি। প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কি জীবনকৃষ্ণের এই কৃষ্টি (Cult) গ্রহণ করতে পেরেছি?

এই প্রসঙ্গে বলা যায়—আমরা যেহেতু মানুষ তাই আমাদের ব্যক্তিগত পরিচিতি (Individual identity) প্রয়োজন হয় যা পশুপাখীদের ক্ষেত্রে দরকার হয় না। এই ব্যক্তি পরিচয় বংশগত, ভাষাগত, দেশগত হলেও ঐতিহাসিক কারণে বাহ্যিক প্রচলিত ধর্মীয় পরিচয়টি কেউই অস্বীকার করতে পারে না। একজন মানুষ যে কোন ভাষা বা দেশ বা বংশের হোক না কেন তার ধর্মগত পরিচয় হয় সে হিন্দু বা মুসলমান বা খৃষ্টান ইত্যাদি।

প্রচলিত এই সমস্ত ধর্ম একদিকে যেমন তার পরিচয় দান করে, অন্যদিকে আবার তার চেতনাকে কুক্ষিগত (Restrict) করে। সব ধর্মেই কিছু বাহ্যিক

নিয়ম নীতি তৈরি করা হয়েছে যা তার কৃষ্টির অন্তর্গত হয়ে পড়েছে, যা সংস্কার হিসাবে আমাদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে। যেমন হিন্দু ধর্মে মন্দির, পুজো, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি আর মুসলিম ধর্মে রোজা, নমাজ, মসজিদ ইত্যাদি ঈশ্বর আরাধনার ক্ষেত্রে পথ আলাদা করে ফেলেছে। এই আচ্ছন্ন চেতনার দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষ নিজের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে গিয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ছে। আবার কেউ উদারতা দেখিয়ে হিন্দু হয়েও ইফতার পার্টিতে যোগ দিচ্ছে, মুসলমান হয়েও পুজোয় অংশগ্রহণ করছে। কিন্তু এরূপ আরোপিত ভিন্ন ধর্মের আচরণ ধর্মীয় কুসংস্কার ও গোঁড়ামি উচ্ছেদ করে মিলনের পথ, আত্মিক একত্বের পথ উন্মুক্ত করে না।

তাহলে প্রচলিত ধর্মের দুটি দিক রয়েছে। প্রথমত :—ধর্মগত পরিচয় দান। একজন মানুষ হিন্দু বা মুসলমান বা খৃষ্টান যে ঘরেই জন্মাক সে সেই ধর্মের সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। খাদ্যাভাসে, পোষাক পরিচ্ছদে, চলনে বলনে, আপ্যায়নে এই পরিচিতির ছাপ থেকেই যায়। বাহ্যিক এই ছাপ একত্বের চেতনার পথে বাধাস্বরূপ হয় না। দ্বিতীয়ত—ধর্মীয় মতবাদের চেতনা যা তাকে গোঁড়া করে তোলে, বিশ্বজনীন চিন্তা চেতনায় বাধা সৃষ্টি করে সেটি হিন্দুর হিন্দুত্ব, মুসলমানের মুসলমানত্ব, খৃষ্টানের খৃষ্টানত্ব। ধর্মীয় চেতনা থেকে এই মুসলমানত্ব, হিন্দুত্ব, খৃষ্টানত্ব উচ্ছেদ হওয়া দরকার। কুসংস্কারমুক্ত বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক চেতনা সম্পন্ন মুসলিম সংস্কৃতির মানুষ নিজেকে মুসলমান বলবেন, কুসংস্কার মুক্ত বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক চেতনা সম্পন্ন হিন্দু সংস্কৃতির মানুষ নিজেকে হিন্দু বলবেন কিন্তু এই হিন্দু ও মুসলমানের পক্ষে আত্মিক একত্ব লাভের পথে কোন বাধা থাকে না।

এখন কিভাবে ঐ ধর্মীয় কুসংস্কার, সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি যাবে? এগুলির স্রষ্টা ধর্মীয় Cult-এর, বিশেষ মতবাদের স্রষ্টারা। তাই আমাদের তাকাতে হবে আর এক কৃষ্টির (Cult-এর) স্রষ্টা শ্রী জীবনকৃষ্ণের দিকে। তিনি তার নিজস্ব Cult সৃষ্টি করেছেন যেখানে কোন কুসংস্কার নেই, বিধিনিষেধ নেই, আছে দর্শন অনুভূতি ভিত্তিক আত্মিক চেতনার কথা ও তার অনুশীলন ও মননের কথা।

প্রচলিত ধর্মীয় মতবাদে অর্থাৎ Cult-এ আছে এক ধর্মগুরু, ঈশ্বর আরাধনার বিশেষ পদ্ধতির কথা, সুনির্দিষ্ট কিছু বিধিনিয়ম, কিছু অন্ধবিশ্বাস,

মৃত্যুর পর কল্পিত জীবনের কথা ও নানা অলৌকিক গল্প গাথা যা ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষকে এক করার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। শ্রীজীবনকৃষ্ণকে অন্তরে দেখে তার সত্তা পেয়ে তার Cult বুঝে যে কোন সংস্কৃতির (Culture) মানুষ তার বিশেষ মতবাদের বন্ধন মুক্ত হতে পারে। এখানে ভক্তিবাদ বেদান্তের জ্ঞান সম্পূর্ণ অনুভূতিমূলক হওয়ায় তা চাপিয়ে দেওয়া বিশেষ মতবাদ নয়।

শ্রীজীবনকৃষ্ণের ক্ষেত্রে বাইরের ধর্মীয় চেতনার প্রভাব কিছুমাত্র ছিল না বলেই উনি নিজেকে হিন্দু বলেন নি, কিন্তু তিনি হিন্দু সংস্কৃতির (culture) অন্তর্ভুক্ত হয়ে জীবন কাটিয়েছেন—যেন তিনি তথাকথিত হিন্দুত্ব বর্জিত হিন্দু। তাঁর ব্যষ্টির সাধন ধরে সকল ধর্মীয় মতবাদের মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতার ইঙ্গিত আছে তার সম্যক পরিচয় জ্ঞাত হয়ে শেষে তার বিশ্বব্যাপীত্ব অনুধাবন করে ধর্মের সর্বজনীন সত্য রূপটি সম্যক ধারণা করা যায়। তখন আমাদের সকল ধর্মীয় গোঁড়ামি ঘুচে যায়—বস্তুত নগণ্য (Minimal) হয়—আর তখনই সকলের সঙ্গে মিলনের তথা আত্মিক একত্ব লাভের পথে যাত্রা শুরু হয়।।

১২. জগৎ বিক্ষেপ ঃ জগৎবিক্ষেপ ব্যাপারটি এইরকম—যেন কোন গাছ তার প্রাণের নির্যাস বিক্ষেপ করায় ফুল ফুটল। তারপর স্বপরাগ যোগ হল। ভিতরে একটি পরিবর্তন ঘটল। তাকে আবার বাইরে বিক্ষেপ করায় তা ফল রূপে দেখা গেল। তার ভিতরের সার জিনিস এবার পূর্ণভাবে প্রকাশ হল। ঠিক তেমনি দেহের ভিতর আত্মা (Collected life power of whole human race) তথা আত্মিক জগৎ অলক্ষ্যে ও নির্লিপ্তভাবে থাকে। শ্রীজীবনকৃষ্ণ তার দেহস্থ সেই জগৎকে বিক্ষেপ করলেন তার সহস্রারে। সেখানে আত্মার সংকলন ও রূপ ধারণ করে প্রকাশ হল—তার আত্মাসাক্ষাৎকার হল। আত্মাকে জানা গেল। পরে সেই আত্মাকে ভিতরে পেলেন অর্থাৎ আত্মা হয়ে গেলেন। ব্যষ্টিতে ভাষান্তরে ঈশ্বর (আত্মিক জগৎ) তার রূপে রূপায়িত হল।

পরবর্তী ধাপে নিজের চিন্ময় রূপে তিনি সেই আত্মিক জগৎকে মনুষ্যজাতির মধ্যে বিক্ষেপ করলেন। তারা তার চিন্ময় রূপে ঈশ্বর দর্শন করে তা জানালো। আত্মিক জগতের বিরাটত্ব ও বৈচিত্র্য আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ

হলো। এরপর আবার ঐ জগৎকে তিনি ভিতরে টেনে নিলেন ও দেহবান ব্রহ্ম হলেন, পূর্ণ বিকশিত ব্রহ্ম হলেন—বৃহৎ ব্যষ্টি হলেন।

মহাভারতেও দেখা যায় যুদ্ধের পূর্বে কৃষ্ণ অর্জুনকে অনেক উপদেশ দিলেন। কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলে বোধ না হওয়ায় সেই সকল উপদেশ অর্জুনের ধারণা হল না। তখন কৃষ্ণ নিজের বিশ্বরূপ দেখালেন। পরে আবার তাঁর মানবরূপ দেখে অর্জুন বুঝলেন জগৎ তাঁর ভিতরে। তিনিই জগতের সবকিছু হয়েছেন। তিনি পূর্ণব্রহ্ম!

স্মৃতিচারণ

স্মৃতিচারণ

শ্রী জীবনকৃষ্ণের পূতসঙ্গ লাভে ধন্য কিছু মানুষের টুকরো কিছু স্মৃতিকথা এখানে উল্লেখ করা হলো।

অসীম বিশ্বাস

আমার বড় জামাইবাবু ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে বি.আর.সিং হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। দিদিকে নিয়ে রোজ হাসপাতালে যেতাম এবং প্রত্যেক দিন ফিরে আসার সময় মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে জীবনকৃষ্ণকে স্মরণ করতাম। সেই সময়ে একদিন স্বপ্ন দেখলাম। দিনটা ছিলো ৩০শে মার্চ, ১৯৫৭- দেখছি হাসপাতালে জামাইবাবু শুয়ে আছেন। জীবনকৃষ্ণ জামাইবাবুকে দেখিয়ে আমাকে বলছেন, 'ওরে মরে গেলেও কিছু হয় না, দেহই কেবল যায় মাত্র, আত্মার মৃত্যু হয় না।' আমি শুনে বললাম, তা তো হল, কিন্তু আমি যে বলেছিলাম, ঠাকুর তুমি ওকে দেখো। স্বপ্নে এই কথা যখন তাকে বলছি, দেখি তার আগেই তিনি অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

স্বপ্ন দেখে দাদাকে পরের দিন সকালে স্বপ্নের কথা বললাম। বললাম জামাইবাবু বোধহয় বাঁচবে না। এরপর জামাইবাবুকে চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হলো। কিন্তু বাঁচানো গেল না। ১৭ই এপ্রিল, ১৯৫৭ জামাইবাবু মারা গেলেন।

পরের দিন ১৮ই এপ্রিল, সকালে শ্মশান থেকে ফিরে খালি পায়ে কদমতলায় জীবনকৃষ্ণের ঘরে গিয়ে উত্তর দিকের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসলাম। উনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি রে অসীম, তোর জামাইবাবু মারা গেলেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, কাল মারা গেছেন। এবং বললাম ৩০শে মার্চের দেখা স্বপ্নটি। স্বপ্ন শোনার পর উনি হাতজোড় করে বললেন, তোকে প্রণাম হই বাবা, তোকে প্রণাম হই। তারপর বললেন—বাবা, এরকম আর করিস নি। ওরে তোর দেহ ঠাকুর বেঁধে দিয়েছেন। মৃত্যু দেখে ঠাকুর কেঁদে

উঠেছিলেন, অক্ষয় রে, বলে কেঁদে উঠেছিলেন। কিন্তু তোর দেহ তিনি বিশেষ সুরে বেঁধে দিয়েছেন। (tuning করে দিয়েছেন।) বাবা তোকে প্রণাম হই, মৃত্যুতে তুই কোনদিন বিচলিত হবি না, তোকে প্রণাম হই।

নির্জন ঘর, শান্তির পরিবেশ, ঘরের মেঝে, দেওয়াল সব ঠাণ্ডা শীতল। বসার পর শরীর জুড়িয়ে গেল।

বিনয় কুমার মুখোপাধ্যায়

সেদিনটা ছিল ২২শে অক্টোবর, ১৯৫৮। বিজয়া দশমীর দিন। ঘরে সদগুরুর কথা উঠলো। সবাই সচ্চিদানন্দ গুরু কি, কাকে বলে—এই নিয়ে আলোচনা করতে লাগলো। সৌমেন বললো আপনাকে আমরা ভিতরে এবং বাইরে দুই ভাবেই দেখছি। এই কথা শুনে জীবনকৃষ্ণ বললেন, হ্যাঁ, এই হলো একজন দেহবান পুরুষকে দেখা। এই সব কথা চলতে চলতে হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, আজ দশমী, এই চারদিন ধরে রামকেস্ট রামকেস্ট বলা বাদ দিয়ে আজ এখন তাঁর বলা এই কথাটাও মানে সচ্চিদানন্দ গুরু কথাটাও বিসর্জন দিলাম। আজ সকালে জয় জীবনকৃষ্ণ জয় জীবনকৃষ্ণ করছিলাম, আপন মনেই।

সেই কবে থেকে সচ্চিদানন্দ গুরু কথাটা তিনি বলে আসছিলেন। হঠাৎ কথাটাকে বিসর্জন দিলাম বলাতে আমরা সকলে বিস্মিত হয়েছিলাম। তিনি যে এক নতুন উপলব্ধির জগতে প্রবেশ করছিলেন, তাঁর কথাবার্তায় সেটা বেশ ধরা পড়ছিল।

আনন্দ মোহন ঘোষ

১. মনে পড়ে, একদিন ঘর ও বাইরের রক লোকে পরিপূর্ণ। সন্ধ্যার একটু বাদে একজন নিঃশব্দে বাইরের রকে এসে দাঁড়ালেন। অন্ধকারে মুখ চেনা যায় না। শ্রী জীবনকৃষ্ণ খাটে উপবিষ্ট। আগ্রহ-ভরে জিজ্ঞাসা করলেন, কে রে? বাইরে থেকে একজন উত্তর দিলেন—বিষ্টুদা—বিষ্টু পাল। ইনি কেষ্ট মহারাজের সেজো ভাই। ইনিই আমায় প্রথম কালি ব্যানার্জী লেনে

শ্রীজীবনকৃষ্ণের সন্নিধানে নিয়ে গিয়েছিলেন। ইদানিং শ্রীজীবনকৃষ্ণের বিরূপ সমালোচনা করতেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণ উঁচু স্বরে বললেন—ওরে তোরা ওকে ভেতরে আসতে দে। পরে তাকে আহ্বান করে বললেন—ও বিষ্টু, ভেতরে এসো, ভেতরে এসো। সেদিনই বিষ্টুদার সন্তান মারা গেছে। বিষ্টুদা ভেতরে এলে উনি তাকে খাটের উপর নিজের পাশে বসালেন ও পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন—সংসারের এই নিয়ম, তাতে সুখ-দুঃখ রোগ-শোক সবই আছে। তাই ঠাকুর বলছেন, ''সংসারে আছে কি? যেন আমড়া, শুধু আঁটি আর চামড়া, খেলে হয় অম্লশূল''। ঠাকুর সন্তান বিয়োগের কথায় বলছেন, ''যেন তাল গাছের একটি-দুটি তাল খসে পড়া।'' কথায় বলে পুত্রশোক! তা দুঃখ তো হবেই। তবে ভগবান আবার দুঃখ সহ্য করার শক্তিও দেন, প্রকৃতির নিয়মই এই। যে শোক করছো সেই তুমিই একদিন থাকবে না, আমিও একদিন থাকবো না। তাই বোধিসত্ত্ব নাটকে আমি লিখেছিলাম যে, এই পর্যন্ত মৃত্যুই জগৎকে শাসন করেছে, এবার আমি মৃত্যুকে শাসন করবো।

কিছুক্ষণ পরে বললেন, নাও, একটু পাঠ শোনো। আমি তো অবাক, যেভাবে উনি বাইরে থেকে বিষ্টু পালকে ঘরে এনে খাটে ওনার পাশে বসালেন, সেই কথা ভেবে। তবে কি উনি, ওর শোক-ওর বেদনা টের পেয়েছিলেন! তাই এই সান্ত্বনা ও শান্তি বারি বর্ষণ করলেন!

২. পুরীতে ওনার কাছে থাকাকালীন একদিনের ঘটনা ঃ

সেদিন সকালে চা পানের পর বললেন—আয় একটু বেড়িয়ে আসি। আনন্দে ওনার সঙ্গে সমুদ্রতীর ধরে চলেছি। সবে সূর্য উঠেছে। কথা কইতে কইতে চলেছেন। এত জোরে হাঁটছেন যে পিছিয়ে পড়ছি। একরকম প্রায় আধা দৌড়ে চলেছি। হাঁটতে হাঁটতে ফ্ল্যাগ স্টাফ এর কাছে এসে পড়েছি। সিমেন্ট বাঁধানো বসার জায়গা দেখে বললেন—আয় একটু বসা যাক। কিছুক্ষণ বসার পর বললেন, এই যে সমুদ্র, আকাশ দেখছিস, এসব বাইরে বিক্ষেপ করে দেখছিস। আবার জগৎ যা দেখছিস সব তোর ভিতরে। আচ্ছা চোখ বুজে থাক। তাই করলাম। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে আছি। সময়ের কোন হুঁশ নেই। ওনার কথা কানে এলো, 'কি দেখছিস?' বললাম—যেন দু-তিন মাইল ওপর থেকে আকাশ সমুদ্র সমেত পৃথিবীটাকে দেখতে পাচ্ছি। বললেন, 'এবার চোখ খোল।' চোখ চাইতে দেখি আমার প্রতি অপলক

দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। বললেন, একেই বেদান্তের অনুভূতি বলে। আজ তোর তা হয়ে গেল এক কথায়।

দিলীপ কুমার ঘোষ

৪ঠা জুন, ১৯৫৮ এর পর থেকে আমরা জীবনকৃষ্ণের অবস্থার এক বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণময় অবস্থায় থেকে যে সব কথা বলতেন তার থেকে বেরিয়ে এসে নতুন কথা বলতে সুরু করলেন। তার ঠিক আগের দিন ৩রা জুন আকস্মিক ভাবে তিনি কলেরা রোগে আক্রান্ত হন। সারাদিন বেহুঁশ অবস্থায় শয্যাগত ছিলেন। পরদিন তিনি সম্পূর্ণ এক নতুন মানুষ। চোখ দিয়ে যেন অদ্ভুত এক তেজ বেরিয়ে আসছে। কথাবার্তাও নতুন। এই পরিবর্তন বাইরে নয়, অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন। কিন্তু এই অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন যে বাইরে স্থূলদেহেও কিরূপ প্রভাব ফেলে এটি তার নিদর্শন।

ঘরে এই নিয়ে কথা বলতে বলতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী সন্তান দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের জীবনের এক কাহিনী শোনালেন—দেবেনবাবু যেদিন ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দেখেন, সেদিন দুপুরের দিকে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ঠাকুর বাবুরাম মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেন। কিন্তু অসুখ এত বেড়ে যায় যে কলকাতা থেকে আর নিজের বাড়িতে ফিরতে পারলেন না। কাছেই ছিলো এক আত্মীয়ের বাড়ি। সেখানে গিয়ে ওঠেন আর প্রায় ৪১দিন তাঁকে ওই বাড়িতে থাকতে হয়। প্রচণ্ড জ্বরে অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে পড়ে থাকতে হতো। তাঁর জ্বর হওয়ার কারণ—তখন তাঁর দেহের ভিতরের পরিবর্তনের জন্য আবশ্যক হয়েছিল। ওটা না হলে তাঁর সাধন-ভজন হতো না।

অনাথনাথ মণ্ডল

১. সিগমুণ্ড ফ্রয়েড স্বপ্ন সম্পর্কে যে ধারণা দিয়েছেন সেটি যথার্থ ছিলো না, তা বোঝাতে জীবনকৃষ্ণ একদিন পর পর দুটি স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

সেদিন ধীরেনদাকে ঠাকুর বললেন, বাবা বলতো, সুধাংশু দেখেছে, আমাদের এখানকার এই বস্তুটি যেন ইংরাজি কাগজের ফার্স্ট পেজের গোটা পাতা জুড়ে ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা এর মানে কি? ফ্রয়েডের ব্যাখ্যা বলি শোন, সে হলে বলতো এটা fulfilment of desire ছাড়া কিছু নয়। অর্থাৎ ইচ্ছা পূরণের স্বপ্ন। কারণ সুধাংশুর মনে যা উদয় হয়েছে আমাদের এই বস্তুটা কাগজে ছাপানো হোক, সেটা ওই রকম স্বপ্নে রূপ ধারণ করে ফুটে উঠেছে।

এবার আর একটা বলি, আমি, ফটিক ও তারা তিনজনে একসঙ্গে শুতুম। আমি স্বপ্নে দৈববাণী পেলুম, পরশু ফটিকের বিয়ে, ওর মেজদা আজ সকালে আমাকে নেমন্তন্ন করতে আসছে। আমি ঘুম ভেঙ্গে বিছানায় উঠে বসলুম। আমার নড়াচড়ার আওয়াজ পেয়ে তারাও উঠে বসলো। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, হ্যাঁ রে তারা, পরশু ফটিকের বিয়ে? আজ ওর মেজদা আমাকে নেমন্তন্ন করতে আসছে? ও বললো, হ্যাঁ। তারপর ফটিকও উঠে পড়তে ওকে জিজ্ঞাসা করলুম, হ্যাঁ রে তোর পরশু বিয়ে, তা বলিসনি কেন? ও এসব কথা লুকিয়ে রেখেছে এইজন্য যে পাছে আমি কিছু বলি। তাহলে ও আর বিয়ে করতে চাইবে না। ওরা তো আমার চিরকুমার সভার সভ্য কিনা!

আমরা তিনজনে মুখ হাত ধুয়ে চা খেয়ে সবে বসেছি। দেখি সত্য সত্যই ফটিকের মেজদা এসে হাজির আমাকে নেমন্তন্ন করতে।

এই কথা বলে জীবনকৃষ্ণ হিরুর দিকে তাকিয়ে বললেন, এখন হিরু, কি বলবি বলতো বাবা, এটা কি ফ্রয়েডের কথা অনুযায়ী আমার fulfilment of desire? আমি তো কখনো ভাবতেই পারিনি। এ তো আমাকে ভবিষ্যত দেখিয়েছিলো। তাহলে ফ্রয়েডের theory হচ্ছে ভুল, ওরে ভুল।

কি অদ্ভুত তার উপস্থাপন! প্রথম স্বপ্ন থেকে ফ্রয়েডের তত্ত্বের একটি দিক আমাদের কাছে পরিষ্কার করলেন। তারপর সেই তত্ত্ব যে ঠিক নয়, সেটা পরের স্বপ্নে দেখালেন।

২. শুধু দার্শনিক বা মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ই নয়, বিজ্ঞানের গভীর তত্ত্বকথা কিভাবে আধ্যাত্মিকতার আলোকে ব্যাখ্যা করা যায় সেটি জীবনকৃষ্ণ আমাদের দেখিয়েছিলেন। একদিন খগেন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুরকে বললেন, এখন সায়েন্টিস্টরা বলছে নেগেটিভ ইউনিভার্স আছে। ঠাকুর ঘোষ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন,

আচ্ছা, নেগেটিভ ইউনিভার্সের বাংলা মানে কি বলুন তো। উত্তরে উনি বললেন, ওর বোধহয় বাংলা হয় না। ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আরে মশাই এর মানে হলো ছায়া জগৎ। তাই রাম প্রসাদের গানে আছে, ‘‘তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি পোড়া, মিষ্টি বলে ঘুরি।’’ সৃষ্টি মানে এখানে জগৎ—ইউনিভার্স। আর দৃষ্টি পোড়া মানে ছায়া। অর্থাৎ গাছপালা পুড়ে গেলে কালো হয়ে যায় কি না। গাছের ছায়ার মত। সেটা মিষ্টি কেন? কারণ আমি নিজে মিষ্টি কিনা। তাই যা কিছু ভুল দেখছি সবই আমার কাছে মিষ্টি লাগছে। এই আলোচনা সেদিন অদ্ভুত লেগেছিল।

পাঠপরিক্রমা—১

১৩ ই নভেম্বর, ২০২১ (২৬ শে কার্তিক, ১৪২৮)—শনিবার অনলাইনে পাঠের অংশ বিশেষ।

প্রসঙ্গঃ ‘আমি কী’ এই তত্ত্ব জানবার জন্য মানুষ জগতে এসেছে। (*অমৃত জীবন* ১৭ই জানুয়ারি, ১৯৬০ পৃঃ ১২৪)

আজকের দুপুরের অধিবেশনে সম্মিলিত পাঠ আলোচনায় নতুন কিছু কথা উঠে আসে। এখানে সেইগুলি তুলে ধরা হলো—

জয়কৃষ্ণ চ্যাটার্জী ঃ আচ্ছা কোন্ বিষয়ে প্রশ্ন রয়েছে—‘জন্মাদ্যস্য’ আর revelation?

অমরেশ চ্যাটার্জী ঃ দু তিনটে প্রশ্ন এসেছে। তার সাথে এই প্রশ্নটাও আছে। আমি বলছি যে জন্মাদ্যস্য যদি বলা হয় তাহলে যেন মনে হচ্ছে যে জন্ম থেকেই মানুষটা ভগবান। তাহলে আর তার evolution এর কি প্রয়োজন? যোগে যে বলা হচ্ছে যে একটা পরিবর্তন হয়ে আত্মা সাক্ষাৎকার হচ্ছে; তিনি ভগবান হচ্ছেন, জগৎ হচ্ছেন—তাহলে উনি জন্ম থেকেই ভগবান হয়েছেন! এটা বলে দিলেই তো হয়ে যায়।

জয়কৃষ্ণ ঃ তা হয়। কিন্তু সাথে সাথে অনেকগুলো প্রশ্ন তখন জেগে যায়। ওই বাইরে আবার মন্দিরের প্রভাব গুলো পড়ে যাবে। বাইরে থেকে যেন ঢুকে পড়ল এই ধারণাটা জেগে যাবে।

অমরেশ ঃ হ্যাঁ সেরকমই চলে আসবে তো।

জয়কৃষ্ণ ঃ হ্যাঁ। তাহলে হিসাব দাঁড়াচ্ছে ওই গোলাপ গাছ। গাছটা এনে তুমি যখন ঘরে পুঁতলে তখনই তুমি জেনে গেলে যে ওইটা গোলাপ ফুল দেবে। এটা জানাই হয়ে গেছে। কিন্তু ওই গোলাপ ফুল ফুটবে যখন তখন একটা revelation হবে। আর side by side একসাথে evolutionও চলবে। এ প্রসঙ্গে দীপদা কি বলছিলে একবার বলতো?

সৌম্যদীপ সেন ঃ আমি যেটা বলছিলাম, সেটা হচ্ছে evolution প্যারালাল চলছে তো revelation এর পাশাপাশি?

জয়কৃষ্ণ ঃ হ্যাঁ চলছে পাশাপাশি। এবার সেখানে একটা পর্যায়ের ব্যাপার

থাকে। এখানে জন্মাদ্যস্য যেটা বললে সেটা জেনেটিক ব্যাপার। বায়োলজিক্যাল ব্যাপার। আমার স্থূলে জন্ম হলো, ওইখান থেকে ব্যাপারগুলোকে না ধরাই ভালো। যেমন ধরো বাইরে যদি কথাটাকে ধরি, আমাদের তরফ থেকে, জন্ম হলো আর 'আমি কী?' এটা কি কেউ খুঁজতে বসে? বসবে না। একটা বাচ্চার যেদিন জন্ম হলো সেইদিন থেকে কি আর শুরু হয় ''আমি কী'' এই প্রশ্নের সার্চিং? শুরু হয় না। মানে প্রাক্টিক্যালি যদি ভাবা যায় বাস্তবতার দিক থেকে তাহলে কিন্তু হয় না।

এবার যদি সেটাকে এইভাবে ঘুরিয়ে নিই যে তার জন্ম শুরু হলো, যখন তার ঈশ্বরমুখী মন বা সূক্ষ্ম মনের জাগরণ হল—যেমন এখানে একটা কথা আগেই বলা হয়েছে যে, আসক্তি থাকলে হয় না। উনি ওই কথাটাকে ডিসকার্ড করছেন, উল্টাচ্ছেন। উনি বলছেন যে আগে দর্শন হয়। যখনই একটা দর্শন হলো, সে যে রকমই হোক না কেন, তাকে পারফেক্টলি দেখতে হবে তা নয়, আত্মা সাক্ষাৎকার করতে হবে তা-ও নয়; যেমনই একটা দর্শন হোক যেটা ঈশ্বরমুখী, তাহলে সেইখান থেকেই যদি আমি জন্মটাকে ধরে নিই তাহলে revelation আমাদের দিক থেকে বলতে পারব যে তখন থেকেই ওর প্রকাশ স্টার্ট হল, শুরু হল প্রক্রিয়া। আর বছরের যে একটা হিসাব দেওয়া হয়—১২ বছর, তারপরে ২৪ বছর, তার মানে ওই যে জন্মের যে দিনক্ষন ওখান থেকে আমরা কাউন্ট করতে করতে চলি। এখন সেই যে প্রসেস, যে evolution হবে তার একটা সময় থাকবে—যেটা অমরেশ কাকা বলছো, যে ঈশ্বরই মানুষ হয়ে জন্মালেন; কিন্তু প্রথমেই সে যদি ঈশ্বর হয়ে প্রকাশ হয়ে যায় তাহলে সেটাকে প্রথমত, বলা হবে অলৌকিক। দ্বিতীয়তঃ এই দেহের যে ক্রিয়া-বিক্রিয়া, এই জিনিস আমরা বুঝব না। তখন মনে হবে যে বাইরে থেকে ঘটনাগুলো ঘটে; বাইরেই থাকে সব। অন্তরের ব্যাপার নয়। এই বোধটা আমাদের কাছে তখন দৃঢ় হবে। তাই না? তাহলে ঈশ্বর উনি অবশ্যই, সেইজন্য উনি বলেছেন জন্মাদ্যস্য—শিশুকালের অনুভূতি ধরে কিছু কথা। কিন্তু তার যে evolution হবে তার একটা সময় থাকবে। অনেকগুলো পর্যায় হবে তার যেমন ধলোকাকা বলল একটা 'গ্রোথ'। একজ্যাক্ট যে গ্রোথ সেইভাবে আমরা বলতে পারব না, তবে সেইটারই যেন একটা প্রকাশ পাচ্ছে। এবং evolution side by side তো হচ্ছেই। তাহলে ঈশ্বর একজন মানুষ হয়ে জন্ম নিলো, এই জন্ম হলে তার যে প্রকাশ, যে আমি ঈশ্বর এবং ঈশ্বরত্ব যে

প্রকাশ পাবে তা ধাপে ধাপে আসবে—যে এই সময় হলে এই অনুভূতি, এই দর্শন হবে। কিন্তু সে ঈশ্বরই। তার মধ্যে একটা evolution হবে। সেই evolution এর যে প্রভাব তার তখন আবার revelation হবে। আবার ওই revelation এর পর মানে প্রত্যক্ষ যে প্রকাশ পেল তার উপর আবার একটা evolution হবে। সেটা আবার প্রকাশ পাবে। এই প্রসেস ধীরে-ধীরে, চলতে থাকবে। তাহলে আমরা বুঝব যে দেহের ভেতরে ক্রিয়া হয়, চিন্তার পরিবর্তন হচ্ছে, আমাদের সূক্ষ্ম মনের পরিবর্তন আসছে—সেইগুলোকে আমরা অনুধাবন করতে পারব।

এখন যদি আমরা বাইরের একটা উদাহরণ বলি—

সৌম্যদীপ ঃ আচ্ছা এই মাস্টারমশাইয়ের উদাহরণটা চলবে? মাস্টারমশাইকে যখন রামকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, ''তোমার সেই আশ্বিনের ঝড়-এর কথা মনে পড়ে?'' তখন মাস্টারমশাই রি-কালেক্ট করে বলছেন, ''তিনি কি শিশুকাল থেকেই আমাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন?'' তার মানে মাস্টারমশাইয়ের সেই শিশুকালেই evolutionটা হয়ে গেছিল। revelationটা হচ্ছে অনেক পরে।

জয়কৃষ্ণ ঃ হ্যাঁ, সেটা হবে। evolution আর revelation দুটো জিনিসই থাকে। কিন্তু অমরেশ কাকার যে প্রশ্ন যে জন্মাদ্যস্য হলে আর এটার কি প্রয়োজন? প্রথমত, এখানে জন্মাদ্যস্য মানে জন্ম থেকেই এই জিনিসটা আমি ধরবো না- আমাদের ক্ষেত্রে এবং ওনার ক্ষেত্রেও ধরবো না। যখনই উনি জন্ম গ্রহণ করলেন তখনই revelation স্টার্ট নয়। জানি উনি ঈশ্বর। ওনার ভেতরে আত্মার সংকলন হবে। সেই ভাবেই তৈরি হয়েছে। সেভাবেই হবে। বস্তুতত্ত্বের সাধন হবে। তার জন্য এরকম ভাবেই একটা ক্যাপাসিটি হওয়া দরকার বা বিল্ড আপ হওয়া দরকার। যেমন আমাদের জমি থাকে সেখানে দেখি যে এক একটা জমিতে এক এক রকমের চাষ হয়। সব জমিতে সব চাষ করা যায় না। কোথায় কি রকম ফসল হবে, না হবে এটা একটা pre-determined ঘটনা, তৈরি হয়েই থাকে। কিন্তু সেইটার একটা revelation দরকার, একটা evolution দরকার। তাহলে আমরা বুঝতে পারবো। যেমন তুমি এই উদাহরণটা দিলে, মাস্টারমশাইয়ের—সেটা ঠিক।

আরেকটা যেটা বলছিলাম এটা হচ্ছে বছর। ২৪ বছর ৮ মাস, ১২ বছর ৪ মাস,—এই বছর নিয়ে যদি মনে হয় যে আমরা জন্ম থেকেই কাউন্ট করছি; তাহলে বাইরে যদি অন্য একটা এক্সাম্পল নিই—এই যেমন

ধরো তুমি চাকরি কোন বছর পাবে তার ওপর নির্ভর করছে তুমি কতদূর প্রমোশন পেতে পারো। তুমি যদি ৪০ বছরে চাকরি পাও তাহলে তুমি একটা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত প্রমোশন পাবে। তার বেশি হবে না। কিছুতেই হবে না। বড় বড় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পোস্টে কারোর যদি ২১ বছর বয়সে চাকরি হয় তাহলে সে ক্যাবিনেট সেক্রেটারি হতে পারে যেটা কিনা হায়েস্ট পোস্ট। যদি ২২ হয় সে পাবে না। যদি তেইশে হয় সে পাবে না, কিছুতেই পাবে না। এরকম একটা টাইম লিমিট করে দেওয়া আছে।

এখন আত্মিকে দেখা গেল যে তার ৩০ বছর বয়সে এই আত্মা সাক্ষাৎকারের ঘটনাটা ঘটলো। হতেই পারে। কিন্তু ৩০ বছরে হলে অসুবিধাটা কোথায়? ৩০ বছরে হলে তার একটা revelation তো হতে হবে। ৩০ বছরে যে আত্মা সাক্ষাৎকার হলো তার একটা প্রকাশ ঘটবে। এই প্রকাশ ঘটার একটা টাইম থাকবে। যদি টাইমটা না থাকে তাহলে আমাদের মনে হবে অলৌকিক। সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটা অলৌকিক ফট করে ধরে নেব। এই ৩০ বছর থেকে যে revelation আর মাঝে যে ছোট্ট একটা গ্রেস পিরিয়ড যেটা রিসেস পিরিয়ড, সেই রিসেস পিরিয়ডে evolution হচ্ছে। সেই প্রসেসটা দেখানো হয় বা বোঝা যায়। তারপরে revelation হল। এখন ৩০ বছর বয়সে যদি আত্মা সাক্ষাৎকার হয় তাহলে তার পূর্ণতার প্রকাশ আর হবে না। তাহলে তাকে আরও লং এক্সটেন্ড করতে হবে লাইফ। এখন সেটা যদি আবার লং এক্সটেন্ড লাইফ হয় সেটা অলৌকিক হয়ে যাবে। একটা ধারণা হয়ে যাবে যে ঈশ্বর হলেই কেউ ২০০ বছর বাঁচতে পারে। প্যারিটি থাকবে না। সে আর এক সমস্যা, আমরা তৈরি করি সেই সমস্যা। আমরা পট করে অলৌকিকটাকে ধরে নেব। এই একটা টাইম তাহলে খুব ভাইটাল হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে যে ঠিক ঠিক টাইমে হলে তার revelation ঠিক টাইমে চলে আসবে। তখন আমরা বুঝতে পারব যে এই পদ্ধতি হলে, এইভাবে এগোলে একটা মানুষের পোটেনশিয়ালিটি তাকে কোনদিকে নিয়ে চলে যায়, তার ঈশ্বরত্ব অবস্থা কেমন হয় আমরা সেটা বুঝতে পারব। উনি যে সমস্ত বেদের রেফারেন্স দিচ্ছেন, নিয়ে বলছেন 'তোদের ধর্মশাস্ত্র' তার মানে উনি বেদ লেখেননি। বেদের কথা বলেনও নি। ওটা আমাদের ইনভেনশন। যাই হোক...। ওই যে সমস্ত রেফারেন্স উনি দিয়েছেন। যেখানে শ্লোকের কথা বলা রয়েছে—এই যে বিষ্ণুত্ব অবস্থা, শিবত্ব অবস্থা—এই অবস্থাগুলির ব্যাখ্যা আমরা তখন বুঝতে পারব। না হলে দুম করে কড়ে

আঙ্গুলে পাহাড় তোলার মতো ঘটনা দাঁড়িয়ে যাবে। পাহাড় কিন্তু উঠছে, সংস্কার উঠছে, কিন্তু সেটা ওই দুম করে কড়ে আঙুলে হয়ে যাবে। তখন ওইখানে একটা অলৌকিক ভাবনা এসে যায়।

তাই জন্মাদ্যস্য কথাটা দুদিক থেকে আমি নেব। এক, যখন ঈশ্বর দর্শন বা কোন অনুভূতি যা আমাদের ঈশ্বরমুখী করে তোলে সেখান থেকে আমার revelation স্টার্ট। জন্মাদ্যস্য—যাদের বস্তুতত্ত্বে সাধন তাদের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি থাকে। কিন্তু তাদের যে প্রক্রিয়া, তাদের পূর্ণতা লাভের জন্য একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঘটনাটা ঘটে। এজন্য মনে হয় উনারা জন্ম থেকেই সেই revelation এর দিকে স্টার্ট করেছেন। কিন্তু ওনার মধ্যে এই প্রক্রিয়া শুরু ১২ বছর ৪ মাসে সচ্চিদানন্দ গুরু লাভে। তাহলে তার জন্ম ১২ বছর ৪ মাস বয়সে। এরপর আরো ১২ বছর ৪ মাস পরে তার ২৪ বছর ৮ মাস বয়স হলো। এই একযুগে তার আত্মা সাক্ষাৎকার হলো। তারপরে ছোট্ট একটা রিসেস পিরিওড। evolution হল। আর সেটা একুমুলেটেড হল। সেটা আবার revelation হয়ে গেল। তাহলে যেটা ঘটলো উনি সেটাকে করায়ত্ত করলেন। তার জন্য একটা ছোট্ট রিসেস পিরিয়ডও চাই। তার আবার প্রকাশ হলো। তারপর আবার তার পরের স্টেপ আসবে। কিন্তু যখনই তিনি ঈশ্বর হলেন এখানে কোনো দ্বিধা থাকার দরকার নেই। কেন নেই? এই যে বলছে বস্তুতত্ত্বের সাধন। এই যে বলা হয় পোটেনশিয়ালিটি, প্রত্যেকেই ডাক্তার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে কিন্তু প্রথম থেকেই তা নয়। ডাক্তার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে ক্লাস টুয়েলভ এর পর। কিন্তু ছোট থেকেই তার ডাক্তার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। দুটোর মধ্যে অনেক তফাৎ। ডাক্তার আমিও হতে পারতাম। ছোটবেলায় বলতাম আমিও ডাক্তার হব। তাহলে সেই পোটেনশিয়ালিটি প্রত্যেকেরই থাকে। কিন্তু সেই পোটেনশিয়াল থাকা মানেই তিনি তা হয়ে যান না। আমার পোটেনশিয়ালিটি আছে মানে আমি ঈশ্বর হয়ে যাব, তা নয়। কখনোই না। সেটা আবার অহংকার-এর প্রকাশ, যেটা লাস্টে বলেছে। লাস্টে যে শ্লোক দিয়ে বলেছে ব্যষ্টির কথা (সর্বানি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি...), সেটা আবার অহংকার হয়ে যাবে। ব্যষ্টির কিছু সাধন হতে পারে, বড় বড় সাধন হতেই পারে, না হওয়ার কোন কারণ নেই—কিন্তু সেই সাধনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আবার যদি বলি, মানে আমরা যদি আবার ভাবি সেখানে একটা অহংকার-এর মাত্রা যুক্ত হবে। কারণ আমাদের যে সাধন প্রক্রিয়া, আমাদের যে

পোটেনশিয়ালিটি আছে, সেই ফুল পোটেনশিয়ালিটির একটা পার্ট নিয়ে আমরা চলছি। তাহলে আমাদের যে পোটেনশিয়ালিটি সেটা অর্ধেকেরও কম, একটা অংশ। আর ওনার, যার বস্তুতত্ত্বের সাধন হবে তার কিন্তু ফুল পোটেনশিয়াল। তার ক্ষেত্রে ওই ঘটনাটি ঘটে। বোঝা গেল 'জন্মাদ্যস্য'-টা? না, গুলিয়ে গেল?

অমরেশ ঃ না, ঠিকই আছে। ওদের ভাগবতের কথাটা শুনলে তো মনে হয় অলৌকিক। তবে এখানে আরেকটা প্রশ্ন আমি তোকে করবো। আমাদের ক্ষেত্রে প্রথম একটা দর্শন, যেটাকে আমরা জন্ম ধরছি, ওখান থেকেই আমাদের স্টার্ট হচ্ছে,—এই দর্শন তাকে কি বলে দেবে তার কতটা প্রমোশন হবে?

জয়কৃষ্ণ ঃ প্রথম দর্শনটা বলছো?

অমরেশ ঃ প্রথম দর্শনটা দিয়ে জন্ম হলো, যেটা শুরু করলি তুই, প্রথম যে দর্শনটা যেটা থেকে বলছি আমার যে জন্ম হল, যেটা ঈশ্বর মুখী করছে প্রথম, আর বায়োলজিক্যাল জন্ম থেকে তো হয়না, যেটা তুই পরিষ্কার করলি;—ওই যে প্রথম দর্শন আমাদের যেটা হচ্ছে, ওই দর্শনটা কি বলে দিচ্ছে যে কতটা প্রমোশন হবে তার? কতটা বোধ তার বিকশিত হবে? নাকি টাইম?

জয়কৃষ্ণ ঃ হ্যাঁ, বোঝা যায়। কিন্তু সেটা বাস্তবায়িত হবে কিনা সেটা আবার আলাদা প্রশ্ন। প্রথম দর্শন, সেটা কিন্তু বলে দেবে যে কতটা তোমার অগ্রগতি হতে পারে। এবারে সেই অগ্রগতি মানে এরকম নয় যে তুমি ঈশ্বরত্ব লাভ করবে, বা তুমি এই পর্যায় পর্যন্ত যাবে—এইরকম নয়। পোটেনশিয়ালিটি বোঝানোর ক্ষেত্রে ধরবো, ওই ক্ষেত্রে বলা হয়—সে ঈশ্বরমুখী থাকবে কিনা, এক। দুই, তার যে অন্তরের পরিবর্তন যে সূক্ষ্ম মনে অধিষ্ঠান হবে কি না সেটা বোঝা যায়। তোমার যে প্রথম দর্শন, যে দর্শনে তোমার মন অন্তর্মুখী হবে, সেই দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যাবে যে তুমি ঈশ্বরমুখী থাকবে কিনা, মানে একটা আভাস। এরপরে যে থেকেই যাবে তা নয়, একটা পোটেনশিয়ালিটি বোঝা গেল যে এ ঈশ্বরমুখী, এর সূক্ষ্ম মনের আবির্ভাব হবে, সূক্ষ্মমন হবে—এইটুকু তুমি একটা আইডিয়া করতে পারবে বা বোঝা যাবে—ওই পোটেনশিয়াল হবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ঐ টাইমফ্রেমে তুমি লাস্টিং করবে! সেই লাস্টিং এর প্রসঙ্গে অবশ্যই যুক্ত হবে evolution. Evolution যত হবে, যত মনন হবে, ধীরে

ধীরে আরো এগিয়ে যাবে। তাহলে সেটা মনন করার ক্ষমতা, এক; দুই, ঈশ্বরের প্রতি টান। তিন, সূক্ষ্ম মনে দর্শনগুলোকে ব্যাখ্যা করা;—এর ক্যাপাসিটি, সেটা বোঝা যায়। বুঝলে?

অমরেশ ঃ আচ্ছা আচ্ছা।

সঞ্চিতা ঃ আচ্ছা জয় তুমি ওইটা কেন বললে যে উনি বেদের কথা রেফারেন্স হিসেবে বলেননি? মানে ওই যে বললে বিষ্ণুত্ব, শিবত্ব এর ব্যাখ্যাটা যে আমরা বুঝতে পারব—ওই যে evolution হবে—ওই খানটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

জয়কৃষ্ণ ঃ উনি যেখানে বলছেন 'তোদের ধর্ম শাস্ত্র'—এইখানটা বলছো? যখন বললাম যে উনি বেদ লেখেননি—এইখানটা?

সঞ্চিতা ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ—ওইটা বলছি।

জয়কৃষ্ণ ঃ উনি তো বেদের কথা বলবেন না। উনি কেন বেদের কথা বলবেন? ঋষিরা একটা চেতনা লাভ করেছিলেন—তাদের যে দর্শন, যে অনুভূতি হয়েছিল সেটা লিপিবদ্ধ হয়েছে বেদে। বেদ তো ওনার নয়! বেদ আমাদের কথা। এবারে আমাদের যে অনুভূতি সেই অনুভূতির অংশবিশেষ দিয়ে, মানে তখনকার ঋষিদের, মুনিদের যে সমস্ত অনুভূতি সেইগুলো নিয়ে একটা সংকলন। এবারে এই জন্য একটা কথা ওখানে বলেছেন যে—তোদের শাস্ত্র যেখান থেকে কথা বলছে আমি সেখান থেকেই শুরু করেছি। তাহলে এই 'যেখান'-টা কোথায়? এটা একটা প্রশ্ন। আর "আমি সেখান থেকেই শুরু করেছি"—এখানে 'সেখান'টাই বা কোথায়? সোজা একটা কথা থাকে—দস্যুদের কাজ যেখানে শেষ সেখান থেকে আইন শুরু হয়। দস্যুরা চুরি করল, এখানেই থেমে গেল, ওইটা তার কাজ। তারপর থেকে আইনের কাজ। তাহলে এখানে একটা প্রশ্ন যে ধর্মশাস্ত্রে যেখান থেকে কথা বলছে আমি সেখান থেকেই "ধর্ম ও অনুভূতি" লিখে দিয়ে গেছি। আরেকটা কথা, এই যে ধর্মশাস্ত্র, বেদের যে সমস্ত কথা, যে সমস্ত অনুভূতির কথাগুলো বলা হয়েছে, যে অনুভূতিপ্রাপ্ত হয়ে কথাগুলোকে বলেছে; কিছু কথা ভেজাল থাকে, কিন্তু সব কথা তো ভেজাল নয়! তার তো যৌগিক ব্যাখ্যা, যোগাঙ্গের ব্যাখ্যা আছে। ওই ঋষিদের তো অনুভূতি হয়েছিল। সেই অনুভূতি হয়ে যে লিপিবদ্ধ হয়েছে, কখনো সেখানে ঈশ্বরকে বিষ্ণুত্ব অবস্থা বলা হয়েছে, কখনো শিবত্ব অবস্থা বলা হয়েছে, আবার এটাকে ব্রহ্মও বলা হয়েছে। পরমব্রহ্মও বলা হয়েছে। এই অবস্থাগুলো কি? তার অর্থ কি?

কোন অনুভূতির পরিপ্রেক্ষিতে কথাগুলো আসতে পারে?—সেইগুলো এই evolution আর revelation এর দ্বারা আমরা বুঝতে পারি। তাই ওই একটা পদ্ধতি বা প্রগতি যে সময়ের সাপেক্ষে এগোবে, সেটা থেকে আমরা বুঝতে পারি। আর বেদের যে সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে—ওগুলো উনি (জীবনকৃষ্ণ) কি করে বলবেন? ওটা তো ওনার কথা নয়! যেমন ধরো, এই যে শ্লোকটাকে নিয়ে বলা হয়েছে যস্তু সর্বানি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি —এটা কারোর একটা অনুভূতি। ঈশোপনিষদ এর ষষ্ঠতম শ্লোক। এটা কারোর একটা দর্শন হয়েছিল, কিছু একটা বুঝেছিলেন তিনি। কিন্তু এই বোঝাটা আংশিক। এখন এই কথাটার অর্থ কি, তার ইম্প্লিকেশন (implication) কি, তার তাৎপর্য কি হবে, সেই জিনিসটা বুঝতে এই একজনার যে এরকম প্রসেস হয়েছে, সে ধীরে ধীরে কি অবস্থার মধ্যে দিয়ে গেছে সেইটা আমরা বুঝতে পারবো। তখন বুঝতে পারব ওই শ্লোকের সাথে এনার অগ্রগতির লাস্ট রিভিলেশনের কোথায় সামঞ্জস্যটা হারাচ্ছে। এটা পরিষ্কার। বলা হচ্ছে যে আত্মা সাক্ষাৎকার করলে বিশ্বব্যাপীত্ব হবে, উনি নিজে বলবেন তা নয়, মানুষ বলবে। তাই না? মানুষ তাকে এসে বলবে যে—তোমাকে দেখি। এই যে ঘটনাগুলো, এই যে বোঝা—আমরা ঠাকুরের (জীবনকৃষ্ণ) লাইফটাকে দেখে বুঝতে পারছি। তিনি এই প্রসেসগুলো পরিষ্কার দেখিয়েছেন। তাই উনি বেদের কথা কেন বলতে যাবেন, বেদের কথা উনি বলবেন না। ঠিক সেইরকম উনি এই যে প্রচলিত ধর্ম সেগুলো নিয়ে কিছু বলবেন না। বুঝতে পারলে?

সঞ্চিতা ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ এটা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি বলছি যে ঋষিদের যে অনুভূতি বা দর্শন সেইগুলো ওনার জীবনে যখন ওনার ব্যষ্টির সাধন হচ্ছে, তখন সেগুলো সম্পূর্ণ ধাপে ধাপে হয়ে যাচ্ছে। মানে ওগুলো যেন আগে বলা ছিল আর ওনার এখন হচ্ছে- এরকমই তো ব্যাপারটা? বেদ বলতে আমরা একটা গ্রামার বুঝি। আমাদের বোঝার ক্ষেত্রে।

জয়কৃষ্ণ ঃ হ্যাঁ। ওটা মনে হচ্ছে। যদি বলা হয় যে দেখ, এই ঘটনাটা ঘটলো এই ঘটনাটা ঘটে। তখন বলা হবে, তাই আবার হয় নাকি? যেমন, গাছ অক্সিজেন দেয়। এখন আমরা বললে বলি যে গাছ সালোকসংশ্লেষ করে অক্সিজেন দেয়। তার সাথে জল প্রদান করে। তাই না? ১২ অনু অক্সিজেন ৬ অনু জল। এখন যদি বলা হয় অক্সিজেন দেয় না, কেউ বলবে তাই হয় নাকি? কেউ বলবে অক্সিজেন দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ল্যাবরেটরীতে

গিয়ে দেখানো হয়ে গেল অক্সিজেন কেমন হয়। জলকে ভেঙে দিলে অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন হয়। একজন বলছে, তাই আবার হয় নাকি। কোনদিন হয় নাকি। ওই দেখ ল্যাবরেটরী টেষ্ট কি দেখিয়েছি। জল ভাঙ্গা হলেই অক্সিজেন পাওয়া যাচ্ছে—তখন সে বলে, তাইতো হয় দেখছি। মানে একটা ব্যাপার পরিষ্কার যে এই যে আত্মিক অবস্থা হচ্ছে—'তাই হয় নাকি, এরকম আত্মিক অবস্থা হয় নাকি', প্রশ্ন উঠলে তখন বলা হবে যে বেদ কি বলছে। কোন অনুভূতি ঋষিদের হয়েছিল? তখন বলছে এই অবস্থা হলে এই হয়—তাহলে দেখ ওই অবস্থার প্রকৃত অর্থ কি! তার মানে আমি লাস্ট স্টেজে বলছি, বিষ্ণুত্ব—সেই বিষ্ণুত্ব অবস্থা হলে কি হয়? যেমন বলছে- অহং ব্রহ্মাস্মি। মানুষই ব্রহ্ম হয়। তাহলে দেখ ব্রহ্মটা কেমন! অহং ব্রহ্মাস্মি কথাটার যে তাৎপর্য, ওখানে আবার কি যে 'loophole' আছে, সেটা তো উনি বুঝতে পারেননি। উনি তো উপলব্ধি আরেকরকম করেছিলেন। আমরা এক রকম উপলব্ধি করেছি। সেই উপলব্ধিটা কোন লেভেলের? কারণ যিনি বলেছিলেন অহম ব্রহ্মাস্মি সেই যাজ্ঞবল্ক্য মুনির একটা অনুভূতি ছিল এটা। তার আগে তো কোন রেফারেন্স নেই। যাজ্ঞবল্ক্য মুনি যা বলছে তাই। এবং উনি যে কোন পরিপ্রেক্ষিতে কথাটা বললেন সেটা পরিষ্কার নয়। উনি বলছেন আমি ব্রহ্ম—অহং ব্রহ্মাস্মি। তখন ঠাকুর বলছেন দেখ বেদেও এরকম বলছে। তাহলে কোন জায়গায় loophole (ছোট্ট ত্রুটি) আছে, সেইটাকে আমরা বুঝছি। তার মানে এই নয় যে বেদে যে স্কেল দেওয়া আছে সেই স্কেলটা পারফেক্ট। সেই স্কেল ধরে হচ্ছে না জীবনকৃষ্ণের। ওনার নিজের গতিতে হচ্ছে, সেই গতিটা আমরা ওই বেদের যে স্বরচিত স্কেল সেই স্কেলের সাথে মেলাই। তাহলে আমরা দুটো জিনিস বুঝবো —প্রথমত, উনি যেটা বলছেন সেটা একটা বাস্তব ঘটনা। এইটা প্রথমে আমাদের মনে ছাপ ফেলবে। দ্বিতীয়তঃ, দ্বিতীয় স্তরে আমরা বুঝব যে ওই যে বেদের স্বরচিত স্কেল হয়ে গেছে, সেই স্কেলের কোথায় ভুল হয়ে গেছে। **তাহলে বেদের যে কথা সেই কথা গুলো ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত নয়।** যেমন রামকৃষ্ণের যে বাণীগুলো সেটা বেদের থেকে অনেকাংশেই স্ট্রং। যদিও সেখানে কিছু কিছু জায়গায় আবার গণ্ডগোল আছে। আর ঠাকুরের (জীবনকৃষ্ণ) তো কোন কথাই নেই! তাহলে বেদের কথাগুলো থেকে আমরা মিলিয়ে নি, নিয়ে কি ঘটনা ঘটছে সেটা বুঝি। ওইটার রেফারেন্স দিলে সুবিধা হয়। বেদে শুধুমাত্র যাদের যাদের দর্শন অনুভূতি

হয়েছিল সেই অনুভূতিগুলির কথাই লেখা আছে। এইরকম অন্য কোন জায়গায় আর লেখা নেই। সেটা কোরানই হোক, ওল্ড টেস্টামেন্ট হোক, নিউ টেস্টামেন্ট হোক, ত্রিপিটক হোক, দ্বাদশ অঙ্গ হোক কোনও জায়গায় এইরকম দর্শন অনুভূতির কথা বেশি লেখা নেই। একটা কারণ এখানে পরিষ্কার যে তাদের সে রকম অনুভুতি হয়নি, তাই লিখে যেতে পারেনি, বুঝতে পারেনি। তারা সামাজিক ঘটনাগুলোকে নিয়েই বেশি জোর দিয়েছিল। সেজন্য ওখান থেকে কোন রেফারেন্স টানার প্রয়োজনই নেই। যখন সামাজিক দিক থেকে কোনও কথা ওঠে তখন ওই দিক থেকে আমরা নিয়ে নি, আমরা উদাহরণ টানি যে বাইবেলে এই বলছে, নিউ টেস্টামেন্ট এই বলছে ইত্যাদি। ওখানে যদি কিছু আত্মিক-এর দর্শনের কথা হয় সেগুলোকে আমরা টেনে নেই। আমরা বলি যে ওখানেও সেই কথা বলছে। সেগুলোকে আমরা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করি। এর দুটো কারণ। এক, যে বক্তব্যটা বলছে সেখানে একটা ছাপ ফেলা; দুই, সেই বক্তব্যের, মানে সেই রেফারেন্সের কোথায় গন্ডগোল সেটা উপলব্ধি করা, বোঝা। সেই জন্য এইটা ঠিক নয় যে বেদের রেফারেন্স অনুযায়ী ঘটনাগুলো ঘটছে! মনে হচ্ছে যে পরপর যেগুলো বলেছেন তাই ঘটছে, তা কিন্তু নয়। কারণ চারটে বেদ আছে, প্রতিটা বেদের আবার চারটে করে উপবেদ আছে। এছাড়াও আছে বেদাঙ্গ। তারপরে আছে উপনিষদ—তাদের ব্যাখ্যা। এই সবগুলোর মধ্যে একমাত্র বেদই হচ্ছে সঠিক। সেটা হলো ঋগ্বেদ।

আচ্ছা আমরা এখানে যতজন পাঠ শুনছি তাদের মধ্যে কারোরই পরপর পেজ বাই পেজ বা লাইন বাই লাইন ঋকবেদ পড়া আছে?

(সকলেই নীরব)

কারোরই পড়া নাই; মানে মেজরিটির।... তাহলে বেদে যে রেফারেন্স গুলোকে পরপর বলা হয়েছে, যদি বলি রেফারেন্স গুলো পরপর নাই? রেফারেন্সগুলোকে ঠাকুর পরপর টেনেছেন, দিয়ে যে দর্শনগুলো পরপর হয় সেই ভাবে রেফারেন্সটাকে পরপর দাঁড় করিয়েছেন,—ধরা যাক আত্মা সাক্ষাৎকারের কথা বেদের চতুর্থ পর্যায়ে বলছে। সত্যি করেই চতুর্থ অধ্যায়ে আছে। সেই কথাটাকে উনি প্রথম সারিতে রাখলেন। নিয়ে আমাদের মনে হচ্ছে যে বাহ! এই কথাটাকে প্রথমেই বলা হয়েছে! তা কিন্তু বলেনি। রেফারেন্সগুলোকে পরপর বলেনি বেদে। বেদ একটা কালেক্টেড ব্যাপার। অধিকাংশই মুনি ঋষির দর্শন গুলিকে একত্র করা হয়েছে। বিভিন্ন স্কুল অফ

থট অর্থাৎ আশ্রম—সেখানকার মুনি-ঋষিরা লিখেছিলেন এইটা। এটাকে পরে কালেক্ট করা হয়েছে। যেমন ধরো যাজ্ঞবল্ক্য মুনি, একটা দর্শন লিখে গেলেন। উনি উপনিষদের। বেদের আবার অন্য ঋষি ছিলেন। ওনার যে দর্শন সেইটা উনি টুক করে লিখে দিলেন। যেমন ধরো আমার একটা লেখা হলো, ছোটমামা একটা লিখল, ধলোকাকা একটা লিখল, তুমি একটা লিখলে— সবাই একটা একটা করে লিখল। এবারে ধরে নাও সাগর এল, এসে এই সবগুলোকে কালেক্ট করে নিল। এইভাবে আলফাবেটিক্যালি সাজালো। প্রথমে বরুণ, তারপরে সঞ্চিতা দি তারপরে ছোটমামার হবে। ছোটমামা যে কথাটা বলেছে সেইটা প্রথম সারিতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যারা কালেক্ট করেছে তারা যেভাবে পরপর বলে গেছে সেই ভাবে কিন্তু পরপর নয়। তাহলে যার ক্ষেত্রে সঠিক ভাবে এই evolution আর revelation হচ্ছে তিনি রেফারেন্সটাকে টেনে এনে বলছেন যে, দেখ বেদে এইরকম বলছে। তখন আমাদের মনে হচ্ছে যে বেদে পরপর এই ভাবে দর্শনগুলোকে রাখা হয়েছে। বুঝতে পারলে?

সঞ্চিতা ঃ বুঝলাম।

জয়কৃষ্ণ ঃ কিন্তু বাস্তবে ওই রকম নাই। একদম ডেফিনেটলি নাই। যেমন একটা উদাহরণ আমি জানি সেটা দিয়ে বললাম।... বাকি আমরা পড়িও নাই জানিও না। এখন মাঝে মাঝে জীবনকৃষ্ণের ঘরে ওই পণ্ডিতমশায় মানে ধীরেন বাবু বলতেন যে এইটা এই শাস্ত্রের এখানে লেখা আছে। সেটা কিন্তু অনেক পরে লেখা উপনিষদের কথা টানছেন। উপনিষদ বেদের কথা নয়, বেদের ব্যাখ্যার কথা বলা হয়েছে। এই ব্যাখ্যা করার সময় মনে হচ্ছে যে পরপর এইভাবে ঘটেছে, তা নয় কিন্তু। এজন্য উনি ল্যাংগুয়েজ এর উপর খুব জোর দেন যে 'তোদের ধর্মশাস্ত্রে'। কিন্তু এটা পরিষ্কার বলছেন ''আমার ধর্ম নিয়ে আমি লিখেছি।'' বেদকে আমি একটা বই হিসেবে দেখছি। ''ধর্ম ও অনুভূতি''ও একটা বই, কিন্তু দুটোর মধ্যে তফাৎ হয়ে গেছে। একটা আমি লিখেছি, এটা আমার কথা, যেটা সঠিক সেটা আমি লিখেছি। আর যেটা আমি বলিনি, যেটা আমি করিনি; যেটা বলতে গিয়েছে এক, আর লিখেছে আরেক, ওটা আমার নয়। তাই ওটা তোদের ধর্ম শাস্ত্র হয়েছে। আর ধর্ম ও অনুভূতি বইটা ওনার হয়ে গিয়েছে। পরিষ্কার বলছেন আমার ''ধর্ম ও অনুভূতি''তে আমি লিখেছি। নিজের অনুভূতির কথা উনি লিখেছেন। এবং সেটা সঠিক। সেখানে রেফারেন্স টানছেন যে

দেখ ওনাদের যেটা হয়েছিল সেখানে কোথায় ত্রুটি, কোথায় ভুল আছে। এই জন্য উনি আগেও বলেছেন যে তোরা অনেক ভাগ্যবান। এবং বলেছেন এই-ই সঠিক ও বাস্তব। বুঝলে?

সঞ্চিতা ঃ হ্যাঁ বুঝলাম। ভুল ধারণা ছিল একটু। খুব পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা।

জয়কৃষ্ণ ঃ বেশ। আমি যে প্রশ্নটা করেছিলাম এবার সেইটার উত্তর দাও। প্রশ্নটা ছিল তোদের ''ধর্মশাস্ত্রে যেখান থেকে শুরু'', মানে যেখান থেকে কথা বলছে, ''আমি সেখান থেকেই লিখেছি''—এই যেখান আর সেখান বলতে কি বোঝানো হয়েছে?

অমরেশ ঃ আমি ওই স্টার্টিং পয়েন্টটা বলবো। ধর্ম ও অনুভূতির স্টার্টিং পয়েন্টটা বলবো। যমৈবৈষ বৃনুতে তেন লভ্য—ধর্মশাস্ত্র ওইটা দিয়ে শুরু করেছে। ওখান থেকেই হচ্ছে। আপনা থেকে।

সাগর ব্যানার্জি ঃ আমার মনে হলো এটা দর্শন ও অনুভূতির উপর বেস করে বলা আছে। তাই আমার মনে হচ্ছে স্টার্টিংটা হলো দর্শন ও অনুভূতি।

অর্পিতা সাহা ঃ আমার একটা মনে হচ্ছে যে একটা মানুষ কিভাবে ভগবান হবে—সেখান থেকে শুরু।

জয়কৃষ্ণ ঃ দারুন! ঠিক!! অমরেশ কাকা বলল যে সচ্চিদানন্দ গুরু। অর্পিতা যেটা বলল তার সাথে রিলেটেড, কাছাকাছি। কথাটা ঠিক যে মানুষের দেহে প্রকাশ হয় ঈশ্বর। ঈশ্বরকে প্রমাণ করা যায়। আমাদের ধর্ম শাস্ত্র মানে বেদ, যেখানে লেখা হয়েছে যে নিজেকে জানা, ঈশ্বর দর্শন এবং ঈশ্বরে পরিবর্তিত হওয়া। এবং ঈশ্বরের প্রমাণ দেওয়া। এই যে পরিবর্তনের কথা সেটা আমাদের বেদ থেকে শুরু হয়। আর উনিও ওই পরিবর্তনের কথা থেকেই শুরু করেছেন। কিন্তু বেদে ওই কথা দিয়ে শুরু হলেও ওর মুখ ঘুরে যায়, আর জীবনকৃষ্ণ-এর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণতা পায়, আর পরিবর্তনটা কি সেটা বুঝতে পারি। এটাও ঠিক যে এক এর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু স্টার্টিং টা হচ্ছে ওই সচ্চিদানন্দ গুরু থেকে আরেকটু ভালো কথা যেটা অর্পিতা বলল মানুষ কিভাবে ভগবান হয়। আচ্ছা দীপদা কি বলছিলে গো?

সৌম্যদীপ ঃ আমি যেটা বলছিলাম যে জীবনকৃষ্ণের বিশ্বব্যাপীত্বের ইফেক্ট থেকে শুরু। এইটা আমার মনে হয়েছিল যে জীবনকৃষ্ণের এখান

থেকেই স্টার্টিং যেটা উনি ধরে ধরে রেফারেন্সগুলোকে পরপর টানছেন বেদ থেকে।

জয়কৃষ্ণ ঃ ওইটা ঠিক শুরু নয়! বিশ্বব্যাপীত্বটা কি শুরুর অবস্থা বলতে পারবে? তা নয়।

সৌম্যদীপ ঃ ওইখান থেকে উনি পেছন দিকে যাচ্ছেন।

জয়কৃষ্ণ ঃ আমাদের ধর্মশাস্ত্র তো ওখান থেকে বলেনি। আমাদের ধর্ম শাস্ত্র বলতে বেদ, উপনিষদ, সাংখ্য দর্শন এগুলোতে কিছু বলেনি। এইসব গুলোতে এইটাই বলা হয়েছে যে ঈশ্বর প্রমাণযোগ্য এবং মানুষের অন্তর পরিবর্তনের ফলে ঈশ্বর অবস্থা লাভ হয় এবং নিজেকে জানা যায়। এখান থেকে বলতে বেদের কথা আর সাংখ্য দর্শনের কথাও। সেই সার্চিং টাকে দিয়েই স্টার্ট। তাই জীবনকৃষ্ণের বিশ্বব্যাপীত্ব থেকে যদি তুমি স্টার্ট বল তাহলে এই ধর্ম শাস্ত্র থেকে ব্যাপারটা মিলবে না। এখানেও সচ্চিদানন্দগুরু থেকে শুরু যেখানে ওই ব্রহ্মপুর থেকে লোক আসবে এটা ঠিকই লিখেছে। যেটা দীপদা বলছে আমরা অতদূর যেতে পারিনি সেটা কল্পনা করেছিল হিন্দুধর্ম। ওরা আর কিছু বলতে পারেনি। আর তো অনুভূতি হয়নি, তাই বলবে কি করে?

সুমিতা দে ঃ আমার প্রশ্ন আছে জন্মাদ্যস্য কথাটা নিয়ে। আচ্ছা আমরা যারা পাঠে এসেছি তারা প্রথমেই যে জীবনকৃষ্ণকে দেখেছি এমন তো নয়। কারো কারো আগে অনেক দর্শন হয়েছে। জীবনকৃষ্ণকে দেখা পর্যন্ত এই মাঝের সময়টাকে কি আত্মিক জীবন বলা যাবে?

জয়কৃষ্ণ ঃ হ্যাঁ বলা যাবে। এবং সেটা আত্মিক জীবনই। যেমন আমরা স্বপ্নগুলোকে দুটো ভাগে ভাগ করি। যদিও সেটা সম্পূর্ণ সঠিক নয় কিন্তু কিছু অংশে ঠিক। যেমন একটা ভাগ করেছি দেব স্বপ্ন বা ডিভাইন ড্রিম। আর বাকিটাকে বলি জৈবী স্বপ্ন বা এ্যানিমেল ড্রিম। আমরা যে সমস্ত এ্যানিমেল ড্রিম দেখি সেইগুলোকেও আত্মিকে ব্যাখ্যা করতে পারি। তাহলে সব অ্যানিম্যাল ড্রিমই যে ডিভাইন তা নয়, সেটা আবার বলা যাবে না। তাই না? যখন আমরা তাকে দেখি, তার রূপ বা তার সত্তা, বিভিন্ন অবস্থা দেখি, সেইগুলোকে আমরা ডিভাইন ড্রিম বলি। এখন প্রথম যে দর্শন হলো যে দর্শনে মন অন্তর্মুখী হওয়ার সম্ভাবনাপূর্ণ, তার মানে সেটা তাঁর সৃষ্ট যে আত্মিক জগৎ তার অন্তর্গত হলো। আত্মিক জগতের অন্তর্গত হল মানেই তার আত্মিক জীবন শুরু হলো। এখন সেই যে প্রথম দর্শন সেই প্রথম

দর্শন আমাদের ক্ষেত্রে অনেকের অনেক রকম ভাবে হবে। দর্শনটার কি অবস্থা। যেমন যদি প্রথম দর্শন কারো এরকম হয় যে এক জায়গায় কিছু লোক কিছু ঈশ্বরীয় কথা বলছে সেখানে শুনতে গেলাম। জায়গাটা কোন মন্দির নয় বা কিছু নয়। এরকম তার দর্শন হলো। তাহলে তার এইটুকু অন্তত পরিষ্কার যে তার মন অন্তর্মুখী হয়েছে। এবং মন্দিরেই ঈশ্বরের আলোচনা হয় এটা যে নয় এটা তার একটা উপলব্ধি আসবে। ঈশ্বর যে সবসময় মন্দিরেই আবদ্ধ, মন্দিরেই যে ঈশ্বরের কথা হবে তা নয়। এরকম যে তার প্রথম দর্শন হলো এটা থেকেও তার স্টার্টিং ধরবো। আবার আমরা আমাদের ক্ষেত্রে একটা স্টার্টিং ধরি, সেটা হচ্ছে তাঁকে দেখা থেকে। যেমন যেদিন আমরা জীবনকৃষ্ণকে দেখব সেদিন থেকে আমরা আমাদের স্টার্টিংটাকে বেশি গুরুত্ব দেব। ঠাকুর বলছেন যে আমার কাছে কেউ এলে যতক্ষণ না সে আমাকে দেখে আমি ছটফট করি। বাকি সব দর্শন হচ্ছে কিন্তু ঠাকুরের ইচ্ছা যে আমাকে দেখুক। তার একটা ছবি ফুটুক। তখন থেকে এই জিনিসটার প্রতি গুরুত্ব দেবো। তার মানে এটা নয় যে যার ঠাকুরকে দর্শন হলো না তার মধ্যে আত্মিক জগতের কোন অংশ নেই। দুই নম্বর হলো যার ঠাকুরকে দর্শন হলো না কিন্তু অন্য কোন দর্শন হলো, তার মানে তার ওখান থেকে জন্ম সময় ধরবো না- এটাও নয়। অনেকেই পাঠ বহুদিন শোনার পরেও দর্শন করেছে। এতে করে তার এই চর্চার প্রতি ভালোবাসা মন অন্তর্মুখী হওয়া ইত্যাদি হয়েছে বলেই তো সে শুনছে! বাহ্যিক দিক থেকে এই কথাগুলো হচ্ছে নীরস কথা। কোন জৌলুস নেই কথাগুলোর ভিতরে। অথচ এই কথাগুলো তো সে শুনছে! তার মানে নিশ্চয়ই কিছুটা মন অন্তর্মুখী। কিন্তু সে ঠাকুরকে দেখেনি, এমনও আছে। আবার কারো আছে ঠাকুরকে দেখে তার মন অন্তর্মুখী হয়েছে। তাই দুটোকেই আমরা ধরবো। ঠাকুরকে যদি আমরা দর্শন করি সেটার গুরুত্ব একটু বেশি হয়ে যায়—এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এটার মানে কখনোই নয় যে একজন পাঁচ বছর পর দেখল বা পাঁচ মাস পর দেখলো আর একজন দেখেই অন্তর্মুখী হয়েছে তাদের মধ্যে কারুর দিকে পাল্লা বেশি ভারী নয়। কারোর মনে হতে পারে যে প্রথম দর্শন মানে ঠাকুরকেই দেখা। তা কিন্তু নয়, কখনোই নয়। সেটার প্রতি আমরা গুরুত্ব বেশি দিই। এটা স্বাভাবিক।

যদি এরকম একটা কারো দর্শন হয় যে একটা পুকুরে টলমল করছে জল। আর অন্য একজন রামকৃষ্ণকে দেখলো। এই দুটো কিন্তু একই। কিন্তু

রামকৃষ্ণকে দেখাটা আমরা বেশি গুরুত্ব দিই। আমরা দিই কিন্তু! যার পরবর্তীকালে অনেক দর্শন হবে, মন অন্তর্মুখী হবে তখন অন্য দর্শনেও সে আনন্দ পাবে তখন ভাবনা চিন্তাটা একটু আলাদা হবে। দীপদা বলছিল যে এখানে এমন অনেকেই আছে যারা দর্শন হবার পরেও এই চর্চা থেকে সরে গেছে। ওই যে evolution-র যে স্টার্টিং—তার evolution এর যে ধারা, সেই ধারা কিন্তু হচ্ছে। কিন্তু এতটাই স্লো, দাঁতে দাঁত চেপে বসে আছে, তাই মুশকিল হচ্ছে। জীবত্বের প্রভাব এতই! সেটা কাটানো সম্ভব হচ্ছে না। বা নিজের দিক থেকেও সে এটাতে মনন করতে আগ্রহী হচ্ছে না। তখন সে ক্ষেত্রে ঠাকুরকে বা রামকৃষ্ণকে বা যাকেই দর্শন করুক তারপর কিন্তু তার একটু বিচ্ছেদ ঘটবে। আবার এমনিও আছে যে ঠাকুরকে বা রামকৃষ্ণকে দর্শন হলো না, এমনি একটা দর্শন হলো তাতে প্রগাঢ় একটা আত্মিক টান অনুভব হয়। মানে তার যে evolution সেই evolution এর গতির ধারা একটু দ্রুত। তাকে দেখে অজ্ঞাতসারে তার যে কামনা বাসনা সেগুলো চলে যাবে, সে নিজে টেরও পাবে না। প্রথমেই কামনা-বাসনা গুলো যাবে না—তাকে দেখে যাবে। এবার কখন যে যাবে সে বুঝতে পারবে না। সে ভেতরে ভেতরে অসম্ভব একটা টান অনুভব করবে। সেটা সামান্য কোন একটা দর্শনেও হতে পারে। তার মন তার চিন্তা তার ভালোবাসা—এই সবগুলো জেগে যাবে। সেটা হয়। সেজন্য প্রথম যে দর্শন যেটাই তাকে ঈশ্বরমুখী করে তুলল সেখান থেকে আমাদের জন্ম ধরবো। না হলে সমস্যা দাঁড়াবে আমাদের ক্ষেত্রে। একজন প্রথমে ঈশ্বর দর্শন করলেন মানে ঠাকুরকে দেখলেন, আরেকজন দেখলেন না—হয়তো এক বছর পর ঠাকুরকে সে দর্শন করলো। এই দুটোর মধ্যে কিন্তু কোন তফাৎ নেই। কারণ কি আমরা যখন তাকে দেখছি আমরা পূর্ণকেই দেখছি। তিনি পূর্ণ হিসেবে দেখা দিচ্ছেন। কিন্তু আমরা তাকে আংশিক রূপেই বুঝছি। আমি যদি এখন ঠাকুরকে দর্শন করি এবং কেউ যদি এক বছর পর ঠাকুরকে দর্শন করে তাহলে তখন সেই সময়ে এক বছর পর আমাদের দুজনেরই কিন্তু একই অবস্থা হবে। মানে আজকে এই অবস্থায় আমি ঠাকুরকে দর্শন করলাম। আর কেউ একজন ধরো কোন আকাশ দর্শন করলো বা কোন পাখি দর্শন করলো, দুজনের একই সময়ে দর্শন স্টার্ট হল। যিনি পাখি দর্শন করেছিলেন তিনি এক বছর পর বা এক বছরের মাথায় ঠাকুরকে দর্শন

করলেন। আর আমি যে প্রথমেই ঠাকুরকে দর্শন করেছিলাম এক বছরের মাথায় গিয়ে আমার যে চেতনার গতি আমরা যদি একই সাথে এই চর্চায় থাকি তাহলে দুজনেই কিন্তু একই উপলব্ধি করব। তখন সে এক বছরের মাথায় ঠাকুরকে যেভাবে চিনবে, আমি প্রথম এক বছরের মাথায় গিয়ে প্রথম যে ঠাকুরকে দেখেছিলাম সেটা বুঝবো। এক বছর আগে ঠাকুরকে দেখে নিলাম কিন্তু এক বছরের মাথায় গিয়ে বুঝব যে কি দেখলাম। তাহলে আলটিমেটলি দুজনেই সমান অনুভূতি একবছর পরে লাভ করবে যে আমি কি দেখলাম।

আমার বক্তব্য এই যে একজন ঠাকুরকে দেখলো আর একজন অন্য কিছু দেখল তার মানে তার কিছু হল না তা নয়। এখান থেকেই তার আত্মিক জন্ম ধরবো। যে দর্শনটা তাকে ঈশ্বরমুখী করেছে সেখান থেকেই তার শুরু ধরবো, ঠাকুরকে নিয়ে দর্শন হোক বা অন্যকিছু দর্শন হোক। তা না হলে evolution কথাটার অর্থ দাঁড়াবে না। জন্ম থেকেই তাঁর খোঁজা শুরু এই কথাটা তা না হলে দাঁড়াবে না। এক বছরের মাথায় দুজনেরই সমান উপলব্ধি আসবে।

জয়কৃষ্ণ ঃ আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি আগে বলা হয়নি। এখন বলি। তোমরা সবাই ব্যাখ্যা দেবে, এখন না দিলেও চলবে। স্বপ্নটা বাজে লেগেছে আমার খুবই। অনেকদিন আগে দেখেছি। আমি যেন আয়নায় আমার নিজের মুখ দেখছি। দেখে আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম। মনে হচ্ছে আমাকে কেউ কোনদিন আজ পর্যন্ত কিছু বলেনি যে আমার মুখে এই রকম জিনিস! খুবই খারাপ লাগছে, অবাক লাগছে। আমি দেখছি আমার দাড়ি আর গোঁফ। গোঁফটার দিকে আমার নজর পড়ল বেশি। আমার গোঁফের চুলগুলো ঝাঁটার কাঠির মত মোটা ও শক্ত। মনে হচ্ছে যেন কেউ বড় বড় ঝাঁটার কাঠি আমার গোঁফের জায়গায় গুঁজে দিয়েছে। আমি ভাবলাম এত শক্ত! এত বড়! দেখে আমার বীভৎস লাগছে---মনে হচ্ছে কেউ আমাকে কিছু বলেনি! আশ্চর্য তো!

সৌম্যদীপ ঃ সজারুর কাঁটার মতো?

জয়কৃষ্ণ ঃ হ্যাঁ, তা বলতে পারো

অমরেশ ঃ ঋষিদের ওই রকমই দাড়ি ছিল। পাখির পালকের মতো মোটা ও শক্ত।

জয়কৃষ্ণ ঃ আমি এরকম দেখিনি। একদম সেই নারকেল ঝাঁটার কাঠিগুলো যেমন হয় না? নারকেল ঝাঁটার কাঠি গুলো ডগার দিকটা যেমন হয়। একটু প্রথমে সরু তারপর উপরের দিকটা মোটা হয়েছে। দেখে আমার খুব বিরক্তি লাগছে। প্রায় দুই মাস আগে দেখেছি।

বরুণ ব্যানার্জি ঃ আচ্ছা দাড়ির চুলগুলোও?

জয়কৃষ্ণ ঃ ঐদিকে আমার অতোটা নজর যায়নি। আমি শুধু গোঁফ দেখছি।

অমরেশ ঃ বেশ, মানে বুঝে গিয়েছি পরে বলব।

জয়কৃষ্ণ ঃ আমি ওই ব্যাখ্যাটা কিন্তু শুনবো পরে হলেও!

জনৈক ভদ্রমহিলা ঃ পাঠ শুনতে শুনতে দেখলাম, একটা খুব সুন্দর মহিলা কলাপাতা জামা পড়ে আমার কাছে বসে পাঠ শুনছে।

স্নেহময় গাঙ্গুলী ঃ এই নিয়ে বিকেলের পাঠে একটা স্বপ্ন আছে। সে দেখছে যে কলা বউ বসে আছে। তার ঘোমটাটা সরিয়ে দেখছে সেখানে গণেশের মুখ। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ সেই ঈশ্বরের সত্তা লাভ করবে। জীবনকৃষ্ণকে দেখে জীবনকৃষ্ণের সত্তা লাভ এতদিন হয়নি। এইবার সাধারণ মানুষও তার সত্তা লাভ করবে। এই যে আমিকে জানা সেইটা সাধারন মানুষের ক্ষেত্রেও এইবার সত্য হয়ে উঠবে, হয়ে উঠছে।... ঠিক আছে আমরা এখনকার অধিবেশন এখানেই শেষ করছি। জয় জীবনকৃষ্ণ!

পাঠপরিক্রমা---২

২২ শে মে, ২০২২---শনিবার (৭ ই জৈষ্ঠ, ১৪২৯)

পাঠের অংশ বিশেষ

প্রসঙ্গঃ 'চিৎস্বরূপভাব ও ধাতুর সাধন'। (ঋতম বদিষ্যামি ১৮ ই জুলাই, ১৯৬১; পৃ: ১৪২)

জয়কৃষ্ণ চ্যাটার্জী ঃ সাধন মানে কি?

রামরঞ্জন চ্যাটার্জী ঃ সাধন মানে ট্রান্সফর্মেশন ধরতে হবে। একটা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন উনি।

জয়কৃষ্ণ ঃ মানে যোগ। বেশ ঠিক আছে। অর্থাৎ একটা পরিবর্তন বা যোগ সেটাকে আমরা সাধন বলি। সাধন করতে হয় আবার অনেক সময় সাধন হয়। সাধন হয়ে একটা জিনিস আসবে, আর সাধন হতে গেলে একটা জিনিস চাই। এই দুটো জিনিস। এদের মধ্যে একটু তফাৎ আছে। যেমন কোনো কিছু জানতে গেলে সেই বিষয় নিয়ে আগে আমাকে কিছু শিখতে হবে। এটা একটা সাধন। এখন এখানে যে কথাটা উঠেছে সেটা হচ্ছে চিৎ স্বরূপ। এই চিৎ স্বরূপ থেকেই সাধন কথাটা এসেছে। এখন সাধন বা পরিবর্তন কিছু হওয়ার পরে আমাদের সাধন করতে হবে, সেই সাধনকে বুঝানো হয় একটা শব্দ দিয়ে সেটা হল উপলব্ধি। যেন কিছু জিনিস আমরা বুঝব বা সেটাকে নিয়ে আমরা মনন করব। এটাই হলো সাধন—যেটা আমরা বুঝি। যেমন হচ্ছে বেদান্তের সাধন, অবতার তত্ত্বের সাধন ও আরো অনেক রকমের সাধন, **এগুলো সবই হচ্ছে একটা করে উপায়-way, একটা কোন কিছু জিনিসকে বুঝতে বা উপলব্ধি করতে।** সেই বোঝা বা উপলব্ধির এই ঘটনাটা—ঈশ্বরের কথাগুলোকে যে বুঝব, সেইটা বুঝতে গেলে আগে ঈশ্বরের দর্শন চাই। আগে যোগ বা পরিবর্তন হয়ে যেতে হবে তবে এই ঈশ্বরের দর্শন হবে। জীবনকৃষ্ণ এখানে একটা কথা বললেন চিৎ স্বরূপ ভাব। অর্থাৎ তার ভিতর আমার রূপ ফুটে উঠুক। সে আমাতে পরিবর্তিত হোক। কারণ আমি বুঝতে পেরেছি আগে একটা জিনিস হয়ে যায়, পরে তার ফল দেখতে পাওয়া যায়। এইবার যদি প্রশ্ন ওঠে যে বিভিন্ন

ধরনের যে স্বপ্নদর্শন সেইগুলো যে আগের সাধনের ফল (আমাদের দ্বিতীয় স্তরে,) সেই কথা কিন্তু বলা হয় নাই। আমরা যখন তাকে দেখছি, আমাদের যে প্রাণশক্তি সেই প্রাণশক্তিটাকে কিন্তু পরিবর্তিত হতে হয়েছে। পরিবর্তন যদি না হয় তাহলে তার রূপটা ফুটে উঠবে কি করে? আমি ওনাতে পরিবর্তিত হবো কি করে? **এই যে পরিবর্তন হল এইটা একটা সাধন।** এই সাধনটাকে বলছে আগে হল, পরিবর্তিত হলো, তারপর আমি রূপটা দেখতে পেলাম। ফলটা পরে। ঠাকুরের রূপটা ফুটে উঠল। তাতে পরিবর্তিত হলাম, তাহলে আগে সাধন ঘটে। **এরপরে যে সাধন হয়, তা হল সেইটাকে উপলব্ধি করা। রিয়েলাইজেশন।** তার আগে ইভোলিউশন। এই রিয়েলাইজেশন করা, উপলব্ধি করা—এটাই আমাদের সাধন। তাকে দেখার পর যে বুঝবো যে কি দর্শন করলাম—এটাই আমাদের সাধন। এখানে শুধুমাত্র তাকে দেখার প্রশ্নটা হচ্ছে, অন্য কোন প্রশ্ন আসে না। অন্য একটি প্রসঙ্গ ধরো; আমাদের কারো সাপ দর্শন হলো। সাপকে আমরা কুণ্ডলিনী শক্তির প্রতীক হিসেবে ব্যাখ্যা করি, কখনো পরিবেশের বিরুদ্ধ অবস্থা বোঝাতে সাপকে বোঝানো হয় অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে আমরা বিভিন্ন রকম করে ব্যাখ্যা করি। এইবার সাপ মানে যদি আমি কুণ্ডলিনী শক্তি হিসেবে দেখি, তাহলে আগে আমার কুণ্ডলিনী শক্তি জেগেছে তারপরে আমি সাপ দর্শন করলাম—এই কথাটাও খাটে। আবার ওই কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণের ফলে আমার ধীরে ধীরে বোধের উত্তরণ হবে এই কথাটাও খাটে। এবং সেটা হবে আমাদের সাধন। যখন কুণ্ডলিনী দর্শন হবে তখন আমার বডির একটা ট্রান্সফর্মেশন ঘটবে। দেহের পরিবর্তন ঘটবে। কারণ সেইটাকে দেখার মত অবস্থায় আসতে হবে, দুম করে দেখে নিতে পারবো না। এবার বলবে কেউ একজন দুম করে দর্শন করেছে। কিন্তু দুম করেই তো আর হয়ে যায়নি। যেমন দুম করে চকমকি পাথর জ্বলে গিয়েছিল, এটা ঠিক। কিন্তু সেখানে একটা কন্ডিশন ছিল। দুটো ঐরকমই পাথর হতে হবে তবে আগুন জ্বলবে। যে জ্বালাচ্ছিল সেটা দুম করে হয়ে গিয়েছিল, সে বোঝে নাই—এইটা হতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে কন্ডিশনটা ম্যাচ করে গেছে। দুটো পাথরই চকমকি পাথর হয়ে গেছে, ফলে আগুনটা ফ্লাস করেছে। ঠিক সেই রকম করে কারো যদি দুম করে সব দর্শন হয় তাহলে বোঝা যাবে যে তার বডি ওই কন্ডিশনে এসেছে। **তাহলে সাধন আগেই হয়, ফল পরে হয়।**

এখন সব বিষয়ে কি হয়? সেইটা আবার বিভিন্ন অবস্থার উপর ডিপেন্ড করে দাঁড়িয়ে আছে। ধরো কেউ একজন ফুল দেখল। এটাকে কি মানে করা যাবে? দেখলো মানে দর্শন করলো। স্বপ্নই যদি বলি তাহলে ওই যে স্বপ্নের আবার আমরা ভাগ করেছি। এটা দেব স্বপ্ন, ডিভাইন ড্রিম। আবার কেউ একজন স্বপ্ন দেখলো যে সে নদী পেরোচ্ছে। এখন সেইটার আবার অর্থ যদি হয়ে যায় ভবনদী তাহলে ওখানেও আবার একটা ট্রান্সফর্মেশন এর ঘটনা রয়েছে। এখন সিম্পল যদি কোন একটা স্বপ্ন দেখি যার সাথে আধ্যাত্মিকতার কোন যোগ নাই, তখন তার সাধনের কোন প্রয়োজন নাই। এখানে সাধন আগে মানে তার রূপটাতে আমার পরিবর্তিত হওয়া—ওইটার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এখন সাধন যদি নাই হয়, পরিবর্তন বা যোগ যদি না হয়, তার রূপ আসবেনা, 'চিৎস্বরূপ' আসবে না।

সৌম্যদীপ ঃ রামকৃষ্ণের চোখ থেকে চশমা পড়ে যাওয়ার এক্সাম্পেলটা যদি ধরা যায়। পরে এই দর্শন প্রসঙ্গে উনি বলছেন যে এতদিন আমি ঠাকুরের চোখে জগত দেখছিলাম এইবার আমি নিজের চোখে জগত দেখছি।

জয়কৃষ্ণ ঃ হ্যাঁ স্বপ্নটা আগে হয়ে গেছে তার মানেটা উনি অনেক পরে বলছেন।

বরুণ ঃ উনি বলছেন যে এখন আমি প্রকৃত অর্থটা করতে পারলাম। আগে একরকম অর্থ আমি করেছিলাম কিন্তু এখন দেখছি এই অর্থটাই হবে।

রামরঞ্জন ঃ আগে গঠন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে তারপর দর্শন হচ্ছে। তাহলে এখানে ব্যাপারটা কেমন হবে? তিনি বললেন, সাধন আগে হয়ে গেছে তার ফলে তুই দেখলি। তারমানে সাধনটা আগে হয়ে গেছে। তাহলে তারপরে যেটা হবে সেটা কি? দেহেতে বর্তানো—এটাকেই তো ফল বলা যায়।

জয়কৃষ্ণ ঃ আচ্ছা, তার মানে তুই বলতে চাইছিস কেউ যদি ঠাকুরকে দর্শন করে তাহলে তার বডিটা গঠন হয়ে গেল তো?

রামরঞ্জন ঃ হ্যাঁ হয়ে গেছে বলেই দর্শনটা হয়েছে। জীবনকৃষ্ণের কথা অনুযায়ী।

জয়কৃষ্ণ ঃ তার মানে আমি ঠাকুরকে দেখলাম, আর আমার বডি ট্রান্সফর্মড হয়ে গেল। ...ওইটাকেই সাধন বলা হচ্ছে যে একটা ট্রান্সফর্মেশন, একটা যোগ। একটা পরিবর্তন চাই। বডির একটা সেইরকম কন্ডিশন হতে

হবে। কিছু কিছু কন্ডিশন মিলবে যার মাধ্যমে আমি তার রূপটাকে দেখব। বেশ, রূপ দেখা হয়ে গেল তার মানে একটা সাধন হয়ে গেল। সাধনের ফলটা কি হলো? না, তার রূপটাকে দেখলাম! এইবারে আবার সাধন শুরু হলো। এইবার বেশকিছু ভারি ভারি শব্দ লেখা হয়েছে— বেদের সাধন, বেদান্তের সাধন। বেদকে বোঝার যে পন্থা, যেভাবে আমরা বেদকে বুঝবো সেটা হল বেদের সাধন। বেদ পরবর্তী উপনিষদ ইত্যাদি এদের যে নির্যাস এগুলো কি—এগুলো বোঝার যে পন্থা যার দ্বারা সেইগুলোকে বুঝছি সেটা হল বেদান্তের সাধন। আবার, যেমন অবতার তত্ত্বের সাধন। **এককথায় সাধন মানে হচ্ছে বোঝার পদ্ধতি। মানে আমরা কিভাবে বুঝব।** এবার যখন বলা হচ্ছে ওনার বেদান্ত মতে সাধন চলছে, মানে বেদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার চলছে। যেমন ওই যে বলা আছে যে যোগী একবার শুনেই বলে দেবে যে বুদ্ধ বলে কেউ ছিলনা। যোগী একবার শুনেই বলে দিতে পারে যে বেদের কোন কোন জায়গা গুলো ভুল। কেননা বেদ মতের সাধন তার হয়েছে। অর্থাৎ বেদকে জানার যে উপায় ছিল, বেদ যে জ্ঞান দিতে চেয়েছিল সেই জ্ঞান তার উপলব্ধি হয়েছে। সেই জ্ঞানের দ্বারা সে বুঝছে যে ওখানে কি কথা বলা হয়েছে। সেই কথার সাথে একজ্ঞানের কথার কী কোন সামঞ্জস্য আছে? না, নেই। কিন্তু প্রথম যে তাকে আমি দেখবো তার জন্য আমার একটা ট্রান্সফর্মেশন চাই। এখন আমাদের সেই ট্রান্সফর্মেশনটা হল। তবে এই ট্রান্সফর্মেশনটা পার্মানেন্ট নয়। যেমন টর্চ জ্বালানোর কথাই ধরা যাক। একটা টর্চ জ্বালাতে গেলে তিনটে কন্ডিশনের দরকার। একটা হচ্ছে ব্যাটারীর পজেটিভ নেগেটিভ সাইড ক্লিন থাকতে হবে উইথ চার্জড। দু'নম্বর হচ্ছে ওই পজেটিভ নেগেটিভ সাইড দুটোকে মেলবন্ধনের জন্য একটা সুইচ চাই। আবার ফিলামেন্ট টা ডিটাচ হলে চলবে না। কন্টিনিউয়াস হতে হবে। এই তিনটি এক সারিতে সংযুক্ত থাকতে হবে। কোথাও বিচ্যুত হলে হবে না। তখনই লাইট জ্বলে যাবে। আবার পরবর্তীকালে আলাদা হয়ে যাবে। ঠিক সেইরকম তাকে দেখা মাত্রই ওইটুকু আমাদের সাধন হল পরে কিন্তু আবার আলাদা হয়ে যাবে। মানে সেটা ফল হয়ে গেল। এইবার ওই যে আমাদের কি দর্শন হলো সেইটা ভাবনা শুরু হলো অর্থাৎ আমাদের সাধন চলতে লাগলো। এইভাবে ভাবতে ভাবতে আমরা বুঝব যে আমাদের কি দর্শন হলো। স্বপ্নে পেঁপে খেয়ে ছিলেন জীবনকৃষ্ণ। অর্থাৎ তার আপনার খাওয়া হয়ে গেছে। এবার ওনার যে উপলব্ধি সেইটা

কিন্তু ধীরে ধীরে হচ্ছে। নিজে বুঝছেন আর বোঝাচ্ছেন। এই দু'রকম ব্যাপার ঘটে। **একটা হচ্ছে নিজে বোঝা, আরেকটা হচ্ছে বোঝানো।** বুঝতে গেলে বেশি জিনিস চাই না। কিন্তু বোঝাতে গেলে একটু বেশি জিনিস চাই। কোন বিষয়কে আমি যদি বোঝাতে চাই এবং সেই বিষয়টা সম্পর্কে যদি আমার আপাদমস্তক জ্ঞান থাকে, তবুও বোঝানোর জন্য ওই জ্ঞানের চর্চা আবার দরকার। কারণ কিভাবে আমাকে বোঝাতে হবে তার আবার পদ্ধতিটা আমাকে শিখতে হবে। না হলে আমি শেখাতে পারবো না বা বোঝাতে পারবো না। **তাহলে জ্ঞান থাকলেই হয় না, তার প্রয়োগের পদ্ধতিটা আমাকে জানতে হবে।** আমি তো জেনে গেছি, জানি সবই। আমি পেঁপেও খেয়েছি। চশমা চোখ থেকে খুলে যেদিনই পড়ে গেছে সেদিনই আমি জেনে গেছি। বুঝে গেছি। কিন্তু তখনই যদি তিনি বলে দেন, যে তিনি আর ঠাকুর রামকৃষ্ণের চোখে দেখেন না, এই যে কথা বলছেন এগুলো সবই তাঁর নিজের, মানুষ নিতেই পারবেনা, বুঝতেই পারবে না।

বইটার পরের পাতায় একটা কথা আছে যে রিলিজিয়ান কখনো প্রাক্টিক্যাল ডাটার উপর চলে না। কিন্তু মানুষ আমরা প্র্যাকটিক্যাল ডেটা চাই। হুট করে যদি উপলব্ধিটা বলে দিই তাহলে তো সে বুঝবে না।

স্নেহময় ঃ তার জন্য অত বছর ওয়েট করছেন উনি?

জয়কৃষ্ণ ঃ হ্যাঁ, ওয়েট করছেন। আমি দুর্গা প্রতিমা তৈরি করব, সেক্ষেত্রে এট লিস্ট (at least) পাঁচ মাস আমি ওয়েট করব। মাটি তৈরি করা, কাঠামো তৈরি করা, কিভাবে আমি স্ট্রাকচারটা তৈরি করব তার বহু পদ্ধতি আছে। তার অনেক পর কিন্তু দুর্গা প্রতিমা তৈরি হলো। তাহলে আমি আমার জগৎ তৈরি করছি। সেখানে আমি সময় নেবো। যেখানে আমি আমার বোরেগুলোকে সাজাবো (দাবাতে)। কারণ খেলব তো আমিই। তাহলে কোথায় আমি রাখবো সেটা কি সেসব আমি ভেবে চলবো। কারন আমি আমার খেলাতে আনন্দ পাব। এখন আমি আমার খেলা তৈরি করলাম আর বাকিরা বুঝলো না। তখন কি বলবে? লোকে নিল না। অর্থাৎ তাকে তৈরি করতে পারল না। নিজেতে পরিবর্তিত করতে পারল না। তাই রামকৃষ্ণ ও তার পূর্ববর্তী আচার্যদের কথায় আমরা দেখতে পাই যে ''লোকে নেয় নি''। লোকে কি খুব ভালো করে বুঝে গিয়েছিল যে এই কথাগুলো ভুল বলছে? শঙ্করাচার্য এল; লোকে ওনার কথা নিলো না। দূর থেকে প্রণাম করল। বুদ্ধদেব এল, দূর থেকে প্রণাম করল। মহাপ্রভু এল, দূর থেকে প্রণাম করল। লোকগুলো

এতই চালাক, এত বোঝে? আমরা বুঝে গেলাম যে শঙ্করাচার্যের কথার কোন সারমর্ম নাই!

লোকেরা বোঝেনি, আবার লোকেরা বুঝেও ছিল। দুটোই। মানে কি? শংকরাচার্য আমাকে তাতে পরিবর্তিত করতে পারেনি।

তাহলে আমি যদি আমাতে পরিবর্তিত করতে চাই যখন আমি আমার জগৎ তৈরি করছি তাতে আমি তো সময় নেবোই। এই যে রিয়েলাইজেশন হয় এটা তো সময় নেবেই। উনি ঝট করে করতে পারেন কিন্তু ক্ষতি আমাদেরই হবে। আর আমাদের ক্ষতি মানে ওনারই ক্ষতি হবে। তাহলে আর জগৎ সাজানোর মানে কি আছে, রিফ্লেকশন করার মানে কি আছে? কিছুই মানে নেই, এইগুলো অর্থহীন হয়ে যাবে। আমি আজ বুঝে গেছি জিনিসটা কি। কিন্তু সেই জিনিস নিয়ে আমি যখন নতুন কিছু করতে যাব তখন ওই বোঝার আবার একটা ট্রানসফর্মেশন চলতে থাকবে ভেতরে।

এখানে যতজন বসে আছি (Google meet-এ) এখনো পর্যন্ত ১১৫ এর উপর, এতজন যে বসে আছি, অধিকাংশই ওহম ব্যাপারটা জানে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ওহম কে নিয়ে কাজ করতে পারবে না। তার মধ্যে আমিও একজন, ওহম নিয়ে কিছু করতে পারবো না। কিন্তু ওহম কি জিনিস জানা হয়ে গেছে। ওহম কি বলেছিল, ওহম এর কার্যকারিতা কি, এগুলো সব জানা হয়ে গেছে। কিন্তু সেই গুলোর রূপরেখা তৈরি করা, সেখান থেকে আমি নতুন কিছু একটা তৈরি করব সেটা পারব না। তাহলে সেইটার একটা রিয়েলাইজেশন দরকার। এইটা আমাদের দিক থেকে বলছি। কারণ আমি ঠাকুরকে দর্শন করে নিলাম আর ফট করে আমি সব বুঝে নিলাম তাও কিন্তু নয়। **ধীরে-ধীরে, আমি সব বুঝবো। যত আমি ওইটা নিয়ে মনন করব, চর্চা করব, তত আমি ধীরে ধীরে বুঝবো।**

এই প্রসঙ্গে আরেকটা আলোচনা ছিল—ওই যে ইউরোপিয়ান বডি। জাস্টিস উডরফ বুঝতে পেরেছিলেন—উনি ক্যালকাটা হাই কোর্টের জজ ছিলেন। উনি এই তন্ত্রসাধনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এবং উনি জজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে ওইসব নিয়েই মেতে উঠেছিলেন। আগে আরেকটা প্রসঙ্গ আলোচনা হয়েছিল যে ভারতবাসীর দেহের বৈশিষ্ট্য। সেখানে বলা হয়েছিল যে ইউরোপের কারোর হয়নি। তখন একজন প্রশ্ন করেছিলেন যে জীবনকৃষ্ণ যখন লন্ডনে গিয়েছিলেন তখন কি ওনাকে কেউ দেখেনি? উনি বলেছিলেন যে, না, সেরকম তো কিছু হয়নি। এইটা থেকে কনক্লুশান

এ আসা যায় না যে ইউরোপের লোকেরা কেউ দর্শন করবে না বা ওদের দর্শন হয় না। তাহলে পল এ্যাডমস্ তো দেখেছেন। একটা লেখা ভুল হয়ে গেছে বা হয়ত হিউ এন সাং এর মত পল এ্যাডামস্ বেশি প্রচারিত হয়ে গেছে। তাহলে কেনো বলছে যে লন্ডনে কেউ দেখে নাই? জীবনকৃষ্ণ বলছেন—''সেইরকম তো কিছু হয়নি। আর দেখ আমাকে যে লোক এমনি করে দেখে তাই কি আমি জানতাম?'' তাহলে এইসব নিয়ে উনি মাথা ঘামাতেন না। কিন্তু আমরা যদি আরেকটু মাথা ঘামাই, যদি একটু ভাবি তাহলে আমাদের কাছে আরেকটা ইনফর্মেশন আসবে। এক ল্যান্ড লেডির বাড়িতে উনি থাকতেন লন্ডনে। তাহলে ওখানে কি উনি মহিলা দর্শন করেন নি? দর্শন করেছেন তো! কিন্তু যারা তাকে দেখবে তাদের ভিতরে তাদের কিন্তু মনের পরিবর্তন ঘটে যাবে। জীবনকৃষ্ণের ল্যান্ড লেডি কিন্তু বুঝেও গেছিলেন যে উনি একটু অন্য ধরনের মানুষ। তাই তাকে আর বলার প্রয়োজন হয়নি। সেতো উনিও জানেন ওনার ভেতরে কি চলছে। যদি নাই জানতেন তাহলে ভগবানকে যে অন্তর্যামী বলা হয় সেটা অর্থহীন হয়ে যায়। তাহলে লন্ডনে তাকে কেউ দর্শন করেনি এই কথাটাকে যদি আমি গ্রান্টেড ধরে নিই তাহলে কথাটা একটু ভুল হয়ে যাবে। আমাদের কাছে ল্যাক অফ ইনফর্মেশন। তবে যেহেতু পল অ্যাডামের কথাটা আমরা পাই তাহলে জীবনকৃষ্ণকে নিশ্চয়ই দর্শন হয়, দর্শন হতেই হবে। কিন্তু যে সময় উনি লন্ডন গেছিলেন সেই সময় এই যে প্রচুর মানুষ ওনাকে দেখবে আর ছুটে ছুটে এসে ওনাকে বলবে সে রকম পরিস্থিতি তো হয়নি। ভারতবর্ষেও সেইরকম পরিস্থিতি হয়নি।

দীপদা আগে যে কোশ্চেনটা করল যে তাহলে স্বামীজীর কি অবস্থা? তাহলে এটা পরিষ্কার যে ইউরোপ আর আমাদের ভারতবর্ষের যে একটা তফাৎ করা হয়েছিল যে ওদের ওখানে সেরকম কিছু হয়নি মানে বস্তুতত্ত্বের সাধনের কোন ঘটনা ওখানে পাওয়া যায়নি। এখানে ভারতবর্ষে রামকৃষ্ণের হয়েছিল, মহাপ্রভুর হয়েছে। অনেক মহাপুরুষ আমাদের এখানে পাওয়া গেছে। ইউরোপে বহু বছর ধরেই বস্তুবাদ বা ম্যাটেরিয়ালিজম এর চিন্তাভাবনা রয়েছে। তার মানে এইটা নয় যে আমরা যে সাধারণ প্রক্রিয়ায় সমষ্টির সাধনের কথা বলছি সেইটা ওদের হবে না তা কিন্তু নয়। তাহলে জাস্টিস উডরফের দর্শন হয়নি কিন্তু উনি শাস্ত্র থেকে নিয়েছেন। আমরাও তো অনেকেই শাস্ত্র থেকে পড়ি। এখানে অনুভূতি বলতে ওই যে দর্শন, যোগ

হওয়া বলি, বুঝি, সেইরকম ওনার কিছু অনুভূতি হয়েছিল, উনি কিছু দেখেছিলেন। এছাড়াও অনুভূতি হয় রিয়েলাইজেশন হয়। এখান থেকে সঠিক কথাটা কি বলছে সেটা নিয়ে অতিরিক্ত মনন। আবার যাকে আমরা ইন্টেলেকচুয়াল বলি সেই ঘটনাটাও ঘটেছে।

স্বামীজী ধরতে পারেননি, তাহলে স্বামীজি আর ইউরোপের লোকের বডি, দুটোরই বডি কন্ডিশন একই বলা হলো। স্বামীজি এখানে রাজযোগ সম্বন্ধে লিখেছেন কিন্তু রাজযোগ সম্পর্কে লিখলেও রাজযোগ তো উনার হয়নি। তাহলে রাজযোগ যদি ঠিকঠাক না হয়ে থাকে তাহলে ওই কথাগুলো উনি শাস্ত্র থেকে উদ্ধার করতে পারবেন না। তাহলে এখানে ঘুরিয়ে যদি কেউ প্রশ্ন করে যে *দা সার্পেন্ট পাওয়ার* বইটা যিনি লিখেছিলেন সেই উডরফ সাহেবেরও কি হয়েছিল? তাহলে আবার ফিরে চলে যেতে হবে ওই মুনি-ঋষিদের কথায়। সেখানেও বহু জিনিসই এরকম পাওয়া যায় যে দর্শন হয়েছিল কিনা সেটা জানা যায় নি। বা হয়তো হয়ও নি কিন্তু মাথায় একটা ফুট কেটে যায়। ক্রমাগত তখন সেই জিনিসটাকে নিয়ে ভাবছে—ফুট কাটবেই। স্বামীজীর ক্ষেত্রে সেইটা হয়নি। স্বামীজিও ধরতে পারেননি।

তার মানে ইউরোপের লোকেদের যে হবেই না ওই কথাটা ওখানে বলা হয়নি। ওখানে বস্তুতত্ত্বের সাধনের কথা বলা হয়েছিল। আরেকটা কথা বলা হয়েছিল যে ওরা ম্যাটেরিয়ালিজম নিয়ে চলে আর আমরা ভারতবাসীরা আমাদের চিন্তা ভাবনা একটু আলাদা। আচ্ছা এটা বোঝা গেল ঠিকঠাক? অর্পিতা?

অর্পিতা ঃ হ্যাগো, বুঝেছি।

জয়কৃষ্ণ ঃ বেশ। এবার আলোচনা হয়েছিল ফাইভ এলিমেন্টস। পঞ্চভূত দিয়ে এই দেহ তৈরি—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। ক্ষিতি কি? মরুৎ কি? অপ মানে তো জল। কিন্তু জীবনকৃষ্ণ এখানে নিজের দেহকে দেখাচ্ছেন। মানে কোথায় জল দেখা যায়, দেহেরই এটা একটা অংশ বলছে। তাহলে এই পাঁচটা ভূত দিয়ে যে দেহ তৈরি হয় সেইটা বলতে এখানে একচুয়ালি কি বোঝাচ্ছে? এটা আমাদের যে আত্মিক স্ফুরণ তারই কথা বলা হচ্ছে। ধীরে ধীরে সেই জিনিসগুলো বলছেন, যে ক্ষিতি কি, অপ কি? তখন উনি ওইটাকে বলছেন যে পারফেকশন। ক্ষিতি মানে আমরা বলে দিই পৃথিবী। কিন্তু ঠাকুর এখানে ক্ষিতি বলতে কি বলেছেন? পায়ের চেটো দেখলাম মানেই ক্ষিতি দর্শন হলো। **সর্বপথগামী অর্থাৎ সমস্ত দিকে**

সর্বস্থানে তার যাওয়ার অধিকার থাকবে। সেই অর্থে ক্ষিতি বলা হয়। সর্বস্থানে মানে কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যাওয়া নয়। তাহলে আমারই দেহের উপর সম্পূর্ণরূপে যখন কন্ট্রোল আসে—দেহের মানে? আবার সেটা নির্যাসে চলে যাবে—মন। মনের যখন সম্পূর্ণতাটা আসে। এখানে আবার কেউ বলতে পারে যে, কেন? আগেই তো মনের সম্পূর্ণতাটা এসেছিল! কিন্তু সেইটার যে রিয়েলাইজেশন যে জ্ঞান হওয়াটা সেইটা ওনার পরে হচ্ছে। মানে উনি বুঝাতে পারছেন যখন। তাহলে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই যে জিনিসগুলো আমারই আত্মিক চেতনার এক একটা অংশ নিয়ে বসে আছে সেইটা সম্পর্কে সুষ্ঠুভাবে তার ধারণা আসবে। তখন উনি এইটাকে বলেছেন পারফেকশন—শুদ্ধি। আর এটার উপর কন্ট্রোল মানে উনি রিফ্লেকশন করছেন যে এই জগত নিয়ন্ত্রিত। যখন এই জগত আমার ভিতর তখন আমার জগৎ কন্ট্রোলের একটা অধিকার আসে। তখন এই অবস্থাকে বলছেন পঞ্চভূত শুদ্ধি মানে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আমার সঠিক ভাবে করায়ত্ত করা হল।

কন্ট্রোল ওভার ফাইভ এলিমেন্টস্—এই ফাইভ এলিমেন্টস্ এর মধ্যে আমরাও পড়ে যাই। তাহলে আমাদের যে একটা স্পিরিচুয়াল কন্ট্রোল হবে; সেই স্পিরিচুয়াল কন্ট্রোল এর ফলস্বরূপ আজ এই ঘটনাগুলো সব ঘটছে। আমাদের মধ্যে থেকে যে কথাগুলো বেরোয় বা কোনকিছু কথা নিয়ে যে আমরা আরো ডিটেইলিং করছি সেইগুলো ঘটছে কি করে? তাহলে আমাদেরও কিন্তু ভূমিকা আছে। আমি তো আমার দেহটাকে বুঝি নাই। আমার দেহ বোঝার আর দরকার নেই। কারণ দেহ একটাই আছে। একটাই বটবৃক্ষ আছে তার নামাল গুলো এমন হয়েছে দেখে মনে হচ্ছে যে হাজারটা গাছ আছে। তাহলে কোনটা আসল গাছ এইটা ধরতে পারা একটা প্রবলেম। গাছ কিন্তু একটাই আছে। বাকি নামাল গুলো রসদ কোথা থেকে নিচ্ছে? সবাই নিজের নিজের জায়গা থেকে রসদ নিচ্ছে। আমি আমার জায়গা থেকে রসদ নিচ্ছি। কিন্তু সেই রসদটা যাচ্ছে আসছে কোথা থেকে? সেই যে মেন গুঁড়িটা সেইখান থেকে আসছে। মানে আমি আমার মাথা থেকে রসদ নিচ্ছি। আমি কিন্তু ঠাকুরের মাথা থেকে রসদ নিতে যাইনি। আমার মাথা থেকে নিচ্ছি। কিন্তু আমার মাথাটা তো হয়ে গেছে ঠাকুরের মাথা! তাহলে আমরা সেই সরু নামাল হয়ে গিয়েছি। ওনারই দেহের পার্ট। পঞ্চ ভূতের কন্ট্রোল, উনি করলেন। যেটাকে আমরা জগত কন্ট্রোল করা বলছি

অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকটা দেহকে উনি কন্ট্রোল করছেন।

এবার অর্পিতার প্রশ্নে আসা যাক স্থিত সমাধি। আরেকবার বলতো স্থিত সমাধিটা কি?

অর্পিতা ঃ স্থিত সমাধিতে উনি বুঝে যাচ্ছেন যে জগৎ ওনারই ভেতরে রয়েছে। জগত ওনার সৃষ্টি, মায়াও ওনার সৃষ্টি। তাহলে উনি একাই আছেন।

জয়কৃষ্ণ ঃ স্থিত সমাধিতে যে লয় বলা হয়, সেইটা হচ্ছে নির্গুণ। জগত আমার সেই ধারণাগুলো তো আসবেই। **স্থিত সমাধিতে নির্গুণ কে জানা যায়। নির্গুণ এর সাথে যুক্ত হওয়া যায়।** তার আগে পর্যন্ত নয়, সেগুলোকে সগুন সমাধি বলা হচ্ছে। জড় সমাধিটা সগুন। এই স্থিত সমাধি হলে নির্গুণের শক্তি আমার কাছে আসে। এই শক্তিগুলো নিয়ে কি হয়? এ প্রসঙ্গে অভিজিৎ কাকার কথার উত্তর আসবে। যে জিনিসগুলো অন্ধকার মানে যেখানে আলো দেখতে পাচ্ছি না, সেখানে আমার ব্রেন ফ্যাকাল্টি আসবে, ব্রেণ পাওয়ারটা নয়। এইটা বোঝার ক্ষমতা আসবে, ওইখানে যে সত্যিই আলো আছে সেইটা বোঝার ক্ষমতা আসবে। নির্গুণকে এক্সপ্লোরড জোনে কনভার্ট করবে। বেদে কি বলা আছে, অন্য কোন রিলিজিয়ানে কি বলছে ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলো সব তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। নির্গুণে যখন সে আসছে তখন সে দেখছে যে আমিই তো আছি আর তো কেউ নেই। অবতারত্ব যখন এসেছিল তখন তার কাছে আমিটা তুমি হয়ে গেছে, তুমিটা আমি হয়ে গেছে। আমি-তুমি এক হয়ে গেছে- আমি হয়ে গেছে। এই আমি-তুমি, আমি-তুমি ব্যাপারটা চলতে লাগলো। যখন নির্গুণের জোয়ার তার কাছে এলো, তখন তিনি এক্সপ্লেইন করতে পারলেন। সর্বদিকে আলো তার কাছে এলো, তখন আমি-তুমি, তুমি-আমি এই ব্যাপারটা কেটে গেল। আমিতে এসে স্ট্রিক্ট হয়ে গেল। তার আগে পর্যন্ত তুমি আমি হলাম, আর আমি তুমি হলাম। স্থিত সমাধি হলেই আমি বুঝে যাব যে তুমিও আমি হইনি, আর আমিও তুমি হয়নি —**আমিই আছি।** তখন, এই জগত আমার এই জিনিসগুলো বোধ হবে। আমিই যে জগত কন্ট্রোল করব, আমিই জগৎ এই বোধ স্থিত সমাধি হলেই আসে না। কারণ আমিই তো আছি। আমি যে রিফ্লেক্ট করব, বিক্ষেপ করে দেখব তার প্রশ্নই আসে না। আমিই আছি। যেমন আমি একটা দুর্গা প্রতিমা তৈরি করছি।... যতদিন অব্দি আমি দুর্গা প্রতিমা তৈরি করছি ততদিন অবধি ভাবতে থাকবো, তখন আমার কিন্তু

কাউকে দেখানোর কোন দরকার নেই। কোন শিল্পীরই কিন্তু মনে হবে না যে কাউকে দেখাই। তারপর যখন দুর্গা মূর্তিটা কমপ্লিট হল, তখন self-satisfaction আসবে। তখন এটা লোককে দেখাবো এই বোধটা আসে। এইবার আমি দেখাবো যে দেখো আমি কি করেছি। স্থিত সমাধি হচ্ছে তাই। যে, আমি এই জগৎ। ব্যাস হয়ে গেল। তারপরে এই গল্পগুলো আসছে।

স্নেহময় ঃ প্র্যাকটিক্যাল ডাটা নিয়ে ধর্ম হয় না কেন বলছেন?

জয়কৃষ্ণ ঃ লোকে বলছে একটা কাজ করে দেবে—মানে অলৌকিক ব্যাপারগুলোকে বলছে। সেইগুলো হয়না। এখানে প্র্যাকটিকাল বলতে কোনটা বোঝায়? **এই যে ধর্মতত্ত্ব, কথাগুলোকে বোঝা হচ্ছে, ভাঙ্গা হচ্ছে, ভাবছি- এইটা একটা প্র্যাকটিক্যাল। এই যে রিয়েলাইজেশন হচ্ছে এইটা একটা প্র্যাকটিক্যাল।** এই প্র্যাকটিকাল গুলোকে আমরা ভাবিই না।

স্নেহময় ঃ ব্যবহারিক জগতে ইম্প্যাক্ট কি হবে?

জয়কৃষ্ণ ঃ হ্যাঁ ব্যবহারিক জগতে ইম্প্যাক্টগুলো আমাদের মধ্যে দিয়েই আসছে। সেটাকে আমরা ধরছি না। আমাদের কাছে বড় হয়ে গেল- ও কি বললো! সেইটা আমরা দেখতে চাইছি।

অর্পিতা ঃ আচ্ছা এখানে তুমি বললে যে স্থিত সমাধি হলে জগত কন্ট্রোল করব এই ভাবটা আসেনা। তাহলে এইটা কি অনেক পরের?

জয়কৃষ্ণ ঃ এই ভাবটা অনেক পরে এরকম নয়। পরবর্তী এক ধাপে ওই ভাবটা আসে। আমরা একটা টাইমফ্রেম ঐরকম তৈরি করি এবং সেই ভাবে বুঝতে চাই। কিন্তু ওই ভাবে টাইমফ্রেম দিয়ে বোঝা ঠিক নয়। ধরা যাক, আমার একটা দর্শন হলো। সেই সময়ে আমার একটা উপলব্ধির স্তর জেগে যায়, কিন্তু সেই স্তর ধীরে ধীরে আরো প্রকাশ পায়। মানে আমি যখন জগৎ, ওই যে চারটি ধাপ বলেছিলাম—জগতকে বাইরে দেখলাম জগৎ ছোট হয়ে গেল। সেই জগতকে ভেতর গুটিয়ে নিলাম এবং তারপরে সেই জগতকে বাইরে বিক্ষেপ করে দেখতে চাই, ওই যে ভাবধারা এইটা যে স্থিত সমাধির অনেক পরে আসে তা নয়। তখনি আসে। **স্থিত সমাধিতে আমিই আছি এই উপলব্ধি হয়। মানে আমি একমাত্র লিভিং সত্তা। আর কোন সত্তা নেই।**

সৌম্যদীপ ঃ ওই জন্য পরে জীবনকৃষ্ণ বলছেন যে অনেক জিনিস ফুটতে চাইছে, মানে ভবিষ্যতের কথা বলছেন। এমন তো নয় যে উনি করবেন

বলছেন?

জয়কৃষ্ণ ঃ হ্যাঁ ঠিক। এইগুলো উনি ঘটবে বলছেন। আচ্ছা এখন আমি একটা পুরনো কথা বলব? রেগে টেগে যেও না কিন্তু! পুরনো কথা মানে, রাম ভক্ত তো তাই রামায়ণের কথা। রাম আসার আগেই কিন্তু রামের গল্প লেখা হয়ে গেছে। তাই না? মহর্ষি বাল্মীকি লিখেছিলেন। ওই একটা অদ্ভুত কথা আছে। রাম বাল্মিকীকে বলছেন, আপনি উত্তরকাণ্ড শুরু করুন। আপনার যে সমস্ত দর্শন হয়েছে, আপনি যে ভবিষ্যৎ দেখেছেন আপনি সেই গুলো লিখুন। এটা রাম বলছে। রামেরই জীবনের উত্তরকাণ্ড আগে থেকে লিখতে বলছে। এবং সেগুলো প্র্যাকটিক্যালি পরে পরে ঘটবে। রাম সবই জানে যে কি কি হবে। কিন্তু তিনি আরেক জনকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে তুমি লেখ। লিখলে কি হবে? জগতবাসী আগে থেকে একটু আভাস পাবে যে এই ঘটনাগুলো ঘটবে। যেমন জীবনকৃষ্ণ বলছেন যে আমার মাথায় যা চিন্তা জাগবে সবার মাথায় সেই চিন্তা আসবে, আসবেই। সেটা কখন ঘটবে উনি একটা টাইম ফ্রেম তৈরি করে রেখেছেন। সেই সময় আসবে। তার আগে মানুষ বুঝবে না সেই জায়গাটা। তাই না? এটা বোঝা গেল? অর্পিতা বুঝলি?

অর্পিতা ঃ হ্যাঁ গো বুঝেছি।

সুমিতা ঃ আমার একটা প্রশ্ন আছে। আগে একদিন আলোচনা হয়েছিল এই যে আমির নাশ। এরপর তত্ত্বজ্ঞান, অবতারতত্ত্ব ইত্যাদি স্টেজ যেগুলো আছে সেগুলো বলা হয়েছিল যে আমরা যেন বুঝতে পারি তার জন্য এগুলো বলা হয়েছে। স্থিত সমাধির প্রসঙ্গে যেটা বললে যে উনিই একমাত্র আছেন; তাহলে এই ব্যাপার গুলো তত্ত্বজ্ঞান, অবতার তত্ত্ব ইত্যাদি এগুলো কেন আসছে?

জয়কৃষ্ণ ঃ হ্যাঁ ওইগুলো স্থিত সমাধির পরে হয়েছে। ওই যে বললাম **স্থিত সমাধির দুটো দিক আছে। একটা হচ্ছে যে নির্গুণকে জানা।** মানে যেগুলো আমরা ব্যাখ্যা করতে পারিনা, যেগুলো আমরা বুঝিনা...। আমিই যে সর্বত্র বিরাজমান এইটা যতক্ষণ না ঘটবে, মানে গোটা মনুষ্য জাতিই যে আমি, যতক্ষণ পর্যন্ত না এইটা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত স্থিত সমাধি নেই। নির্গুণ এর সাথে যুক্ত হলে ওই জিনিস গুলো ঘটে। **স্থিত সমাধির দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে আমিই আছি।** এখন বিষয় হলো যে আমিই আছি এইটা আমি বুঝলাম। এবার রিয়েলাইজেশন। সাধন ধারাগুলোকে তো এইবার ধাপে

ধাপে বুঝতে হবে। নিজে বুঝে এবার তো আমি বোঝাতে শুরু করব।

এবার আমি আবার ফিরে যাব রাম ভক্তের কাছে। রাম যখন প্রথম শিক্ষা নিতে গিয়েছিল সেটা কার কাছে বলতো?

বরুণ ঃ বশিষ্ঠ মুনি?

জয়কৃষ্ণ ঃ হ্যাঁ। এবার রাম যখন শিক্ষা নিতে গেলেন তখন বশিষ্ঠ মুনি বলছেন, হে প্রভু এই জগৎ আপনার ভেতরেই সমবেত, সমর্পিত। স্বয়ং আপনি বিষ্ণুর অবতার। জ্ঞান আপনার ওষ্ঠে। আপনাকে আর আমি কি জ্ঞান শেখাবো? তখন রাম বলছেন যে শাস্ত্র আপনি শিখেছেন, শাস্ত্রে যেগুলো রচিত হয়েছে, সেই শাস্ত্র থেকে কিছু শিক্ষা দিন। সেইগুলো আমি তাহলে লোককে শেখাতে পারবো। রাজধর্ম কি জিনিস এগুলো তো আমি বলব। আমারই কাছ থেকেই তো শিখবে। ঘটনাটা ঠিক সেইরকম সুমিতা মাসি। জীবনকৃষ্ণের স্থিত সমাধি হল। উনি বুঝলেন। কিন্তু জিনিসগুলোকে যে এক্সপ্লেন করবেন, সেই এক্সপ্লেন করার পদ্ধতি চাইতো! রিয়েলাইজেশন চাইতো, ওইটার একটা সাধন চাই তো! সেই জন্য ওই সাধনের কথাগুলো বলা হলো। বেদের সাধন, বেদান্তের সাধন, অবতার তত্ত্বের সাধন, রসতত্ত্বের সাধন; নিত্য লীলা সাধন— এতগুলো নাম করে দেওয়া হল। উনি ওই জিনিসগুলোকে বুঝে বুঝে চলেছেন। মানে ওই জিনিসগুলোকে এক্সপ্লেইন করতে করতে চললেন যে কোথায় ভুল আছে, কোথায় ঠিক আছে। তাতে উনি জগতকে বলতে পারবেন। বুঝতে পারলে?

সুমিতা ঃ হ্যাঁ।

জয়কৃষ্ণ ঃ বেশ। আচ্ছা পরের প্রসঙ্গে ডাকিনী মূর্তি এখানে কমলা মূর্তিকে বলা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আরেকটা কথা হবে যেটা অভিজিৎ কাকা বলল যে এই প্রসঙ্গে খেটে খাওয়া মানুষ কি বুঝবে?

একজন খেটে খাওয়া মানুষ—বীরভূমের একটা ছেলে কৃষি সম্মান পুরস্কার পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে। শুনেছো? এগ্রিকালচার নিয়ে পড়ে না। কিন্তু এখন ছেলেটি এগ্রিকালচার নিয়ে গবেষণা করে যাবে। ছেলেটা কি নিয়ে পড়ে? কম্পারেটিভ রিলিজিয়ান নিয়ে পড়ে। যারা এগ্রিকালচার নিয়ে পড়ে তারা কিন্তু কৃষি সম্মান পুরস্কার পেল না! আমার খুব অবাক লাগলো ব্যাপারটা। ছেলেটা কম্পারেটিভ রিলিজিয়ান নিয়ে পড়ে কিন্তু এখন সে এইবার এগ্রিকালচার নিয়ে গবেষণা করে যাবে। এখন গবেষণা কথাটার মানে কি? গবেষণা বললেই সাধারণ মানুষ বুঝে যাবে

যে সাইন্টিফিক কিছু একটা রিসার্চ। আমরা পড়েছি গো+এষনা মানে গবেষণা। কিন্তু সাধারণ মানুষ গবেষণা বলতেই সায়েন্স বিষয়ক কিছু ভাবে। ব্যাপারটা মাথায় ঢুকে বসে আছে। গবেষণা ইতিহাস নিয়ে হতে পারে। সেইরকম এখানে ছেলেটি কি কি ইন্সট্রুমেন্ট নিয়ে কাজ করা যায় সেগুলো নিয়ে খুব খেটেছে এবং কাজ করছে। তার জন্য তাকে ওই পুরস্কারটি দেওয়া হয়েছে। সে নিজেও প্রয়োগ করেছে এবং তার গ্রামের আরো অনেকজনকে বুঝিয়েছে ব্যাপারটা। কিভাবে ইন্সট্রুমেন্ট ব্যবহার করা যায় চাষের ক্ষেত্রে। এবার কেন বললাম ওই প্রসঙ্গে সেটাই বলি। খেটে খাওয়া মানুষের এগ্রিকালচার-এর খুঁটিনাটি কাজ নিয়ে জানার দরকার নাই। কোন ধানটা নন ফটোপিরিয়ডিক আমার জানার দরকার নেই। হাইব্রিড সিড আছে লাগিয়ে দাও। সার দিতে হবে ২:১:১ ব্যাস। এনপিকে। এইটা হয় কি করে সেটা জেনে আমার দরকার নাই। মূল কথা হলো তুমি জ্ঞানটাকে কাজে লাগাও। তাহলে খেটে খাওয়া লোক এর ক্ষেত্রে যখন সে ধর্ম কথা বুঝতে চাইবে তখন তাকে ধর্ম জগতের অ্যাপ্লিকেশন যেগুলো আছে সেগুলো তো আলোচনা করতেই হবে। ধর্মের সাথে আসবে ঈশ্বর কে সে বুঝবে, ঈশ্বর কি? আমার এই প্রাণশক্তির যে রূপ তাকে আমি যে বুঝবো—তিনি কীভাবে আমাকে কন্ট্রোল করে আছেন—আর আমি তখন ডাকিনী বুঝবো না বললে হবে? তুমি এগ্রিকালচার নিয়ে রিসার্চ ক'রো না, দরকার নেই। তুমি রিলিজিয়ান নিয়েই কালচার করছো। চাষ করবে বলছ আর কৃষির ইন্সট্রুমেন্ট নেবে না তা কি হয়? চাষ করব অথচ চাষ সম্পর্কিত কোন ইন্সট্রুমেন্টই নেব না, যেসব বিজ্ঞানীরা রিসার্চ করে বলেছে যে এই পদ্ধতিতে চাষ করতে হয়, সেই নামগুলো উচ্চারণ করব না, সেই নামগুলো বুঝবোনা, বলবে ওসব আবার কি? ওসব আমি পারবো না!—তা বললে তো হবে না! তোমাকে কৃষি নিয়ে পড়ে থাকতে হবে না। কিন্তু কৃষির যে প্র্যাক্টিক্যাল ভাগ গুলো রয়েছে সেই গুলো জানতে হবে।

সেইরকম তাকে বুঝতে হবে, তাকে জানতে হবে ডাকিনীটা কি। ভালো করে শোনো ডাকিনী প্রসঙ্গটা। এবং দেখো যে ওটা ডাকিনী নয়—কমলা। ডাকিনী মানে ভুত-প্রেত এইসব নয়- কমলা; তুমি এইটা বুঝো। তোমাকে ওই লাইনেই আসতে হবে। তবেই তো তোমার প্র্যাক্টিক্যাল। ডাকিনীর অর্থটা আগে বুঝতে হবে। আমিই যদি বুঝতে না পারি তাহলে অন্য লোককে বুঝিয়ে কি হবে আমার? অন্য লোকের সাথে সদ্ভাব, ভালো

মনোভাব সে তো থাকতেই পারে। সেইটাকে তো আর একত্ব বলছি না। আমার তাঁতে পরিবর্তিত হওয়া—ওইটাকেই আমি জোর দিচ্ছি। তাকেই একত্ব বলা হচ্ছে। একজন মানুষের সাথে খুব ভদ্রভাবে ব্যবহার করলাম সবার সাথে খুব Co-operative মনোভাব নিয়ে কথা বলছি তার মানেই যে একত্ব হয় গেল তা তো নয়!!

অভিজিৎ রায় ঃ অন্য ধর্মের মানুষরা কি ইন্সট্রুমেন্ট পাবে তাহলে? অন্য ধর্মের মানুষেরা তো আর এই টার্মিনোলজিগুলো জানে না। তারা যদি চর্চা করতে চায় তাহলে তারা কি ধরনের পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যাবে? যদিও সেটা কাল্পনিক হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সমষ্টি চেতনার বিকাশ সেটা তো সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে দিয়েই হবে?

জয়কৃষ্ণ ঃ ঠিক ঠিক ঠিক। আচ্ছা ম্যাডোনাকে চেনো? কে বলতো?

সৌম্যদীপ ঃ ওই যে জেসাস ও ম্যাডোনার ছবি আছে ওইটা কি?

জয়কৃষ্ণ ঃ হ্যাঁ ম্যাডোনা অর্থাৎ মা মেরি। মেরিকেই ম্যাডোনা বলে। ওইটার ইকুইভ্যালেন্ট করা হয়েছিল ডাকিনী বা কমলা। এখানে ঠাকুর বলেছেন দুটোর মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। কিন্তু আমরা অনেক সময় যেটা বলি যে এই ধর্মের সাথে ওই ধর্মের মিল আছে, এই প্রসঙ্গে, ম্যাডোনাকে নিয়ে ডাকিনীর সাথে একটা মিল করা হয়েছে। অভিজিৎ কাকা যেটা বলল যে যারা অন্য ধর্ম থেকে আসছে তারা এই জিনিসগুলো কি করে জানবে? টার্মিনোলজি দিয়ে কিছু জিনিসকে বোঝানো হয়েছে যেমন ধরো ডাকিনী, তারপরে চিৎস্বরূপ যিনি অন্য ধর্ম থেকে আসবেন, আমি তাকে বোঝাবো যে তারই (জীবনকৃষ্ণের) রূপ এটা সদা সত্য। চিরস্থায়ী। এইটা তোমার স্বরূপ, স্ব-স্বরূপ। এই যে কথাগুলো আমি তাকে বোঝাবো, ওই জিনিসটা চিৎ-স্বরূপ-ভাব, আমি তাকে টার্মিনোলজি দিয়ে বোঝাবো না। তাকে আমি ওর ধর্মেরই প্রসঙ্গ এনে, বা এই জিনিসটা বুঝতে গেলে আর কি কি বুঝতে হয়, তাকে আমি সেইভাবে বোঝাবো। তাতে যে টার্মিনোলজি গুলো আসবে সেইগুলোকে আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ভেঙ্গে দিতে পারব। এবং সে তখন বুঝে যাবে। তাই আমি ওই ছেলেটির প্রসঙ্গ আনলাম। সে কম্পারেটিভ রিলিজিয়ান নিয়ে পড়ছে। কিন্তু এগ্রিকালচার নিয়ে বুঝতে তার কোনো অসুবিধা হয় না। শেষে এই বিষয়ে স্টাডি করতে শুরু করেছে সে। সে এবার নিজেই পড়ে। এই যে ম্যাডোনার কথা বলা হলো যে মেরিকেই ম্যাডোনা বলা হয় আর তিনিই ডাকিনী বা কমলা,

এইবার আমরা ম্যাডোনার ব্যাখ্যা করতে পারব। জীবনকৃষ্ণ ডাকিনী কথায় কি মিন (mean) করেছেন সেটাও। এইবার যে ক্রিশ্চান তাকেও আমি ম্যাডোনার কথা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারবো যে আমাদের শাস্ত্রে কি বলছে দেখো। আমাদের শাস্ত্রেও ম্যাডোনার কথা বলা আছে। তাহলে এই ধর্মের টার্মিনোলজি গুলো নিয়ে যে খুব প্রবলেম ঘটে যাবে তা কিন্তু হয়না।

সঞ্চিতা ঃ আচ্ছা জয়, তুমি যখন এগ্রিকালচার এর কথাটা বলছিলে হঠাৎ করে ট্রান্স এ আমি দেখলাম—**অনেক বড় দুটো দাঁতের পাটি আকাশ থেকে ভেসে ভেসে আসছে। আর কিছু নেই। অনেক বড়। কেন দেখলাম বুঝতে পারলাম না।**

জয়কৃষ্ণ ঃ এককথায় একটা অর্থ বলা যায়। আবার ভাবলে অনেক অর্থ বেরোবে। দাঁত বড় অর্থাৎ কোন কিছু বোঝার (দাঁত ফোটাবার) বা বলার ক্ষমতা বাড়ে। মানে সূক্ষ্মভাবে জিনিসটাকে বোঝা যায় এবং বলা যায়। আমাদের দাঁত না থাকলে কথা বলতে অসুবিধা হয়। এই যে বিষয়গুলো বলা হচ্ছে যে টার্মিনোলজিগুলোর জন্য সমস্যা—তাহলে সেই গুলো কোন রকম সমস্যা হবে না বা হয় না। সেখানে দাঁত ফোটানো যায়, তাকে বোঝানো যায়। সে বুঝবে। যেহেতু তুমি ওই সময়েই দেখলে তাহলে এইটা বলা যায়।

বরুণ ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ। বিশ্বব্যাপীত্বে দাঁত ফোটানো যাচ্ছে—এটাই দেখাচ্ছে।

জয়কৃষ্ণ ঃ হ্যাঁ। তবে অভিজিৎ কাকা যে কথাটা বলেছিল সেটা ঠিক যে গ্রামের যারা অন্য ধরনের বা ভিন্ন ধর্মের যদি লোক হয় তাকে এই খটমট শব্দগুলো দিয়ে কিভাবে বুঝাবো? শব্দটা যদি আমার কাছে খটমট থাকে তাহলে কিন্তু ওর কাছেও খটমট। শব্দটা যদি আমার কাছে ইজি হয়ে যায় তাহলে ওর কাছেও ইজি। তাহলে তাকে আমি খুব ইজিভাবে বুঝিয়ে দেবো যে জিনিসটার আসল অর্থ কী। ডাকিনীকে যে কমলা বলা যায় বা ওই যে একটু আগে কালো কাকা বলল না যে দশমহাবিদ্যার কথা, এটা সেই শিবের কাহিনী। দক্ষ যজ্ঞের কাহিনী। রাজা দক্ষ তার যজ্ঞে শিবকে নেমন্তন্ন করেনি। সতী বলছে আমি বিনা নেমন্তন্নেই যাব। তখন শিব বলল যে, না, যাওয়ার কোন দরকার নেই। তখন ভয়ঙ্কর রেগে গেল সতী আর দশ রূপ ধারণ করল। কালী, ...কমলা, মানে এমন ভাবে দশ দিক থেকে ঘিরে ধরল শিবকে যে শেষ পর্যন্ত তাকে মানিয়ে নিল যে বাবা যজ্ঞ করছে আমি ওখানে যাব। এই একটা কাহিনী বলা হয়েছে। তন্ত্রে দশমহাবিদ্যার

কথা যে বিদ্যাকে দশ রূপে দেখা হয়। কমলাকে ওখানকার শেষ ধাপ বলা হয়েছে। কি করে এবার লিংক হলো সেইটা বুঝতে হবে। সতীই যাবেন দক্ষের কাছে। শিব থাকেন কৈলাসে। মর্ত্য থেকে উঁচুতে যেন ঠিক মর্ত্যতে নয়। এইবার সতী মর্ত্যতে আসবেন। তাহলে সাথে সাথে শিবও আসবে। তাহলে সর্বস্থানে তার বিচরণ হবে। তাহলে এই যে সতী দশ (মহাবিদ্যা) রূপ ধারণ করে শিবকে মানিয়ে নিল এখানে তাহলে কি দেখানো হয়েছে? দেখানো হল যে শিব একরকম বাধ্য হয়েই দক্ষের যজ্ঞে গেল।

এখানে জীবনকৃষ্ণ কমলা মূর্তি দেখলেন। ওই ক্ষিতি দর্শনের পরে পরেই। জীবনকৃষ্ণ বলছেন যে দ্বার খুলে দিল। তাহলে কোন দ্বার? কার সাথে অবাধ বিচরণ ঘটবে? এই মনুষ্যজগতের সাথে। এই যে ক্ষিতি বলা হলো, এই যে পঞ্চভূত, এই দেহ, তার সাথে আমরা যুক্ত। তাহলে এই সমস্ত মনুষ্যজাতি তারই যে দেহের অংশ—যতক্ষণ পর্যন্ত না ওই কমলা মূর্তি সরে দাঁড়াবে, দ্বার খুলে দেবে, মনুষ্য জগতের সাথে আমার যে একাত্মতা, সেটা উপলব্ধি হবে না। আমি যে স্পিরিচুয়াল কন্ট্রোল করব, আমার যে ওই কন্ট্রোলিং অধিকারটা আসবে, কমলা মূর্তি যদি সরে না দাঁড়ায় তাহলে সেটা আর আসবে না। ক্ষিতি দর্শনের যে প্রভাব হতেই হবে। সেই জন্য তো দু এক দিন আগেই দেখেছেন। জীবনকৃষ্ণ বলছেন যে "তার আগেই আমি ডাকিনি মূর্তি দেখেছি।" তার মানে ডাকিনী বা কমলা মূর্তি আমাকে দ্বার খুলে দিল। ফলে আমার অবাধ বিচরণ ঘটবে। আর ক্ষিতি লাভ হবে মানে আমার দেহের সর্ব অংশটা আমারই হবে। সমস্তটা, পুরোটাই আমি পারফেক্টলি কন্ট্রোল করতে পারব। সেই জগতের সাথে আমাদের মনুষ্যজগতকে এইবার উনি যেন টেনে নেবেন। বা মনুষ্যজগতকে উনি রিফ্লেক্ট করবেন। সেই ক্ষেত্রে কমলা মূর্তি দর্শন না করলে কিন্তু হবে না। কমলা মূর্তি দর্শনটা কিন্তু তন্ত্র মতে। কিন্তু এইটা ভেঙ্গে যখন আমরা প্রকৃত অর্থটা পাব তখন বুঝবো যে না তন্ত্র মতে নয়।

ওনার ঘরে একজন ওনাকে যখন বলছেন যে কমলা মূর্তি মানে অমরত্ব লাভ হবে। এটা তে উনি হেসেছেন যে মানুষ অমর হয় কি করে? অমর মানে চিরকাল বেঁচে থাকবে?—তা নয়। পুরনো বটগাছ বহুদিন আগে মরে গিয়েছে। কিন্তু বেঁচেই আছে। অমর তো হয়েই আছে। কিসে? স্পিরিচুয়ালে। সেখানে টোটাল টা কন্ট্রোল করছেন উনি। বিক্ষেপ করেই উনি সেখানে বসে আছেন। তন্ত্র সাধনায় এই যে ক্ষিতি লাভ- আমার যে একটা কন্ট্রোল শক্তি হবে, পুরোপুরি কন্ট্রোল করব, সবকিছু আমার করায়ত্ত হবে, আমারই

সব, এইটাকে ধাতুর সাধন বলে। অর্পিতাকে বলছি, উনার আগে থেকেই কিন্তু এটা মনে ছিল যে, আমিই সব করব। সবই আমার হবে। হলও তাই। সেজন্য "বহুদিন আগে আমার মনে হয়েছিল এই ধাতুর সাধন আছে।" ক্ষিতিলাভ তো তাঁকে করতেই হবে! তা নাহলে আর লাভ কি হল? আমার এই জগতকে টোটাল আমাকে নিতে হবে। আমার এই জগত। এই জগতে আমি নিজেকে রিফ্লেক্ট করে ফেললাম যে। এইবার আমি গুটি সাজাবো। সবই আমি করব। ছোটবেলায় আমরা যখন কেরাম খেলতাম তখন সবারই একটা দিকেই নজর থাকতো যে গুটিটা আমি সাজাবো। কেন? তাহলে নিজের মত করে সাজিয়ে নিতে পারব, একটা বিশেষ অ্যাঙ্গেলে অন্য কেউ সাজিয়ে দিলে হবে না। কারণ বোর্ডটা আমার মানে দানটা আমার হবে। তাই আমি সাজাবো।

তন্ত্র সাধনায় কন্ট্রোলটাকে নিয়ে খুব কথা বলেছে। সেই জন্য এই ক্ষিতি দেখাটাকে ধাতুর সাধন বলেছেন। ধাতু মানে ব্যুৎপত্তি যা জানলে যেমন শব্দের সঠিক অর্থ জানা যায়—তেমনি আত্মিকেও চৈতন্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মে ও তা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

স্নেহময় ঃ কিন্তু সেখানেও তো প্রাক্টিক্যাল ডাটা ছাড়া কি করে প্রমাণ হবে যে আমি একাই আছি?

জয়কৃষ্ণ ঃ না নেই তো। সেই জন্যই তো তন্ত্রসাধনার অস্তিত্ব ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল। স্পিরিচুয়ালি, দর্শনের সাপেক্ষেই তো হবে—তন্ত্রমতে নয়।

অমরেশ ঃ বলছি জয়, পঞ্চভূতের কথাটা যেটা বললি তাতে কি এখানে সেই কসমিক বডির আইডিয়াটা আসছে?

জয়কৃষ্ণ ঃ হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। আর বলার দরকার নেই, বুঝে গিয়েছো।

অমরেশ ঃ আচ্ছা ওই যে প্রশ্ন করেছিলো যে ঘরের মধ্যে তিনটে নারীকে আলাদা করে দেখছে কমলা মূর্তি বাদ দিয়ে ওইটা একটু বলে দে।

জয়কৃষ্ণ ঃ ওইটা যোগের হিসেবে দেখতে পারি। আর দীপদা যেটা বলল সেটাও এক্সেপ্টেবল। কমলা হচ্ছে মায়া। এবার ওই তিনটে মূর্তি মায়ারই এক একটা ধাপ ভেতরে। তবে দেখো উনি কিন্তু দূর থেকে দেখছেন। বলছেন, দূরে একটা মাটির বাড়ি। আমি যেন দূর থেকে সেই বাড়িটার দরজায় গুম গুম করে ধাক্কা মারছি। এমন সময় এক অপূর্ব নারীমূর্তি দরজা খুলে পাশে এসে দাড়ালো। যাতে আমি যেন ঘরে ঢুকতে

পারি। জিনিসটা কিন্তু দূর থেকেই হচ্ছে। আর দূর থেকেই বুঝে যাচ্ছেন ঘটনা গুলো। তার মানে উনি আগে থেকেই ব্যাপারগুলো জানেন।

স্নেহময় ঃ আচ্ছা, প্রথমে বলছেন কমলা মূর্তি দ্বার খুলে দিল। তার মানে মায়া চলে গেল। এরপর ভেতরে যখন যাচ্ছেন তারপরে যে তিনটে নারী মূর্তি দেখছেন তাদেরকে আবার মায়ার ধাপ বলছ কেন?

জয়কৃষ্ণ ঃ কমলা দ্বার খুলে দিলো এবার তুমি জগৎটাকে টোটাল কন্ট্রোল করতে পারবে। এবার ওইটা কেমন মায়া? আবার দশমহাবিদ্যার কথায় ফিরে আসি। ওই যে সতী যে কালী হচ্ছেন মানে আগুন জ্বালাচ্ছেন—এটা তন্ত্র সাধনায় বলছে। যেন শিব ভরকে যাবে। শিব কিন্তু ঠিক কেটে পালিয়ে যাচ্ছে। শেষে এই কমলা রূপ দিয়ে চারিদিক দিয়ে এমনভাবে ঘিরে ধরল যে শিব মেনে নিতে বাধ্য হল। বলল, বেশ যাও। তাহলে এখানে মায়াটা কেমন? জগৎ আমারই, জীবনকৃষ্ণের ক্ষেত্রে। ঠিক কথা। তোমারি, কিন্তু তুমি কন্ট্রোল করো। করে কি হবে?—এই মনোভাব অর্থাৎ যে আমি অ্যাক্টিভলি পার্ট নেবো না এইটা একটা মায়ার জাল। তারই সৃষ্টি জিনিস কিন্তু আমি আবারও এখানে থাকতে চাইছি না। এবারে সে সরে গেল। যেন বলছে, না, তুমি এবার কন্ট্রোল করো।

স্নেহময় ঃ বিদ্যার আমির মতো?

জয়কৃষ্ণ ঃ হ্যাঁ একদম শেষ ধাপ। এরা যে ভেতরে আছে। মানে ইন্‌অ্যাক্টিভ (inactive)। ওদের তো দরজা খোলার অধিকার নাই। তারপরে আর মায়া নেই। এবারে এগুলোকে মায়ার ধাপ বলতে পারো। যোগিনীও বলা যেতে পারে। যোগিনী যারা ওনার জন্য ঘরে অপেক্ষা করছেন। সেটা বললেও ভালো হয়। অপেক্ষা করতে হচ্ছে এইবার খুলে দিলে তুমি এবার এসো। জীবনকৃষ্ণ বুঝালেন, তারা আমার অধীনস্থ হবে। বুঝতে পারলে?

স্নেহময় ঃ হ্যাঁ বোঝা গেল। বেশ, একটা বেজে গেছে।

জয়কৃষ্ণ ঃ আচ্ছা যতদুর বকবক করা হল কিছুটা বোঝা গেছে?

অভিজিৎ ঃ খুব সুন্দর বুঝলাম।

———

Notes